আতিক

এ ওয়ার্ল্ড উইদাউট ইসলাম

গ্রাহাম ই. ফুলার

ভাষান্তর : মোহাম্মদ হাসান শরীফ

এ ওয়ার্ল্ড উইথআউট ইসলাম

এ ওয়ার্ল্ড উইথআউট ইসলাম

গ্রাহাম ই. ফুলার

ভাষান্তর: মোহাম্মদ হাসান শরীফ

নয়া দিগন্ত

অনুবাদকের কথা

বর্তমানে ইসলাম ও মুসলিম বহুল আলোচিত দু'টি শব্দ। মুসলমানদের নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় একের পর এক খবর প্রকাশিত হচ্ছে। সমাজতন্ত্র পতনের পর ইসলামকেই পাশ্চাত্যের সামনে দাঁড় করানো হয়েছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের অনেকেই ইসলামকে বর্তমান সভ্যতার জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হিসেবে অভিহিত করছে। অনেকে তো ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের প্রতিশব্দ হিসেবেও উল্লেখ করছে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলমানেরাই বরং সন্ত্রাসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমনকি খোদ ইউরোপে মুসলমানেরাই সন্ত্রাস চালাচ্ছে বলে যেসব খবর প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলোও সম্পূর্ণ একপেশে। বিভিন্ন জরিপে দেখা যায়, মুসলমানদের চালিত হিসেবে উল্লেখ করা সব সন্ত্রাস আমলে নিলেও তা মোট সহিংসতার বড়জোর ৩ শতাংশ। ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিগত, গোষ্ঠীগত এবং নানা কারণে বাকি ৯৭ ভাগ সন্ত্রাস হয়ে থাকে। সেগুলো মিডিয়ার আড়ালেই থেকে যায়।

তা ছাড়া মুসলমানেরা কেন ক্ষুব্ধ, সেটা বিশ্লেষণেও দরকার হয়ে পড়েছে। সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান থেকে কোনোকালেই দলে দলে লোক বিপদসঙ্কুল পথ তো দূরের কথা, সহজ পথেও ইউরোপ বা আমেরিকায় পাড়ি দেয়নি। কিন্তু আমেরিকান নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য জোটের তেল এবং অন্যান্য সম্পদ কব্জা, ভূরাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে যে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে, তার খেসারত দিতে হচ্ছে এসব দেশের নিরীহ মানুষকে। পাশ্চাত্যের আগ্রাসন, ভুলনীতির কারণেই তারা ক্ষুব্ধ হচ্ছে।

এমন এক প্রোপটেই গ্রাহাম ই. ফুলারের 'এ ওয়ার্ল্ড উইথআউট ইসলাম' বইটি অনুবাদের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। লেখক মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স কাউন্সিলের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান, র‍্যান্ডের সাবেক সিনিয়র রাজনীতিবিজ্ঞানী এবং বর্তমানে সাইমন ফ্রেসার বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাজাঙ্কক্ট প্রফেসর। তিনি প্রায় দুই যুগ মুসলিম বিশ্বে বাস করেছেন, কাজ করেছেন। তার লেখা আরেকটি বিখ্যাত বই হচ্ছে The Future of Political Islam। এতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্য বর্তমানে যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তা অনেক পুরনো, আধুনিক ইতিহাসের অনেক অনেক আগে এর শুরু। এটা কেবল ধর্মীয় নয়, পাশ্চাত্যের আধিপত্য জারির প্রয়াস। আর আরবেরা যুগের পর যুগ এই আধিপত্য প্রতিরোধ করে আসছে। তারা একবারের জন্যও পাশ্চাত্যের আধিপত্যকে ভালোভাবে মেনে নেয়নি। এমনকি ইসলাম যদি নির্মূলও করে দেয়া হয় (যা কখনো সম্ভব নয়, তার পরও যদি যুক্তির খাতিরে ধরে নেয়া হয়) তবুও মধ্যপ্রাচ্য পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে লড়ে যাবে।

এ বইয়ের প্রতিটি বক্তব্য লেখকের একান্ত নিজস্ব। এখানে কেবল অনুবাদ করা হয়েছে।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	**১-২৩**	
ইসলাম এবং ইব্রাহিমি ধর্মবিশ্বাস		২
আরব দেশ		৪
খ্রিষ্টান ও ইসলাম সম্পর্কে ইহুদি দৃষ্টিভঙ্গি		১০
ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্ম প্রশ্নে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি		১৩
ইসলাম প্রসঙ্গে ইহুদি ও খ্রিষ্টান দৃষ্টিভঙ্গি		১৫
ধর্ম, রাষ্ট্র, ক্ষমতা ও ধর্মভ্রষ্টতা		১৭
সহিষ্ণুতা, অংশগ্রহণতা ও বর্জনমূলকতা		২২
অধ্যায় দুই	**২৪-৩৮**	
ক্ষমতা, ধর্মভ্রষ্টতা এবং খ্রিষ্টধর্মের বিবর্তন		২৫
ধর্মভ্রষ্টতার ছড়াছড়ি		৩২
অধ্যায় তিন	**৩৯-৫৪**	
বায়জান্টাইন বনাম রোম : প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রিষ্টান মেরুকরণ		৪০
নামের যুদ্ধ		৪৪
জাতীয় চার্চের জন্ম		৪৭
পূর্ব-পশ্চিম সজ্ঘাত গভীর হলো		৫০
আয়না ও প্রতিধ্বনি		৫৩
অধ্যায় চার	**৫৫-৭২**	
পূর্ব খ্রিষ্টধর্মের সাথে মিলল ইসলাম		৫৬
সিরিয়া এবং ভিন্নমতের সংস্কৃতি		৫৮
বায়জান্টাইন ভূখণ্ডে ইসলামের প্রবেশ		৬৩
ধর্মান্তরকরণ ও ধর্মান্তরকরণ-প্রক্রিয়া		৬৫
বিলম্বিত ক্ষমতা		৭১
অধ্যায় পাঁচ	**৭৩-৯৩**	

ক্রুসেড (১০৯৫-১২৭২) ৭৪
পোপ দ্বিতীয় আরবানের আহ্বান ৭৬
ইহুদি গণহত্যা ৭৮
দ্বিতীয় ক্রুসেড ৮২
তৃতীয় ক্রুসেড ৮৩
আরো তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ৮৫
উত্তরের ক্রুসেড ৮৯
ইতিহাসে ক্রুসেড ৯১
অধ্যায় ছয় ৯৪-১২৩
একই সুর : প্রটেস্ট্যান্ট রিফরমেশন ও ইসলাম ৯৫
সব আইনের উৎস ধর্মগ্রন্থ ১০১
জন ক্যালভিনের পুরোহিততান্ত্রিক-বিরোধী খ্রিষ্টধর্ম ১০৪
মহা ধর্মত্যাগ ১০৮
পুনর্গঠনবাদ ১১০
আধুনিক রাজনৈতিক ইসলামে খ্রিষ্টান ছায়া ১১৪
ইসলামের সভ্যতাগত সীমান্তগুলোতে মিলন ১১৭
পাশ্চাত্যবাদবিরোধিতা নিয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য? ১২১
অধ্যায় সাত ১২৪-১৩৯
তৃতীয় রোম’ এবং রাশিয়া : অর্থোডক্স ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী রাশিয়া ১২৫
রাশিয়ার ধর্মান্তর অর্থোডক্সির জন্য ছিল বিশাল ভূ-রাজনৈতিক পুরস্কার ১২৭
রাশিয়া এবং তৃতীয় রোম ১২৯
রুশ অর্থোডক্সের পাশ্চাত্যবিষয়ক সংশয় ১৩১
নতুন রাশিয়া ১৩৫
অর্থোডক্সির ঘুরে দাঁড়ানো ১৩৮
অধ্যায় আট ১৪০-১৬০
রাশিয়া ও ইসলাম : বায়জান্টিয়াম জীবনযাত্রা ১৪১
রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্ম বনাম জাতি ১৪৮

জাদিদবাদী আন্দোলন ১৫০

রুশ বিপ্লব ও বলশেভিকবাদ ১৫৩

মির্জা সুলতান-গালিব : কমিউনিস্ট-মুসলিম-জাতীয়তাবাদী ১৫৫

ইউরেশিয়ানবাদ ১৫৯

অধ্যায় নয় **১৬১-১৮০**

পাশ্চাত্যে মুসলমান : অনুগত নাগরিক নাকি পঞ্চম বাহিনী? ১৬২

ইউরোপের মুসলমানেরা কারা ১৬৫

বামধারা ও ইসলামের মধ্যে অপবিত্র জোট? ১৭০

অমুসলিম সমাজে মুসলিম সম্পৃক্ততা ১৭২

পাশ্চাত্যের ইসলামবিরোধী মনোভাব ১৭৫

ইউরো-মুসলিম ও সেকুলারবাদ ১৭৮

অধ্যায় দশ **১৮১-১৯৫**

ইসলাম ও ভারত ১৮২

ভারত ভাগ : বর্তমানে মুসলমানরা কোথায়? ১৮৯

অধ্যায় এগারো **১৯৬-২০৬**

ইসলাম ও চীন ১৯৭

সঙ্কর সংস্কৃতির প্রভাব ২০০

কিং রাজবংশ (১৬৪৪-১৯১১) ২০২

উইঘুর ২০৫

অধ্যায় বারো **২০৭-২৩১**

উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদ, ইসলাম এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম ২০৮

সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপাদান ২১০

মুসলিম সমাজে উপনিবেশ প্রভাব ২১৪

সাম্রাজ্যিক উদ্যোগ থেকে উপনিবেশ অবসানে ২১৭

সাম্রাজ্যিকবিরোধী বিদ্রোহ ২১৯

স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইসলাম না জাতীয়তাবাদ ২২১

মুসলিম পরিচিতির সম্প্রসারণশীল ভূমিকা কেন? ২২৩

মুসলিমদের জন্য সাম্রাজ্যবাদের দুঃখদায়ক কৃতকর্ম		২২৬
উপনিবেশবিরোধী চরমপন্থা ও ইসলাম		২২৮
অধ্যায় তেরো	**২৩২-২৪৯**	
যুদ্ধ, প্রতিরোধ, জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ		২৩৩
উদ্দেশ্যের ন্যায়সঙ্গতা		২৩৭
জিহাদ		২৩৯
বৈধ কর্তৃত্ব ও উসামা বিন লাদেন		২৪২
সন্ত্রাসবাদের উদ্দীপনা		২৪৫
অধ্যায় চৌদ্দ	**২৫০-২৬৮**	
প্রকৃত বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ		২৫১
সন্ত্রাসীদের সাথে ‘আলোচনা করা’		২৫৬
সন্ত্রাসবাদ কিভাবে শেষ হবে		২৫৮
বিচক্ষণ সাড়া		২৬০
মহা কৌশল		২৬৪

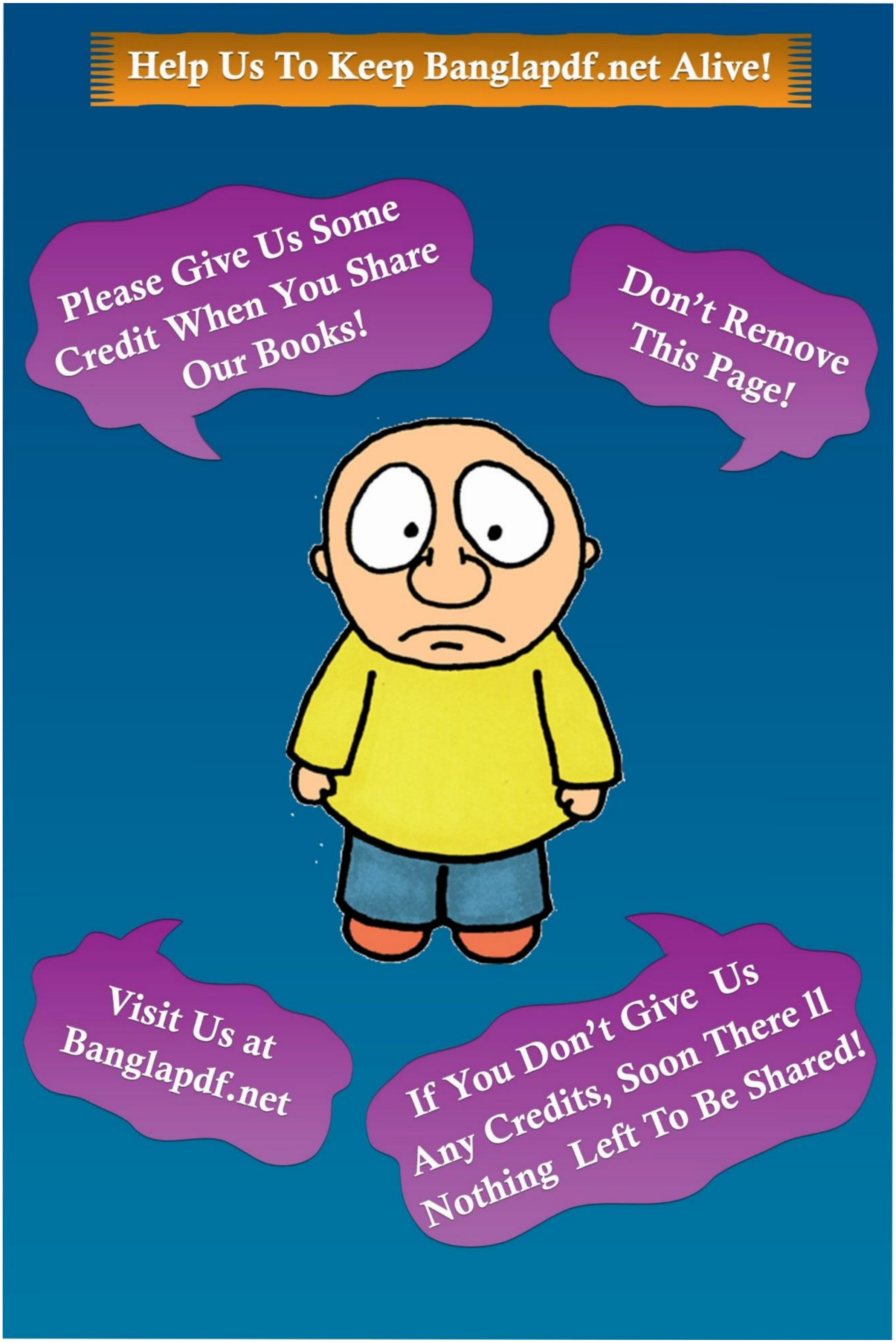
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মুসলিম বিশ্ব

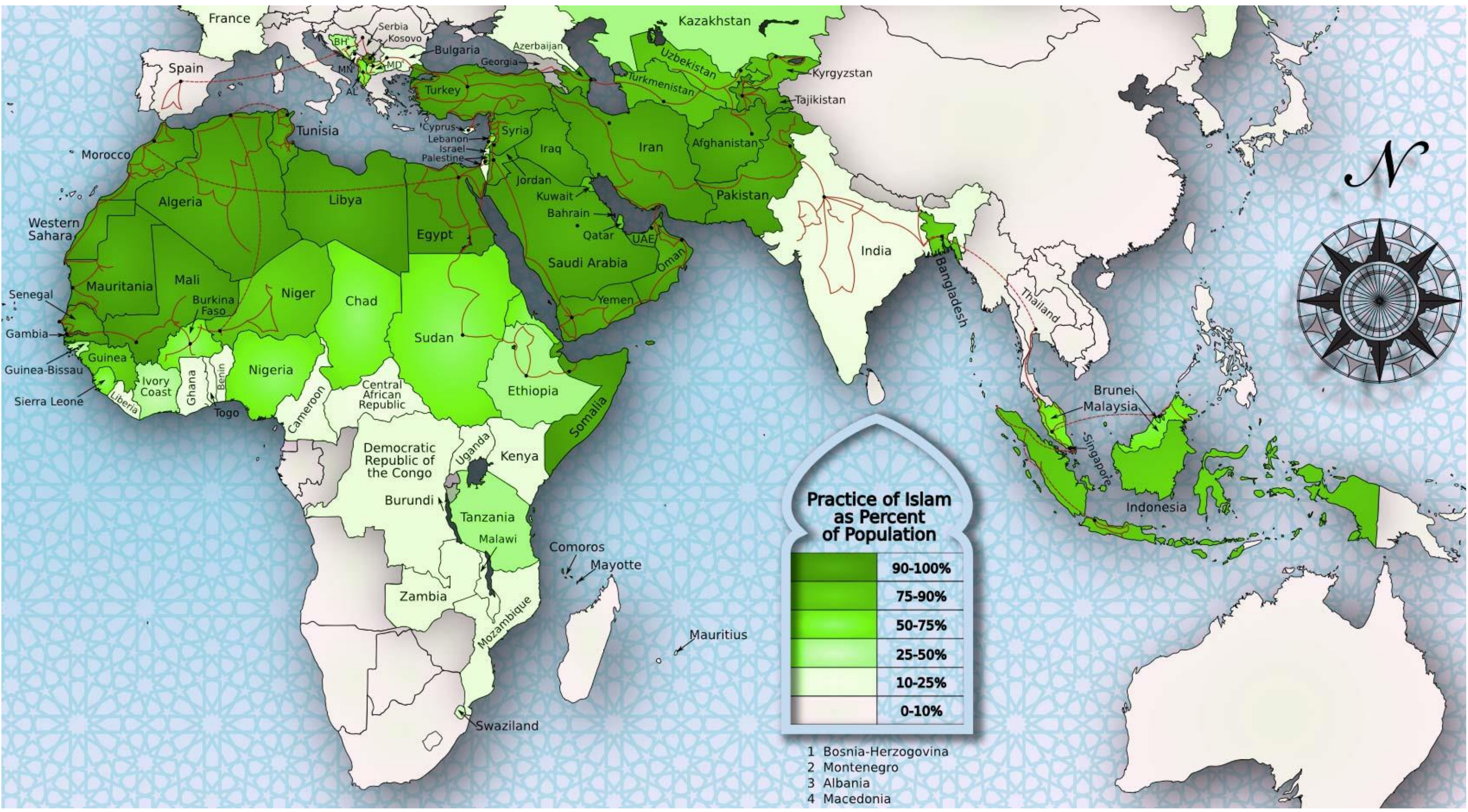

Practice of Islam as Percent of Population
90-100%
75-90%
50-75%
25-50%
10-25%
0-10%
1 Bosnia-Herzogovina
2 Montenegro
3 Albania
4 Macedonia

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম এবং ইব্রাহিমি ধর্মবিশ্বাস

আল্লাহ কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। কুরআন ১১২ : ৩

সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে হজরত মুহাম্মাদ সা: আল্লাহর কাছ থেকে ওহি লাভ এবং তা বিশ্বের সামনে ঘোষণা করার আগে পর্যন্ত সত্যিই এমন একটা সময় ছিল যখন ইসলাম ছিল না। তবে ইসলামের প্রতিষ্ঠাকে মধ্যপ্রাচ্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসূচক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা এক অর্থে ত্র“টিপূর্ণ। রাজনৈতিক বিবেচনায় এটা সন্ধিণ হতে পারে, তবে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইসলামের আত্মপ্রকাশকে আরেকটি বহুমাত্রিক ধারণা, চলমান পথে (মধ্যপ্রাচ্যের একেশ্বরবাদী চিন্তাধারায় অব্যাহত বিবর্তনে) আরেকটি বাঁক হিসেবে সহজেই অভিহিত করা যায়। নবী হজরত ইব্রাহিম আ: এবং ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলামÑ এ তিন ধর্মসংবলিত একেশ্বরবাদী ত্রয়ী ঐতিহ্যকে বোঝাতে এখন প্রায়ই ‘ইব্রাহিমি ধর্মবিশ্বাসের’ কথা শুনে থাকি। সময়ের পরিক্রমায় তাদের মধ্যে যত রাজনৈতিক পার্থক্যই সৃষ্টি হয়ে থাকুক না কেন, এ তিন ধর্ম পরস্পরের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। আর এটা এ কথাই নির্দেশ করে : রাজনীতি ও মতার লড়াই প্রায়ই অভিন্ন ঐতিহ্যের ওপর জোর না দিয়ে বরং রাজনৈতিক চাহিদার আলোকে ধর্মতাত্ত্বিক পার্থক্যকে আরো বড় করে দেখায়। ইসলাম আগমনের আগে থেকে এ অঞ্চলে বিরাজমান ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার স্থায়ী কারণ রাজনীতি এমনকি ইসলাম আগমনের পরও প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। আমরা ধারাবাহিকতার অপোয় থাকি। ইসলামকে মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় ঐতিহ্যে নতুন কিছু হিসেবে বিবেচনা করার দৃষ্টিভঙ্গিটি স্রেফ ভুল। এ অঞ্চলের গভীরতর প্রেরণা ও সংস্কৃতির অনেক কিছু ইসলাম আত্মস্থ করেছে, প্রতিনিধিত্ব করছে, স্থায়িত্ব দিয়েছে।

ইসলাম-পূর্ব মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় মানচিত্রে ইস্টার্ন অর্থোডক্স আকারে খ্রিষ্টধর্মের প্রাধান্য দেখা যায়। তবে পারস্যে (সাসানীয় সাম্রাজ্যে) মোটামুটিভাবে একেশ্বরবাদী জরথ্রুীয় ধর্ম এবং দু-একটি নগর এলাকায় ইহুদি ধর্মের জন্য কিছুটা জায়গা ছিল। আর ভারতীয় উপমহাদেশে ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের প্রাধান্য। ইউরোপ নিজে ছিল কিছুটা খ্রিষ্টান, কিছুটা পৌত্তলিক। ধর্মীয় দিক থেকে ইসলামের আগমন ছিল বিলম্বে এবং সত্যি বলতে কী, রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রভাব বিস্তার করতে সম ইতিহাসের শেষ নতুন ধর্ম। তবে ইসলাম দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ে দেরিতে আসার ঘাটতি পুষিয়ে নেয়, মধ্যপ্রাচ্যে এক সময় খ্রিষ্টান ও

জরস্ত্রীয় ধর্মের অধীনে থাকা বিশাল অঞ্চলে প্রাধান্যমূলক অবস্থান গ্রহণ করে। ইসলামের আত্মপ্রকাশ না ঘটলে খুবসম্ভব ইস্টার্ন অর্থোডক্স খ্রিষ্টধর্ম এখনো মধ্যপ্রাচ্যের (সম্ভবত ব্যতিক্রম হিসেবে ইরানে থাকত জরাস্ত্রীয় ধর্ম) প্রধান ধর্ম হিসেবে বিরাজ করত।

ইসলামের পরিচিতি বিশ্বের বিশাল অংশে অব্যাহত সম্প্রসারণ ও বিজয় অন্য যেকোনো বিজয়ের মতোই বিপুল রাজনৈতিক প্রভাব থাকলেও ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে প্রথম দশকগুলোতে স্থানীয় লোকজনের ওপর খুব কমই চড়াও হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিরাজমান ধর্মীয় পরিবেশে ইসলাম আসলে বিকশিত হয়েছে তুলনামূলক সহজাত ও অকৃত্রিম পন্থায়। বস্তুত যেটা বিস্ময়কর তা হলো, ধর্মতাত্ত্বিক পরিভাষায় ইসলামের বিরাজমান ধর্মীয় পরিবেশে বেশ সহজাতভাবে খাপ খাওয়ানো।

পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে উদ্ভট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রত্যন্ত ও বিচ্ছিন্ন মরুভূমিতে ইসলামের জন্ম তেমন কোনো অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা ছিল না। ইসলামের ধারণাগুলো দীর্ঘ দিন ধরে তীব্র ধর্মীয় বিনিময়, নানা উপাদানের সংযোগ এবং বিতর্ক প্রত্যকারী বৃহত্তর ভূমধ্যসাগরীয় পূর্বাঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্যের সাংস্কৃতিক মিলন ভূমিতে সরাসরি প্রবাহিত হতে থাকে। অন্য কোনো অঞ্চলই সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্যের মতো এত বিচিত্রমুখী ধর্মীয় দল-উপদল প্রত্য করেনি। ইসলাম আত্মপ্রকাশের সময় আমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মের প্রাথমিক সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থিম ও উদ্বেগের পুনরাবৃত্তি দেখি। খ্রিষ্টধর্মের (আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই সেটা দেখব) প্রথম ছয় শ' বছরে ধর্মীয় ও মতাদর্শগত বিরোধ প্রত্য করার পর ইসলামের মোকাবেলা আমাদের বিস্মিত করে না; ইসলাম প্রচারিত যুক্তি ও বিশ্বাসগুলো বেশ পরিচিত বিতর্ক হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। এসব বিতর্কের মধ্যে রয়েছে : এক আল্লাহর প্রকৃতি কী? ইহুদি ধর্মের বার্তা কি মনোনীত জাতি হিসেবে ইহুদিদের জন্য, নাকি সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছিল? যিশু কি আল্লাহর পুত্র ছিলেন নাকি আল্লাহর দেয়া রুহসমৃদ্ধ মানুষ ছিলেন? আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই এ ধরনের অনেক বিতর্কের বিস্ময়কর প্রকৃতি যাচাই করব, ল করব রাজনৈতিক শক্তির মদদপুষ্ট ধর্মীয় মতবাদগুলো বিজয়োল্লাস করছে, আর কম রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া মতবাদগুলো পথভ্রষ্ট হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে।

সর্বোপরি, আমরা দেখব, পরস্পরের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠযুক্ত এসব মতাদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিভাবে ছিল মহান সাম্রাজ্যগুলোর রাজনীতি। মতা প্রতিনিয়ত ধর্মকে আকৃষ্ট করেছে এবং ধর্ম আকৃষ্ট করেছে মতাকে। ধর্মতত্ত্ব নিছকই গৌণ বিষয়। অধিকন্তু, সংস্কৃতি, সময়, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও বিশ্বাসের স্থায়ী শক্তিগুলো মতাধর, সেগুলো নতুন ঘটনাবলিকে নিজের মতো করে গড়া পথে পরিচালিত করার বিপুল সামর্থ্য রাখে। নতুন ও অবিশ্বাস্য সভ্যতার দীপ্তি ছড়ানো ইসলাম ছিল অনেকটাই এর বৃহত্তর পরিবেশের নিজস্ব পণ্য।

আরব দেশ

আরব ভূখণ্ড নিজেও কোনো বিচ্ছিন্ন স্থান ছিল না, বরং ধর্মীয় চিন্তাধারা ও উত্তেজনার তীব্র আঞ্চলিক আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে থাকা ইয়েমেন ছিল মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতাকেন্দ্র এবং সম্ভবত সেমেটিক সব জনগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান। সেমিটিক উপজাতিগুলো সেখান থেকে প্রথমে মেসোপটেমিয়ায় যায়, বিসিইতে (প্রচলিত সাল গণনার আগে) সুমেরিয়া জয় করে সেটাকে সেমিটিক সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করে। লোহিত সাগর উপকূল থেকে মিসর, সিরিয়া (লেভেন্ট) এবং ভূমধ্যসাগরীয় (মেডিটেরানিয়ান) এলাকাজুড়ে সমৃদ্ধ মসলা ও বস্ত্র ব্যবসা ছিল। আদিকাল থেকে ইয়েমিনিদের সাথে ফিনিশীয়দের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। কিংবদন্তি অনুযায়ী, সেবার রানী ইয়েমেনে বাস করতেন, ইথিওপিয়ার অক্সাম রাজ্যের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। ইয়েমেনে খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের বিপুল জনগোষ্ঠী ছিল। কিছু সময় সেখানে পারসিকরা (ইরানি) ছিল।

আরো উত্তরে লোহিত সাগর উপকূলে (হিজাজ) থাকা চার হাজার বছরের ইতিহাস সমৃদ্ধ মক্কা ছিল আরবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নগরীগুলোর অন্যতম। নবী হজরত মুহাম্মদের সা: সময় পর্যন্ত প্রাচীন ইতিহাসগুলোতে মক্কার ঐতিহাসিক উল্লেখ (অন্তত বাইরের সূত্রগুলোতে) দেখা যায় অতি সামান্য। তবুও নগরীটি সিরিয়াগামী লোহিত সাগরীয় বাণিজ্য রুটে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। হিজাজের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী বিশেষ করে মদিনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইহুদি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের খ্রিষ্টান ভূখণ্ড ছিল ঠিক উত্তরে, বর্তমানে সিরিয়া ও জর্ডান ছিল এর প্রধান দু'টি কেন্দ্র।

আরব দেশ অনেকটা আদিকালের ইহুদিসহ অন্যান্য সেমিটিক জনগোষ্ঠীর মতো স্থানীয় বা গোত্রীয় দেব-দেবীদের নিয়ে নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী ধর্ম বিকশিত করেছিল। প্রার্থনার প্রধান কেন্দ্র ছিল মক্কার কাবায়, সেখানে ছিল প্রায় ৩৬০টি দেবতার অবস্থান। এমনকি যিশু ও মেরির (হজরত ঈসা আ: এবং মা মরিয়ম) মূর্তি ছিল বলেও প্রচলিত রয়েছে। ধর্মীয় স্থাপনাগুলো মক্কাকে বেশ ভালোরকম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়েছিল : উপদ্বীপের জটিল আন্তঃগোত্রীয় রাজনীতি তদারকি এবং উপজাতীয় যুদ্ধ

সীমিত করার লক্ষ্যে গঠিত বিশাল গোত্রীয় কনফেডারেশনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই অঞ্চল দিয়ে বাণিজ্য অব্যাহত রাখার জন্য নগরীটি বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে সন্ধিভিত্তিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলত। মক্কার সমৃদ্ধি ছিল নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তেজনার প্রত্যক্ষ উৎস, একই সাথে তা নতুন কিছুর জন্য শূন্যতাও সৃষ্টি করেছিল। কারণ উদীয়মান পুঁজিবাদী বাজারভিত্তিক অর্থনীতির চাপে পুরনো গোত্রগত কাঠামো ও বংশগত সমর্থনব্যবস্থা ভেঙে পড়ছিল; পুরনো সামাজিক মূল্যবোধ ম্লান হয়ে যাচ্ছিল।

এমনই ছিল ৬১০ সালে মক্কার তরুণ বণিক হজরত মুহাম্মদ সা:-এর ওহি লাভ করে একেশ্বরবাদী ধারণার চলমান প্রবাহে নতুন অধ্যায় যোগ করার সময় ভৌগোলিক ও ধর্মতাত্ত্বিকভাবে এলাকাটির অবস্থা। শৈশবে হজরত মুহাম্মদ সা: এতিম হয়েছিলেন, তিনি তাঁর চাচার সাথে ছিলেন। বলা হয়ে থাকে, ৪০ বছর বয়সে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতায় পর্বতের গুহায় ধ্যান করার সময় বেশ নতুন এক অভিজ্ঞতা লাভ করেন : কয়েকবার তাঁর কাছে আসা ফেরেশতা জিব্রাইল আল্লাহর কাছ থেকে আনা বাণী তাঁকে অবগত করেন। তাঁকে আল্লাহ এক- এই বাণী প্রচার করতে বলা হয় এবং এই বাণী আঞ্চলিক গোত্রগুলো এবং পৌত্তলিক ও বহু দেবতায় বিশ্বাসী মক্কার কলুষিত সমাজে পৌঁছাতে বলা হয়। হজরত মুহাম্মদ সা: ওই বাণী প্রচার এবং নির্দয় ও বৈষম্যপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা এবং মক্কার কর্তৃত্ব ও বাণিজ্যের প্রধান প্রতীক কাবায় বহু ঈশ্বরবাদের এসব দেবতার পূজনীয় উপস্থিতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে উদ্যোগী হন। যিশু ও মহাজনেরা ছিল তার আশু লক্ষ্য। তবে হজরত মুহাম্মদ সা:-এর রাজনৈতিক ভিশনও ছিল।

আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হজরত মুহাম্মদ সা: শুরুতেই ইসলামে প্রথম নবী হজরত আদম আ: এবং হজরত ইব্রাহিম আ:সহ তাওরাতে (ওল্ড টেস্টামেন্ট) বর্ণিত অতীত নবীদের সারিতে নিজেকে স্থাপন করেন। বস্তুত এসব ওহি নিয়ে গ্রন্থিত পবিত্র কুরআন এসব ব্যক্তিত্বকে 'প্রথম মুসলমান' হিসেবে শনাক্ত করে, যদিও প্রচলিত ধারণা অনুসারে তারা তা ছিলেন না। অবশ্য ওই সময়ের মুসলিম হিসেবে তাদের পরিচিত করানো হয় স্রেফ এ কারণে যে তারা ছিলেন আল্লাহর একত্ব ও ক্ষমতার অভিজ্ঞতা ও স্বীকারকারী প্রথম মানুষ। হজরত মুহাম্মদ সা: জোর দিয়ে বলেন, তিনিও আল্লাহর রাসূল ও নবী ছাড়া আর কিছুই নন, তার কোনো খোদায়ি প্রকৃতি নেই। বস্তুত, ওই অঞ্চলের লোকজনের কাছে তাঁর বাণী নাটকীয়তাপূর্ণ নতুন কিছু ছিল না, বরং তা ছিল আল্লাহর একত্ববাদের শাশ্বত বাণী নতুন আকারে প্রবল কণ্ঠে ঘোষণা। হজরত মুহাম্মদ সা: স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন একটি ধর্মতত্ত্ব ঘোষণা করলেন, ছয় শ' বছর ধরে প্রাচ্যের খ্রিষ্টান ধর্মের ধর্মতাত্ত্বিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে যিশুর প্রকৃতি সম্পর্কিত দুর্বোধ্য ও সাংঘর্ষিক তত্ত্বগুলো নাকচ করে দিলেন।

তিনি নৈতিক সমাজ গঠনের জন্য আল্লাহর নির্দেশে ফিরে যাওয়ার ওপর গুরুত্ব দিলেন। ইসলাম গ্রহণের নির্দেশিকা ছিল খুবই সহজ : নবাগতদের কেবল বিশুদ্ধ হৃদয়ে এই সাক্ষ্য দেয়ার দরকার হতো : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ– 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রতিপালক নেই, মুহাম্মদ তাঁর বার্তাবাহক।' সব মুসলমানের কাছ থেকে পাঁচটি স্তম্ভ বা কর্তব্য পালন করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়। এগুলো হচ্ছে : সাক্ষ্য দান করা, দিনে পাঁচবার নামাজ পড়া, রমজান মাসে রোজা রাখা, জীবনে একবার হজ করা এবং জাকাত প্রদান।

ঈমান গ্রহণ করার শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে এক আল্লাহতে বিশ্বাস, আল্লাহর সব নবীর (হজরত মুসা আ: হজরত ঈসা আ: এবং হজরত মুহাম্মদ সা:) ওপর বিশ্বাস, ফেরেশতায় বিশ্বাস, আল্লাহর নাজিল করা প্রধান প্রধান কিতাবের (এগুলোর মধ্যে রয়েছে ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন) ওপর বিশ্বাস, শেষ বিচার ও পুনরুত্থানের ওপর বিশ্বাস, ভাগ্য বা নিয়তির ওপর বিশ্বাস। নতুন ধর্মের এ তাত্ত্বিক ভিত্তিটি সহজে এর প্রচার, ব্যাখ্যা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়।

হজরত মুহাম্মদ সা: ছিলেন প্রথম 'মুসলমান', তথা প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী কিংবা আল্লাহর পরিকল্পনার কাছে প্রথম আত্মসমর্পণকারী। তিনি এক আল্লাহর বাণী স্বচ্ছ ও স্পষ্ট করা এবং পূর্ববর্তী ইহুদি ও খ্রিষ্টান বাণীগুলো মানবীয় ব্যাখ্যার কারণে ভুল ও অবিশ্বাসে ভারাক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তবে ওহির ধারা ছিল এক ও অভিন্ন।

সনাতন মুসলিম বিশেষজ্ঞরা ইসলামের আত্মপ্রকাশ কোনো ধরনের দুর্ঘটনা তথা এটা খোদায়ি না হওয়ার ধারণা পুরোপুরি নাকচ করে দেন। অন্য কথায় তারা হজরত মুহাম্মদ সা: লাভ করা ওহিতে সম্ভাব্য সব ধরনের বহিরাগত, আঞ্চলিক বা অখোদায়ী উৎস ও প্রভাবের কথা অস্বীকার করেন। তাদের নিজস্ব ধর্মতাত্ত্বিক বাধ্যবাধকতার কাঠামোর মধ্যে তা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু হজরত মুহাম্মদ সা: যে পরিবেশে বাস করেছিলেন, তাঁর মন, চিন্তা-চেতনা ও ব্যক্তিত্বে নিশ্চিতভাবেই তা প্রভাব বিস্তার করেছে, এটা ওহি ধারণ এবং তাঁর নিজের ও তাঁর অনুসারীরা তাঁর লাভ করা ওহি উপলব্ধি ও প্রয়োগ করার ভঙ্গিকে প্রভাবিত করত। এ কারণেই ওহির অভিজ্ঞতা ও ব্যাখ্যায় সম্ভাব্য ও যুক্তিসঙ্গত বহিরাগত প্রভাব, ইতিহাসের অন্যান্য নবি ও ধর্মীয় ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও ওহির তুলনা করাও যুক্তিসঙ্গত।

এই সময়টাতে পবিত্র কুরআনের মৌলিক নতুন বিধিবিধানগুলোর বেশির ভাগই আরব উপদ্বীপে সুপরিচিত ছিল। যিশুকে মসিহ হিসেবে অস্বীকার করে তাঁকে কেবল আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন রোগ নিরাময়কারী হিসেবে গ্রহণ করার ইহুদি বিশ্বাস দিয়ে শুরু হয়। একই সাথে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যিশুর প্রকৃতির প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে অনুমান করে নানা ধরনের 'ধর্মভ্রষ্টতাও' পরিচিত ছিল। বস্তুত পবিত্র

কুরআনের কঠোর একেশ্বরবাদ অনেক দিক থেকেই পরবর্তীকালে ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চের ধর্মভিত্তিক দ্বন্দ্বজনিত মতাদর্শগত আপসমূলক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে মধ্যপ্রাচ্যের একেবারে প্রাচীনতম খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিভঙ্গির বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল।

হজরত মুহাম্মদ সা: ছিলেন কোনো প্রধান ধর্মের প্রথম নবী, যিনি পুরোপুরি ইতিহাসের আলোতে বাস করেছেন। তাঁর জীবন এবং কার্যক্রম-সম্পর্কিত তথ্য প্রচুর পাওয়া যায়, পবিত্র কুরআনে এবং তারচেয়েও বেশি তাঁর সমসাময়িককালের লোকজনের বিবরণ থেকে, যারা হাদিস বা সুন্নাহ হিসেবে ঘটনাগুলো রেকর্ড করেছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও খ্রিষ্টানসহ অন্য প্রায় সব ধর্ম যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়, ইসলাম সেগুলোর সামনে পড়ে : নবীর জীবন ও কথা নিয়ে সমসাময়িকদের বর্ণনা কতটা নির্ভুল? এসব কথা ও কাজ কেবল মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে, ইসলামে এগুলো লিখিত আকারে সঙ্কলিত, বিশ্লেষিত ও পদ্ধতিগতভাবে মূল্যায়ন হয়েছে আরো শতাধিক বছর পর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন গসপেলগুলো 'নির্ভরযোগ্য' এবং কোনগুলো নয়, তা নির্ধারণ করতে যিশুর জীবনের সব ভাষ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে খ্রিষ্টান সমস্যার মতোই এটা। এখনো এতে অনুমান-নির্ভরতা রয়ে গেছে এবং সেটা শেষ হওয়ার নয়।

ইসলামে হাদিস আক্ষরিকভাবে আল্লাহর কাছ থেকে ওহির মাধ্যমে সরাসরি লাভ করা পবিত্র কুরআনের আয়াতের মতো পবিত্র না হলেও এগুলো ইসলামি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের চেয়েও অনেক সময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ উৎস বিবেচিত হয়েছে। কারণ, প্রথম দিকের ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে পবিত্র কুরআনে কোনো ইঙ্গিত নেই এমন অনেক সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ক্ষেত্রে হাদিসই অনেক বেশি কার্যকর গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বিবেচিত হয়েছে। নবী সা: নিজে প্রাপ্ত ওহিকে কিভাবে বুঝেছেন এবং পরিস্থিতির আলোকে প্রয়োগ করেছেন, সে সম্পর্কেও হাদিস গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দেয়। আজ যেসব খ্রিষ্টান বলেন, 'যিশু কী করতেন?' এটা তাদের জন্য একটা উদাহরণ।

কিন্তু তার পরও ইসলামের মধ্যে ছোট ছোট অনেক গ্র"প রয়েছে, যারা হাদিসের জটিল ও পরিবর্তনশীল প্রকৃতি, বিশ্বাসযোগ্যতার নানা মাত্রা এবং অনেক সময় কর্তৃপক্ষের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি রেখে অন্য হাদিস গ্রহণের প্রেক্ষাপটে আসমানি উৎসের কারণে একমাত্র কুরআনকেই ইসলাম বোঝার উৎস হিসেবে স্বীকার করার কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, এটা 'রিফরমেশন' আন্দোলনের 'সোলা ক্রিপটুরা' (কিতাবই একমাত্র) ভিত্তির সাথে তুলনীয়। কেবল কিতাবের ভিত্তিতে ধর্মতাত্ত্বিক উপলব্ধি প্রতিষ্ঠার অনুকূলে ওই আন্দোলন বিপুলসংখ্যক চার্চ ইতিহাস, এর প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি, কাউন্সিল রুলিং ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান করে।

একটি নতুন ইসলামি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায় বিনির্মাণে নতুন ওহিগুলো প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বাস্তব বাধা ছিল বিপুল, বিশেষ করে মক্কার এলিটদের (হজরত মুহাম্মদ সা: বার্তার কারণে তাদের ক্ষমতা, সম্পদ ও মর্যাদা হুমকির মুখে পড়ায়) কাছ থেকে আসা প্রথম দিককার সহিংস বিরোধিতা। তাঁর জীবন বিপদের মুখে পড়ল, নবী এবং তাঁর অনুসারীরা মদিনা নগরীতে হিজরত করলেন, সেখানে তিনি প্রথম মুসলিম সমাজ গড়ে তুললেন এবং আমন্ত্রণক্রমে শান্তিপূর্ণ একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্বন্দ্বরত পক্ষগুলোর মধ্যে মীমাংসার ভার নিলেন। এটাকে 'মদিনা সনদ' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এতে নগরীর নানা গ্র"পের (ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলমান) মধ্যকার অধিকার, দায়দায়িত্ব ও সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত ও সমন্বিতভাবে একটি দলিলে তুলে ধরা হয়। এ দিকে ৬৩০ সালে রক্তপাতহীন বিজয়ের ফলে মক্কার চূড়ান্তভাবে বিরোধিতা পরিত্যাগ এবং নবী সা: সাড়ম্বরে প্রত্যাবর্তনের আগে পর্যন্ত মদিনার মুসলিম সম্প্রদায় অনেক বছর ধরে ইসলাম বৈরী মক্কা বাহিনীর অব্যাহত সামরিক ও রাজনৈতিক হুমকির সম্মুখিন ছিল। সদ্য সৃষ্ট সম্প্রদায়টিকে ধ্বংস করতে চাওয়া শত্র"দের মোকাবেলায় মুসলিম ঐক্য নিয়ে উদ্বিগ্ন পবিত্র কুরআন উত্তেজনা, বৈরিতা, যুদ্ধ, পরিবর্তনশীল মিত্রতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার এ সময়কালটি রহস্যপূর্ণ ও অপেক্ষাকৃত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষামূলক কিছু আয়াতে প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এসব আয়াতের রহস্যাচ্ছন্নতা ও ক্রোধ ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে দাঁড়ানো সেমিটিক গোত্রগুলোর মোকাবেলায় ইসরাইলিদের সংগ্রামের সময়কার মতোই, যখন ওল্ড টেস্টামেন্ট ইহুদিদের সব শত্র"কে নির্মমভাবে পুরোপুরি ধ্বংস করার আহ্বান জানিয়েছে। উভয় ধর্মেই ওই গোলযোগপূর্ণ সময়ে সমন্বয় সাধন ও শান্তির প্রতি উৎসাহ ছিল না।

ইসলাম বিকশিত, বিস্তৃত ও সাম্রাজ্য বিনির্মাণে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে হাদিসের বিশ্বাসযোগ্যতা-সংক্রান্ত সমস্যা একটি বড় রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি করে। খ্রিষ্টান চার্চের মতো পরবর্তীকালের মুসলিম সেকুলার বা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ইসলামের বাণী কতটা ভূতাপেক্ষভাবে প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ বা ব্যাখ্যা কামনা করেছিল? খ্রিষ্টান ধর্মের বিপরীতে ইসলাম সৌভাগ্যক্রমে নবীর সম্ভাব্য আসমানি মদদ নিয়ে বিতর্ক থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তিনি বা অন্য কেউ এমন দাবি কখনোই করেননি। ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক ভিশনের সংযত রেখার কারণেও সম্ভবত খ্রিষ্টানদের চেয়ে এখানে কিতাবগত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ধর্মভ্রষ্টতা ও বিভক্তি অনেক অনেক কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও পবিত্র কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যার প্রশ্নটি আজো ইসলামের চলমান ক্রমবিকাশের প্রধান বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে।

ইসলাম বিস্তৃত হওয়ার সময় নতুন নতুন ভাষা, ভূগোল, সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সামনে পড়ে। অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামও নতুন বিশ্বাস গ্রহণ ও ধর্মান্তরের ব্যবস্থা করার জন্য স্থানীয় পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। অবশ্য পরবর্তীকালের সংস্কারকদের দৃষ্টিতে এসব খাপ খাওয়ানো ও উপজাতগুলো অনৈসলামিক, বিদয়াত বিবেচিত হয়ে ধর্মতাত্ত্বিক পরিশোধন ও মূলে ফেরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়েছে। এসব ইস্যু ইসলামি পুনর্জাগরণ এবং মৌলবাদের ভিত্তি গঠন করেছে। এ

ধরনের উপজাত মার্টিন লুথারের মতো প্রাথমিক কালের প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারকদের জন্যও প্রধান ইস্যু ছিল।

ধর্ম এবং সেগুলোর অনুসারীদের মধ্যে বিরোধ খুব কম ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট ধর্মতাত্ত্বিক মতপার্থক্যের কারণে ঘটে থাকে, বরং তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জটিলতাই হয় প্রধান কারণ। আসুন আমরা ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে তিন ধারার সম্পর্কের মধ্যে অস্তিত্বশীল সত্যিকারের ধর্মতাত্ত্বিক পার্থক্যের নির্যাস পরীক্ষা করে দেখি। এসব ধর্মতাত্ত্বিক পার্থক্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে বাস্তবে আসলেই কতটুকু সত্যিকারের পার্থক্য সৃষ্টি করত? আমরা আরো ঘনিষ্ঠভাবে তাকালে দেখি, একেশ্বরবাদের সুনির্দিষ্ট মৌলিক যুক্তিগুলোই এই অঞ্চল ও সংস্কৃতিকে বারবার প্লাবিত করেছে। আমরা লক্ষ করি, ক্ষেত্রটিকে ধর্মতাত্ত্বিক রূপান্তর না করে ইসলাম বরং অন্য দু'টি ধর্মের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে, এক ধরনের ধর্মতাত্ত্বিক ধারাবাহিকতা জোরদার করার ভান করেছে। ইহুদি-খ্রিষ্টান বিশ্বাসের কাছে অপরিচিত অনেকটা সংহতি নাশক সাংস্কৃতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক শক্তিই ইসলাম প্রতিনিধিত্ব করে কিংবা পরবর্তীকালে সৃষ্ট পাশ্চাত্যবিরোধী অনুভূতির ভিত্তিভূমি গঠন করেছে বলে আধুনিক জনপ্রিয় তত্ত্বগুলোর লক্ষ্য ইসলামকে এর সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে পুরোপুরি নির্মূল করে দেয়া। বস্তুত, ইসলাম পাশ্চাত্যের প্রতি বেশ প্রতিরোধমূলক মনোভাবসহ মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে গভীর সাংস্কৃতিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় ধারার প্রতিনিধিত্ব ও সম্প্রসারিত করেছে। ইসলাম ওইসব ধারার সৃষ্টি করেনি, ইসলামকে সরিয়ে নেয়া হলেও এসব ধারা বহাল থাকবে।

খ্রিষ্টান ও ইসলাম সম্পর্কে ইহুদি দৃষ্টিভঙ্গি

ইহুদিদের খ্রিষ্ট ধর্মের সমালোচনা সুস্পষ্টভাবেই পরবর্তীকালের বিপুলসংখ্যক খ্রিষ্টানকে ধর্মভ্রষ্ট এবং একই সাথে ইসলামি ধর্মতত্ত্বকে প্রভাবিত করেছে। পুরো মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর প্রথম ও একক ইস্যু ছিল মসিহ (ত্রাণকর্তা) প্রকৃতি-সম্পর্কিত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি : যিশু ছিলেন মসিহ, যাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ওল্ড টেস্টামেন্টে করা হয়েছে বলে খ্রিষ্টানেরা বিশ্বাস করলেও ইহুদিরা যিশুর মসিহ হওয়ার ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছে। অনেক খ্রিষ্টানের দৃষ্টিতে ইহুদিরা হলো সব ধরনের ধর্মভ্রষ্টদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য, কারণ তারা মসিহর আগমন সম্পর্কে তাদের নিজেদের কিতাবের কথিত ভবিষ্যদ্বাণীই আসলে অস্বীকার করছে। ইহুদি পণ্ডিতেরা এই যুক্তি পুরোপুরি অস্বীকার করে দাবি করেন, এটা সুস্পষ্ট যে ওল্ড টেস্টামেন্টে মসিহ সম্পর্কে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যিশু সে অনুযায়ী মসিহ নন। তারা দাবি করেন, সত্যিকারের মসিহকে মসিহ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে মসিহসংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করতে হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে : তাকে রাজা ডেভিডের (হজরত দাউদ আ:) পুরুষ বংশধরদের ধারায় জন্মগ্রহণ করতে হবে (বলা হয়ে থাকে, আল্লাহ তাঁকে জন্ম দিয়েছেন); তাঁকে তাওরাতের বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে (যিশু কোনোভাবে তা করেননি, এবং বাস্তবিকই বিধানটি পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন)। সত্যিকারের মসিহ বিশ্বে শান্তির নতুন যুগেরও সূচনা করবেন; ঘৃণা, বিদ্বেষ থাকবে না। এমনটাও ঘটেনি। ওল্ড টেস্টামেন্টে প্রত্যাশা করা হয়, আগমনের সাথে সাথেই মসিহ এসব ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করবেন, 'দ্বিতীয় আগমনের' (যার কোনো উল্লেখ নেই ওল্ড টেস্টামেন্টে) পর নয়। যিশু বা অন্য কারো কোরবানির বিনিময়ে মানবজাতির রক্ষা পাওয়ার ধারণাও ইহুদিরা স্বীকার করে না। তাদের মতে, ইহুদি বিধানে বর্ণিত নির্দেশিত সত্যনিষ্ঠ জীবনযাপনই মুক্তির একমাত্র উপায়।

ইহুদি ধর্মের একেশ্বরবাদ গ্রহণ এবং সেটাকে কলুষিত করা; ইহুদিদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি এবং ইহুদি ধর্মকে দুর্বল করার জন্যও ইহুদিরা যিশুর ভর্ৎসনা করে থাকে। মধ্যযুগের মহান ইহুদি দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ মাইমোনিদেস (মুসলিম স্পেনে বসবাস করেছিলেন) কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে বলেছিলেন : এই পরিকল্পনা (ইহুদি জাতিকে কোনো চিহ্ন না রেখে পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দেয়া) গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন নাজারানের যিশু, তার হাড় ধুলায় মিশে যাক...। তিনি তাওরাতের প্রতি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং প্রতিটি ও সব ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনিই যে মসিহ, সেটা

এবং তাকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করতে লোকজনকে প্ররোচিত করেছেন। তিনি এমনভাবে তাওরাত এবং এর অনুশাসনের ব্যাখ্যা করতেন, যার ফলে সেগুলোর পুরোপুরি বাতিলের পথে, এর সব নির্দেশনা বিলোপের এবং এর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের দিকে তাদেরকে চালিত করত। রহমতপুষ্ট স্মরণশক্তিসমৃদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিরা আমাদের জনগণের মধ্যে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার আগেই তার পরিকল্পনাগুলো সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন এবং তার জন্য যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন।

অর্থাৎ ইহুদি দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, এসব যুক্তি ওল্ড টেস্টামেন্টে মসিহ সম্পর্কে ইহুদিদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করা থাকলেও তারা স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করছে বলে খ্রিষ্টানেরা যে দাবি করে তা বাতিল করে দেয়। বরং এসব সমালোচনায় দেখা যায়, ইহুদি পণ্ডিতদের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ ছিল, তাদের কাছে থাকা ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মসিহ হওয়ার যোগ্যতার জন্য যেসব শর্ত ছিল, যিশু তা পূরণ করতে পারেননি। ইসলাম এ ব্যাপারে আসলে মাঝামাঝি পথ গ্রহণ করেছে এই বলে যে যিশু ছিলেন আল্লাহর অন্যতম মহান নবী এবং তিনি সত্যিই কুমারি মরিয়মের (ভার্জিন মেরি) গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। পবিত্র কুরআনের উনিশতম সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'মরিয়াম' বলে। পবিত্র কুরআনে তার সম্পর্কে অন্য যেকোনো নারীর চেয়ে বেশিবার উল্লেখ করা হয়েছে, এমনকি নিউ টেস্টামেন্ট (বাইবেল) থেকেও বেশিবার। ইসলামে তিনি সবচেয়ে পবিত্র নারী ব্যক্তিত্ব।

অবশ্য ইসলাম অনুযায়ী, যিশু নিজে খোদা নন কিংবা তিনি জৈবিক অর্থে আল্লাহর ছেলেও নন। তবে তিনি আল্লাহর রুহসমৃদ্ধ মানব নবী। আল্লাহ কঠোরভাবে একক। আর মুসলমানদের জন্য মহান নবী হিসেবে যিশুকে কোনো ধরনের অস্বীকার করাটা ইসলামি বিশ্বাসেরই লঙ্ঘন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মুসলমানেরা নিয়মিতভাবে যিশুর মর্যাদা অবমাননাকারী শিল্পকর্মকে ব্লাসফেমি হিসেবে অভিহিত করে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে দৃঢ়ভাবে যিশুকে 'আল্লাহর কালাম' হিসেবে, 'আল্লাহর রুহ' হিসেবে এবং 'আল্লাহর নিদর্শন' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের কোথাও যিশু সম্পর্কে কোনো ধরনের অমর্যাদাপূর্ণ কথা বা মন্তব্য করা হয়নি। ফলে ইসলামবিহীন বিশ্বে যিশু সম্পর্কে ইহুদি ধর্মে বর্ণিত অনেক কঠোর ইহুদি সমালোচনা নিশ্চিতভাবে বিরাজমান থাকবে।

ইহুদি ধর্ম সেই সাথে হজরত মুহাম্মদ সা: নবী হিসেবে স্বীকার করে না। তবুও ইসলাম ও ইহুদি ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক অবাক করা। মননশীলতার দিক থেকে খ্রিষ্টান ধর্মের তুলনায় ইহুদি ও ইসলাম ধর্ম দু'টির মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা অনেক বেশি। ইহুদি ও ইসলাম উভয় ধর্মই কঠোরভাবে একেশ্বরবাদী, উভয় ধর্মেই প্রতিদিন কয়েকবারের ইবাদতে আল্লাহর একত্বের কথা ঘোষণা করা হয়। ইহুদি ও আরব উভয়ই সেমিটিক জনগোষ্ঠী, তারা অনেক বেশি অভিন্ন ব্যাপ্তি, অভিন্ন ইতিহাস লালন করে, তারা যে ভাষায় কথা বলে, সেগুলো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইসলাম ও ইহুদি উভয় ধর্মই কঠোরভাবে অনুশাসনভিত্তিক, ব্যক্তিজীবনে অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত মুক্তির ধারণায় বিশ্বাসী। উভয়েরই

ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী অনেক ইস্যু নিরসনের জন্য সামাজিক অনুশাসন আদালত রয়েছে। ইহুদি ধর্ম দৃঢ়ভাবে বলে, খোদাকে মূর্ত বা ব্যক্তি হিসেবে রূপায়িত করা যায় না, তিনি কোনো ধরনের মানবীয় আকার ধারণ করেন না। ইসলাম খোদাকে মানবীয় গুণে তুলে ধরার ওই ধারণা সম্পর্কে একই বিশ্বাস পোষণ করে। ফলে ইহুদি ও মুসলমান উভয়ের কাছেই খ্রিষ্টান শিল্পকলা (বিভিন্ন স্টাইলে- সাধারণত সাদা পোশাকে, সাদা দাড়িতে, শ্বেতাঙ্গ বৃদ্ধলোক হিসেবে ঈশ্বরকে এবং নানা অবয়ব এবং সাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততায় ব্যাপক বৈচিত্র্যে যিশুর ছবি ছড়িয়ে দেয়া সংশ্লিষ্ট) ব্লাসফেমিমূলক না হলেও বেদনাদায়ক বিষয়।

খাবারবিষয়ক রীতিনীতি, প্রাণী জবাই, শূকর নিষিদ্ধ করা, পাকপবিত্রতার নানা বিধিনিষেধের ব্যাপারে ইহুদি ও ইসলাম উভয় ধর্মই অভিন্নতা অনুসরণ করে চলে। ইসলাম এগুলোর বেশির ভাগ ইহুদিদের কাছ থেকে লাভ করলেও জটিল ইহুদি 'কোশার' আইন ব্যাপকভাবে সহজ করেছে। প্রাচ্যের ইহুদিরা (সেফারদিম) কয়েক শ' বছর মুসলমানদের সাথে বাস করার মাধ্যমে তাদের ধর্মের অনুশীলনে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বাস করার সময় মানবজাতির রক্তাক্ত ইতিহাসে ইহুদিরাও দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। কিন্তু তবুও ইহুদি পণ্ডিতেরা প্রায় একবাক্যে স্বীকার করেছেন, খ্রিষ্টান সমাজের চেয়ে মুসলিম সমাজেই ইহুদি সম্প্রদায় ও ধর্ম অনেক বেশি ভালোভাবে ছিল। ইউরোপে হলোকাস্টের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার পর ইহুদিদের আবাসভূমি হিসেবে (ফিলিস্তিনিদের ভয়াবহ মূল্যে) ১৯৪৮ সালে ইসরাইল সৃষ্টির পর নাটকীয় ও দুঃখজনক অধ্যায়ে রূপান্তরিত হয়ে এখন ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যকার সম্পর্ক উত্তেজনাকর ও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। বস্তুত পারস্পরিক অবিশ্বাসপূর্ণ সম্পর্কটি এখন পুরোপুরি ভূ-রাজনৈতিক, ভূখণ্ডগত মালিকানা নিয়ে যুদ্ধ এবং নবগঠিত ইসরাইল রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল।

ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্ম প্রশ্নে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

তিন ইব্রাহিমি ধর্মের শেষ ধর্ম হওয়ায় ইসলাম আগের ধর্ম দু'টির বিবর্তনের দিকে ফিরে তাকাতে সমর্থ হয়েছে। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী, ওহি লাভের সময় ইহুদিরা বেশ কিছু মারাত্মক ভুল করেছিল : ইহুদিরা নিজেদের আল্লাহর একমাত্র মনোনীত জাতি হিসেবে দেখেছিল, তারা এক আল্লাহকে ইহুদিদের আল্লাহ হিসেবে মনে করেছিল, তারা ধরে নিয়েছিল, ইহুদি ধর্মের বার্তা কেবল ইহুদিদের জন্য। কিন্তু পবিত্র কুরআন বলে- না, আল্লাহর কোনো মনোনীত জনগোষ্ঠী নেই : 'যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, দয়াময় তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা।' (কুরআন ১৯ : ৯৬)। এটা অবশ্যই সেন্ট পলের বক্তব্য (আল্লাহ কেবল ইহুদিদের জন্য নয়, সব মানুষের জন্য- যিশুর এই বাণী) এবং একই সাথে ইহুদি ধর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। অর্থাৎ ইসলাম তার ইহুদি পূর্বসূরিদের থেকে সংশোধনমূলক অবস্থান গ্রহণ করে এবং যিশু সর্বজনীনতার দাবি করেছিলেন বলে যে কথা সেন্ট পল ভাষ্যে রয়েছে, ইসলাম তা দ্বারা সম্ভবত প্রভাবিত।

আবার খ্রিষ্টধর্মের কিছু ব্যাপারে সমালোচনায় ইসলাম ও ইহুদি ধর্ম অভিন্ন অবস্থানও গ্রহণ করে। উভয়েই আল্লাহর কোনো 'পুত্র' থাকাটা এক আল্লাহর ধারণার (আল্লাহ কাউকে জন্ম দেননি, তাকে আরো ভাগে ভাগ করা যায় না) প্রতি ব্লাসফেমি মনে করে। তাদের মতে, ত্রিত্ববাদ বহু ঈশ্বরবাদেরই নামান্তর, যা ইহুদি ও মুসলিম উভয়ের কাছেই খারাপ কাজ বিবেচিত। ইসলাম অনুযায়ী, যিশু ক্রুসে মারা যাননি, তাকে আল্লাহ বেহেশতে নিয়ে গেছেন। আর হজরত মুহাম্মদ সা: নন, বরং এই যিশুই খ্রিষ্টবিরোধীদের দমাতে, ইসলামের শত্রুদের শাস্তি দিতে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে কিয়ামতের আগে দুনিয়ায় ফিরে আসবেন।

যদিও সময়ের পরিক্রমায় ঐতিহাসিক বিবর্তন ধর্ম সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি বদলে দিয়েছে; এই বাস্তবতা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করে। মুসলমানেরা এই বাস্তবতা প্রায়ই স্বীকার করে, যদিও তা কিছুটা নিজেদের সুবিধাজনক হওয়ার কারণে। একাধিকবার মুসলমানেরা আমাকে বলেছেন, "তিনটি ধর্মই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, তবে মানব ইতিহাসের বিবর্তনের নানা সময়ে সেগুলো

তারা লাভ করেছে। আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি প্রতিবারই আরো উন্নত হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিগত পরিভাষায়, আমরা ইহুদি ধর্মকে ওয়ার্ড ২.০ বিবেচনা করতে পারি, ওই সফটওয়্যারটি ওই সময়ে খুবই যথাযথভাবে কাজ করত, তবে এখনো ইচ্ছা করলে তা দিয়ে কাজ চালানো সম্ভব। আর খ্রিষ্টান ধর্মের ব্যাপারে বলা হয়, এটা ওয়ার্ড ৫.০, সেটা আল্লাহর বাণী উপলব্ধিতে সফটওয়্যারের অনেক আপগ্রেডিং। এর পর ছয় শ' বছর পর ইসলাম যা নিয়ে এলো তা অনেকটা ওয়ার্ড ৮.০-এর মতো। এটা আল্লাহ এবং তাঁর সব বাণী সম্পর্কে সবচেয়ে অত্যাধুনিক ধারণা। প্রতিটি 'ভার্সন'ই কাজ করে, সবই গ্রহণযোগ্য, অবশ্য সময়ের পরিক্রমায় আপগ্রেড হয়েছে।"

মাইক্রোসফটের উপমা মেনে নিলেও কিছু নন্দিত মুসলিম চিন্তাধারার ধর্মীয় বিবর্তনের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করা আমাদের জন্য বলতে গেলে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে ধর্মের বিবর্তন উপলব্ধির এই একই ধারণা ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কারেন আমর্স্টং তার 'হিস্টরি অব গড' গ্রন্থে সময়ের পরিক্রমায় ধর্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে মানুষের চলমান বিবর্তনের সুস্পষ্ট মাইলফলকগুলো শনাক্ত করেছেন।

উচ্চতর প্রযুক্তিগত নিজস্ব উপমাটি দিয়ে মুসলমানেরা যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন সৃষ্টির যে দরজাটি খুলে দিয়েছেন, সেটা ইসলামে সত্যিই ধর্মভ্রষ্টতা : তাহলে কি আরো নতুন ওহি তথা ওয়ার্ড ৯.০ আসার কোনোই সম্ভাবনা নেই? মুসলমানরা বিশ্বাস করে, নবী হজরত মুহাম্মদ সা: চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ বাণী নিয়ে এসেছেন, যা আর উন্নত করা যায় না; আর কোনো বৈধ নবীর আগমন ঘটবে না। এ কারণে হজরত মুহাম্মদ সা: 'নবুওয়াতির সিলমোহর'। এ বিশ্বাসটি ইসলামকে বেশ অদ্ভুত স্থানে রেখেছে : ধর্মীয় ইতিহাসের পেছনের দিকে তাকালে তারা বেশ সহিষ্ণু, তবে সামনের দিকে তাকালে তথা মুহাম্মদ-পরবর্তী নতুন ওহি-সম্পর্কিত সম্ভাব্য যেকোনো ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অসহিষ্ণু। পরবর্তীকালে আসা আহমদিয়া, শিখ বা বাহাই ধর্মের সাথে ইসলামের তীব্র উত্তেজনার উৎস এখানেই নিহিত। এসব ধর্মের কিছু ভিত্তি ইসলামে রয়েছে, তবে বাস্তবে পরবর্তী নবীদের প্রচারিত 'আপডেট' ইসলাম। অসহিষ্ণুতার কারণেই এ তিনটি আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলিম আলেমরা প্রবলভাবে সোচ্চার। এসব ধর্মের অনুসারীরা বিভিন্ন মুসলিম দেশে নির্যাতনের শিকার হয়।

ইসলাম প্রসঙ্গে ইহুদি ও খ্রিষ্টান দৃষ্টিভঙ্গি

তিন ইব্রাহিমি ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে নতুনটি তথা ইসলাম সম্পর্কে ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করব, এ দৃষ্টিভঙ্গি আরো কম উদার। ইসলাম যেখানে ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের বিপুল অংশকে স্বীকার করে নিয়েছে, তার বিপরীতে ইহুদি ও খ্রিষ্টান কোনো ধর্মই হজরত মুহাম্মদ সা:কে এমনকি আল্লাহর নবী বলে পর্যন্ত স্বীকার করে নেয়নি। হজরত মুহাম্মদ সা:-এর মাধ্যমে ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের বাণী কোনো না কোনোভাবে 'আপডেট' হওয়ার ধারণাটিও তারা প্রত্যাখ্যান করে। যুগ যুগ ধরে খ্রিষ্টান সাহিত্যে হজরত মুহাম্মদ সা:কে ধর্মভ্রষ্ট, এমনকি দান্তের ইনফারনোতে বর্ণিত দোজখের সর্বনিম্ন স্থানে নিক্ষেপসহ শয়তান হিসেবেও অভিহিত করেছে। (এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ক্যাথলিক ধর্ম ঐতিহাসিকভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মকে ধর্মভ্রষ্টতা এবং তাদের শয়তানি কর্ম হিসেবে অভিহিত করে। এই অনুভূতিটি পারস্পরিক।)অর্থাৎ ইব্রাহিমি তিন ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক জটিল ও অবাক করা : অনেক ক্ষেত্রে তারা একে অন্যের সমান্তরাল, আবার অন্য কিছু বিষয়ে একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু তবুও মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিশালী একেশ্বরবাদী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ইসলাম একটি শক্তিশালী নতুন অধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। একই অঞ্চলে খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মের মতোই ইসলাম জন্ম নিয়েছে এবং সহাবস্থান করেছে। ইসলাম সত্যিকার অর্থে একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলেও আমরা একটি একেবারে আনকোরা ধর্ম, নতুন স্রষ্টা বা নৈতিকতার নতুন উপলব্ধির কথা বলছি না। ইসলামের কোনোই অস্তিত্ব যদি না থাকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগতভাবে অনেক কম সমৃদ্ধ হয়ে পড়বে, তবে মধ্যপ্রাচ্যে চিন্তা-চেতনার সাংস্কৃতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি সম্ভবত খুব বেশি ভিন্ন হবে না।

প্রায় সব ধর্মই আগের ধর্ম ও মতাদর্শ থেকে বিকশিত হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম উদ্ভব হয়েছে হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি ও দর্শন থেকে, যদিও হিন্দুরা একে ধর্মভ্রষ্টতা বিবেচনা করে না। শিখ ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে হিন্দু ও ইসলাম উভয় থেকে। বাহাই ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে খ্রিষ্টান ও ইসলাম থেকে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সমসাময়িক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের খাপ খাওয়ানোর জন্য পূর্ববর্তী ধর্মীয় অনুপ্রাণন ও উপলব্ধিগুলো আরো তীক্ষ্ণ, স্বচ্ছ ও নতুন ব্যাখ্যা দিতে হিমশিম খেতে থাকায় এক অর্থে ধর্মভ্রষ্টতা বিবর্তন-সংক্রান্ত ধর্মীয় চিন্তামূলক সৃষ্টিশীল কাজে পরিণত হতে পারে।

নির্মম বাস্তবতা হলো, এটা অবাক করা বিষয় যে এসব ধর্মের প্রতিটির মধ্যে এটা সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি এবং সাংস্কৃতিকভাবে সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, যা তাদের অনুসারীরা তাদের ধর্মের সবচেয়ে অপরিহার্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে; এসব খুঁটিনাটি বিষয়কে এমনকি অন্যদের বিরুদ্ধে সহিংসতাও উসকে দিতে পারে। বিষয়টি পাস্তা পুড়ে যাওয়ার চেয়ে রান্নাঘরে ক্রুদ্ধ বৈবাহিক বিস্ফোরণের সাথে তুলনীয় : ক্রোধটা খুবই সত্য, কিন্তু বাইরের পর্যবেক্ষকেরা সাথে সাথে বুঝতে পারে, পাস্তা অখাদ্যে পরিণত হয়েছে কি না সেটার চেয়ে বড় কিছু এখানে আছে।

এ কারণে মধ্যপ্রাচ্য এবং এর ধর্মগুলোর ক্ষেত্রে ধর্মতত্ত্বই প্রকৃতপক্ষে সঙ্ঘাতের উৎসের প্রতিনিধিত্ব করে না। পরিচিতি, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র, রাজনীতি, ক্ষমতা, আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদসহ আরো অনেক কিছু এর সাথে জড়িত। ধর্ম স্রেফ দরকারি ট্যাগ হিসেবে কাজ করে, পরিচিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সৃষ্টি করে, যেখানে সুনির্দিষ্ট ধর্মতত্ত্ব আসলেই স্রেফ কাকতালীয় ব্যাপার। সত্যি বলতে কী, আমরা বিরলভাবে ইচ্ছাক্রমে খ্রিষ্টান, মুসলমান বা ইহুদি; আমরা এসব ঐতিহ্যের কোনো না কোনোটিতে জন্মগ্রহণ করেছি, যার সম্প্রদায়গত সমৃদ্ধি আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি; বিষয়টা আমাদের কাছে নানা বিকল্প ধর্মতত্ত্বের মধ্য থেকে বেছে নেয়ার বিষয় নয়। ইতিহাসে ইহুদি সম্প্রদায়ের দৃঢ় সাংস্কৃতিক শক্তি রয়েছে, তবে সেটা ইহুদি ধর্মের সুনির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের কারণে নয়। সেগুলো ভিন্ন হতে পারে এবং ভিন্ন হয়ও। এটা সত্যিই সাংস্কৃতিক পরিচিতি এবং ধর্মতাত্ত্বিক আঠা (যেকোনো ধর্মতত্ত্ব) যা কোনো সম্প্রদায়কে জাতিগত বা ধর্মীয় ভিত্তিতে টিকিয়ে রাখে। একই কথা প্রযোজ্য খ্রিষ্টান উপদলগুলোর বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও। সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠায় ধর্ম সাহায্য করে; সম্প্রদায় সম্প্রদায়গত নিরাপত্তা, সম্পদ, নেতৃত্ব ও মালিকানা প্রশ্নে সঙ্ঘাত কিংবা এমনকি যুদ্ধ পর্যন্ত বাধিয়ে দিতে পারে।

আমাদের আধুনিক যুগে, ধর্মীয় সমন্বয় ও সার্বজনীনতার দিকে বিশ্ব বেশ জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এমনকি অভিন্নতা পর্যন্ত স্বীকার করেছে। যেমন আমাদের নিয়মিত ব্যবহার করা 'ইহুদি-খ্রিষ্টান' পরিভাষাটি সাম্প্রতিক কালের, এটা জনপ্রিয় হয়েছে বিশ শতকে। খ্রিষ্টান ধর্মের ইতিহাসের বেশির ভাগ সময়ে ইহুদিবিরোধী বৈষম্যের বিষয়টি এড়িয়ে নির্দিষ্ট ধর্মীয় মিলন স্বীকার করে নেয়ার উদ্দেশ্যে প্রণীত, যদিও ধর্মতাত্ত্বিক পরিভাষায় খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মের মধ্যকার মতপার্থক্য তিন ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। আর গত ২০ থেকে ৩০ বছর ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলামকেও অভিন্নতার পতাকাতলে আনার জন্য 'ইব্রাহিমি ধর্মবিশ্বাস' বেশ চালু হচ্ছে। ধর্মতত্ত্ব তেমন বদলায়নি, ব্যবধান অতিক্রম করতে মানুষের ইচ্ছা হয়েছে।

ধর্ম, রাষ্ট্র, ক্ষমতা ও ধর্মভ্রষ্টতা

ধর্ম ব্যতিক্রমী শক্তিশালী মানবীয় শক্তি। এটা জীবন, মৃত্যু, যুদ্ধ, নৈতিক আচরণ, সম্প্রদায় ও যৌনতার মতো গভীর আবেগময় বিষয়গুলোর কী অর্থ প্রকাশ করে তা নিয়ে কাজ করে। এটা ব্যক্তি মানুষের মন, মানসিকতা ও আচরণ নিয়ে কাজ করে। এর প্রভাব ব্যক্তিবিশেষের ওপর বিরলভাবে সীমিত, তবে সামাজিক প্রার্থনায় অংশ নেয়া পুরো বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ওপর সক্রিয় থাকে। একই সাথে সমমনা বিশ্বাসীদের সম্প্রদায়কে সংজ্ঞায়িত ও শক্তিশালী করতেও ধর্ম সহায়ক হয়।

এই শক্তির এমন ব্যতিক্রমী ক্ষমতা থাকার কারণে কি আমরা বিস্মিত হই যে, জাগতিক শক্তির কেন্দ্রগুলো তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ধর্মের শক্তিকে বর্ম পরাতে চায়? এই বইয়ের প্রধান বিষয়ই হলো : ধর্ম, শক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক। রাষ্ট্র চূড়ান্তভাবে ধর্মকে গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ করে এটাকে 'রাষ্ট্রধর্মে' পরিণত করতে চায়। একবার রাষ্ট্রের সাথে আবদ্ধ হতে পারলে ধর্মটির মতবাদ ও ধর্মতত্ত্ব রাষ্ট্রের মর্যাদা, ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে। ধর্মটি ইহুদি, খ্রিষ্টান বা ইসলাম হতে পারে; কোন ধর্ম তা আসলে কোনো ব্যাপার নয়। এর কারণ, ওই পর্যায়ে মতবাদ বিষয়ক মতানৈক্যটি স্রেফ ধর্মতাত্ত্বিক অনুশীলন না হয়ে বরং মারাত্মক রাজনৈতিক সম্পর্কে অর্থ প্রকাশের বিষয়ে পরিণত হয়। যারা রাষ্ট্র-প্রাধান্যপূর্ণ মতাদর্শের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেন, তাদেরকে ধর্মবিরোধী হিসেবে অভিহিত করা হয়- বাস্তবিকই, এ ধরনের পার্থক্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমপর্যায়ে পর্যবশিত হতে পারে।

কিন্তু ধর্মভ্রষ্টতা আসলে কী? শব্দটি জোব্বা পরিহিত যাজকীয় বিচারসভা, নির্যাতনের সরঞ্জাম, কান্নাভরা কণ্ঠে আগে ঘোষিত ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগের ঘোষণা, শহীদ এবং পোড়ানোর স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। ইতিহাসে এমনটা অনেক দেখা গেছে। বস্তুত ধর্মভ্রষ্টতা প্রায়ই বদনামের শিকার হয়েছে। বাস্তবে এটা ইতিহাসের সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া এবং ধারণার বিবর্তনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বলে মনে হয়।

'ধর্মভ্রষ্ট' (ইংরেজিতে 'heresy') শব্দটি উৎসে একেবারে নির্দোষ। গ্রিক ভাষায় উৎপত্তিতে এ দিয়ে স্রেফ 'পছন্দ' অর্থাৎ ধারণার একটা বিশেষ পথ অনুসরণ করার সচেতন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করত। খ্রিষ্টধর্মে

এটা দিয়ে গোঁড়া (অর্থোডক্স) শিক্ষা থেকে ভিন্নমত প্রকাশ বোঝানো শুরু করে। আবার অর্থোডক্সি (গোঁড়ামি) শুরুতে নিশ্চিতভাবেই কেবল বোঝাত 'সঠিক অভিমত'। কিন্তু কে বলবে কোন অভিমত 'সঠিক' বা 'নির্ভুল'? সমস্যার মূল এখানেই : ধর্মভ্রষ্টতার গুণগত মান আসলে নিহিত রয়েছে ধারকদের চোখে। কোনটা 'সঠিক পথ' তা নির্ধারণে চূড়ান্তভাবে উদ্ভূত হয় প্রায় কঠোরভাবে ক্ষমতার বিশেষ অধিকার হিসেবে।

ধর্মভ্রষ্টতা বেশির ভাগ ধর্মীয় বিশ্বাসের সূচনাকাল থেকেই বিরাজ করছে, যখন ব্যক্তিরা সম্প্রদায়ের ওপর সদ্য সংঘটিত বিপর্যয়ের জন্য দেবতা ও আত্মাদের প্রতি দোষারোপ-সম্পর্কিত সম্প্রদায়গত শিক্ষার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত ও সমালোচনা করত। ঈশ্বরদের শান্ত করার জন্য দুর্ভাগাদের বেদিতে বলি দেয়া হতো, কুমারীদের অগ্নিকুণ্ডে ছুড়ে ফেলা হতো। ওল্ড টেস্টামেন্টের নবীদের তীব্র সমালোচনা কিভাবে ইহুদি বৈষম্য ইহুদি জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্ভোগ বয়ে আনছে এবং কিভাবে স্রষ্টা তাঁর নির্দেশাবলি অবজ্ঞা করার জন্য সম্প্রদায়কে শাস্তি দিতে আসবেন সে ব্যাপারে আলোকপাত করেছে। জোনাহকে [ইউনুস নবী] সাগরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। যিশু পাপপূর্ণ বিশ্বের আশু ধ্বংস হওয়ার বাণী প্রচার করেছেন।

একেশ্বরবাদী তিন ধর্মের- হিন্দু, বৌদ্ধ, দাও বা কনফুসিয়াসের মতো অন্যান্য প্রধান ধর্মের চেয়ে আওতা অনেক বেশি- এ জন্যই গোঁড়ামি দৃশ্যত সর্বোচ্চ ও দ্বন্দ্বমুখর সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এর আংশিক কারণ সম্ভবত এই যে, একেশ্বরবাদী ধর্মগুলো 'নাজিল' করা। অর্থাৎ বিশ্বাস করা হয়, এই ধর্মগুলো শাশ্বতভাবে অস্তিত্বশীল এবং তাদের নবীদের কাছে নাজিল হওয়ার নির্ভুল মুহূর্তটি আগে থেকেই বিদ্যমান থাকে। মতবাদবিষয়ক নমনীয়তার অবকাশ অনেক কম।

এক দশক আগে 'ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য'-বিষয়ক একটি গ্রন্থের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে গবেষণার জন্য ভারতে গিয়ে শোনা আলোচনার কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। বেশ কয়েকজন হিন্দু পণ্ডিত আমাকে বলেছেন, 'আপনার অবস্থান সূচনাতেই ত্রুটিপূর্ণ। প্রকৃত বিভাজন রেখাটি কোনোভাবেই ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে নয়, বরং বহুঈশ্বরবাদ হিসেবে হিন্দু ধর্ম এবং পাশ্চাত্যের সব একেশ্বরবাদী ধর্মের (ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম) মধ্যে।' হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাস এবং এক আল্লাহ এবং তাঁর নাজিল করার প্রকৃতির প্রতি তাদের নিষ্ঠার কারণে সেগুলো সহজাতভাবেই হয় অনেক বেশি সঙ্কীর্ণমনা ও অসহিষ্ণু।

আমরা সবাই ইতিহাসে অন্য কিছু লাভের জন্য যুদ্ধ, রাজনীতি বা সংগ্রামে রাষ্ট্র বা ক্ষমতাসীন গ্র“পগুলোর ধর্মকে ব্যবহার ও অপপ্রয়োগের সাথে খুবই পরিচিত। অবশ্য ধর্মের পুরো বিষয়টিকেই স্রেফ

ক্ষমতা ও সজ্ঘাতের মধ্যে ফেলে দিলে তা নিশ্চিতভাবেই খুবই সরলীকরণ হয়ে পড়বে, যদিও সেকুলার প্রয়োজনে ধর্মকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে অব্যাহতই রয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এ কারণে গোঁড়ামি সুরক্ষায় বিপুল সময় ব্যয় করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, গোঁড়ামির মানে হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতাকে প্রভাবিত করার ধারণাকে সংজ্ঞায়িত ও নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার।

তবে কেবল ধর্মকে দোষী করা ঠিক নয়। কারণ ইতিহাস, দর্শন এবং এমনকি বিজ্ঞানসহ মানবীয় উদ্যোগের সব ক্ষেত্রেই 'গোঁড়ামি' রাজত্ব করছে। যেখানেই সংশয়বাদ, অনুসন্ধান ও বিতর্কের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে অযৌক্তিক ধারণার প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস এবং যেখানে শক্তি দিয়ে সেই অন্ধবিশ্বাসকে সুরক্ষিত করা হয়েছে, আপনি সেখানেই গোঁড়ামি দেখবেন। মার্কসবাদী, নাস্তিক সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট গোঁড়ামি ইতিহাস, শিল্পকলা, বিজ্ঞানসহ বুদ্ধিবৃত্তিক বিপুল ক্ষেত্রে স্ট্যালিন কিভাবে প্রবলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন; বিভিন্ন ক্ষেত্রের ধর্মভ্রষ্টরা কিভাবে প্রায়ই কেজিবির অন্ধপ্রকোষ্ঠে মাথার পেছনে বুলেটের আঘাত হানার ভাগ্য বরণ করতেন, তা মনে করুন। কমিউনিস্ট পার্টির শাসন সম্প্রসারণ ও সুরক্ষার জন্য সেখানে গোঁড়ামি ও আদর্শবাদ কাজ করত। রাজনৈতিক দলগুলোও, বিশেষ করে আদর্শগত পার্টিগুলোর উত্থান-পতনও ঘটে তাদের সুনির্দিষ্ট আদর্শ আকৃষ্ট করার ওপর, পার্টিগুলো তার সদস্যদের ওপর মতাদর্শগত মতৈক্য চাপিয়ে দিতে চায়। মতৈক্যের অনুপস্থিতিতে পার্টি ভেঙে যায়। ধর্মীয় সংগঠনগুলোর 'উচ্চতর শক্তির' কাছে উচ্চকণ্ঠে আবেদন জানানোর বিষয়টি বাদ দিলে মতাদর্শগত বিশুদ্ধতা রক্ষায় রাজনৈতিক দলগুলোর সংগ্রাম আর রাষ্ট্রের ধর্মীয় মতবাদের আশ্রয় নেয়ার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে সামান্যই।

বিশ্বাস ও ক্ষমতার সংযোগ স্থানে ধর্মভ্রষ্টতার অবস্থান। ধর্মগুলো যখন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়ে পড়ে, তখন তারা মতবাদটির 'মালিকানা' ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সমস্যায় পড়ে। যে কারো যেকোনো কিছু বিশ্বাস করতে পারার কিংবা নিজের জন্য করার মতো ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস তৈরির স্বাধীনতা থাকলে বিশ্বাসের কোনো মূল্যই থাকে না। বস্তুত কিতাবাদিতে নিজের জন্য স্রষ্টাকে অনুসন্ধান করা ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশনের চূড়ান্ত যৌক্তিক সমাধান, যা খ্রিষ্টান ধর্মকে অসংখ্য ছোট ছোট গ্র"পে বিভক্ত করে ফেলে। কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর সাহায্য ছাড়া সরাসরি পবিত্র গ্রন্থ থেকে ব্যাখ্যা নিজে খোঁজার সালাফি ও ওয়াহাবি মৌলবাদী মতাদর্শও বিপ্লবী।

অর্থাৎ ক্ষমতাই চূড়ান্ত ফাঁদ, দুর্নীতির চূড়ান্ত স্রষ্টা : ধর্ম যতই রাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে, ততই তা বুদ্ধিবৃত্তি ও চেতনাগত রাজ্য থেকে সরে গিয়ে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও কর্তৃত্বের মধ্যে সরাসরি সম্পর্কিত হয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ে। তখন রাষ্ট্র আর ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে না। যদি রাষ্ট্রের সরকারি বিশ্বাস ও মতবাদ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে যায়, আর রাষ্ট্র সেটাকে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করতে পারে না।

এটা স্বসেবার বৃত্ত। ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ রাষ্ট্রের স্বার্থ পূরণ করার জন্য এগিয়ে আসে। রাষ্ট্র তখন ওই সব ধর্মবেত্তাকে নিয়োগ করে, যারা তাদের ধর্মতাত্ত্বিক সিলমোহর রাষ্ট্রের স্বার্থসিদ্ধিমূলক ব্যাখ্যা হিসেবে চালিয়ে দেয়। ইতিহাসে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় শক্তির সাথে দীর্ঘ যোগসূত্র থাকা ইসলাম ও খ্রিষ্টান উভয়ই বর্তমান সময়েও এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। বস্তুত, খ্রিষ্টজগতে চার্চ ও রাষ্ট্র খ্রিষ্টান ইতিহাসে ইসলামের চেয়ে অনেক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল, বর্তমানের ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের আত্মপ্রকাশের আগ পর্যন্ত ইসলামে ধর্মনেতাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের ইতিহাস বলতে গেলে ছিলই না। অন্য দিকে ইতিহাসের বেশির ভাগ সময় ইহুদি ধর্ম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হাতিয়ারের অভাবে এই পথ থেকে সরে থাকতে কিছুটা বেশি সক্ষম হয়েছিল, অবশ্য বর্তমানে ইহুদি ধর্মও আধুনিক ইসরাইলি রাষ্ট্রের ক্ষমতা আর রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ায় আর ওই ব্যতিক্রম অবস্থানে নেই।

বিপরীতক্রমে, যখন ধর্ম রাষ্ট্র থেকে আলাদা হয়ে পড়ে, তখন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে : রাষ্ট্র সত্যিকারভাবেই ধর্মীয় গোঁড়ামি সুরক্ষার কাজটি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু তারপরও আমরা এখনো ওই লক্ষ্য অর্জন করতে পারিনি। এমনকি ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসও রাষ্ট্রকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করতে পারে, যদি সুনির্দিষ্ট মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্র সম্পর্কে জনগণের উপলব্ধিতে প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রে কোনো কোনো খ্রিষ্টধর্মীয় আন্দোলন সরাসরি সরকারের গণদৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাব ফেলে; ইসলামে মৌলবাদী আন্দোলনগুলো রাষ্ট্র-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি যেভাবে বেশির ভাগ স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের বৈধতাকে সরাসরি হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে।

ধর্ম ক্ষমতার লড়াইয়ের একটি সংশয়বাদী অংশের চেয়ে বড় কিছু নয়, এ দিয়ে মোটেই তা বোঝানো হচ্ছে না। এটা তেমন হলেও হতে পারে। তবে ধর্মকে রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহার করার মানবীয় সামর্থ্য এই প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তিকে ম্লান করতে পারে না, যে ব্যক্তিগত বিশ্বাস কারো ব্যক্তিগত জীবন, দর্শন ও সঞ্চারণ এবং তার মাধ্যমে সার্বিকভাবে সমাজের আচরণ গঠন করতে পারে। এমনকি সহিষ্ণুতাও ব্যর্থ হতে পারে। হিন্দু ধর্ম দৃশ্যত ক্ষমতা ও গোঁড়ামির আপসমূলক সমস্যা অনেকটাই এড়াতে পেরেছে। বস্তুত গোঁড়ামি ও ধর্মভ্রষ্টতার ধারণা হিন্দু ধর্মের প্রায় পুরো ইতিহাসেই অনুপস্থিত, কারণ সব ধর্মীয় ধারণাই এর হৃদয়ের মধ্যে টেনে নেয়, প্রতিটিই বিশাল, মৌলিক, অবর্ণনীয়, চূড়ান্তভাবে কখনো পুরোপুরি ওয়াকিবহাল না-হওয়া 'আসমানি সত্যের' অংশ হিসেবে সত্য উপাদানের আংশিক অন্তর্দৃষ্টি ও আভাসের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের এই সহিষ্ণু বহুঈশ্বরবাদ বৈশিষ্ট্যের কোনোটিই এ কথা বলে না যে, হিন্দু প্রাধান্যবিশিষ্ট রাষ্ট্র বা হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা অন্য ধর্মের লোকজনের প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন, নৃশংস সহিংসতা চালাতে সমানভাবে সক্ষম নয়। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব কষ্টকরভাবে দেখছে, হিন্দুত্ববাদ (হিন্দু জাতীয়তাবাদ) জঙ্গি নেতাদের অধীনে মুসলিম, শিখ ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রয়োগ ঘটিয়েছে। এই সব কিছুর রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদের সাথে সব কিছুই করার আছে আর ধর্মীয় মতবাদের সাথে সহজাতভাবে করার আছে সামান্যই। এখানে উল্লেখ্য, বহিরাগতদের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মও অতি দ্রুত অসহিষ্ণু ও সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হতে

পারে ঠিক যেমনভাবে পাশ্চাত্য আক্রমণের বিরুদ্ধে ইসলামি মৌলবাদ যখন ‘ইসলামি জাতীয়তাবাদী’ আন্দোলন হিসেবে কাজ করে। এমনকি দর্শনগতভাবে অত্যন্ত শান্তিবাদী হলেও বৌদ্ধ ধর্ম পর্যন্ত গোষ্ঠীগত সঙ্ঘাতে জাতিগতবোধের সম্মিলনে (যেমনটা হিন্দু তামিলদের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার সিংহলিদের মধ্যে দেখা যায়) সহসাই শান্তিবাদের নৈতিক খোলসটা ভেদ করে ফেলে, এমনকি বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পর্যন্ত বৌদ্ধ সিংহলি সম্প্রদায়ের নামে লড়াইয়ে নেমে পড়েন। ধর্মতত্ত্ব তখন অতি সামান্যই কাজে লাগে। আর আমরা কি ভুলে যেতে পারি, ইসলামে আল্লাহর ৯৯টি সম্মানজনক নাম আছে : করুণাময়, সমবেদনাময়, কর্তব্যনিষ্ঠ, প্রতিশোধ গ্রহণকারী, স্বস্তিদাতা, বিজয়ী, ত্রাণকর্তা ইত্যাদি ইত্যাদি সবই একই আল্লাহর ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা অবয়ব? কেউ দাবি করতে পারে না ইসলাম বহুঈশ্বরবাদী, তবে এটা আসমানি সত্তার নানা ধরনের অবয়বকে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করে।

সহিষ্ণুতা, অংশগ্রহণতা ও বর্জনমূলকতা

পৃথিবীকে দু'টি ভিন্ন মনোস্তাত্ত্বিক মানসিকতায় বিভক্ত করা যেতে পারে। যারা বর্জনমূলকতা কামনা করে, যারা তাদের ও অন্যদের মধ্যে সীমানা টেনে দেয়, যারা তাদের নিজস্ব বিশ্বাসকে অনন্য, অন্যদের বিশ্বাসের চেয়ে বেশ আলাদা মনে করার ইচ্ছা করে তারা ওই দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজেদের সত্য পথে আর অন্যদের ভুল পথের মধ্যে দেখে। অন্য দিকে রয়েছে যারা নানা বিশ্বাসের মধ্যে অভিন্নতা খোঁজে, একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়া অন্তর্ভুক্তিমূলকতা ও মিল খোঁজে তারা। এমনকি একই ধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যেও এমনটা ঘটে। এক জ্ঞানী লোক এভাবে বলেছেন : তারা চতুর্ভুজ এঁকে আমাকে বাইরে রাখে, আর আমি বৃত্ত এঁকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করি; কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত মনোস্তাত্ত্বিক উপাদান একই ধর্মের অনুসারীদের কারো কারো মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ও আলাদা হওয়ার দিকে ঝোঁক সৃষ্টি করে, আর অন্যদের আলিঙ্গন করা ও গ্রহণ করার দিকে চালিত করে? ইসলাম প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যে এ দ্বিবিভাজন নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে।

ইব্রাহিমি ধর্মগুলোর মধ্যে মিল নিয়ে বক্তৃতা করার সময় আমি অনেক আপত্তির মুখে পড়েছি। উদাহরণ হিসেবে বলি, আমি উল্লেখ করেছি, স্প্যানিয়ার্ডদের 'ভিন্ন' স্রষ্টা ডিয়স, ফরাসিদের ডিউ, রুশদের বগ কিংবা তুর্কিদের তানরি মুসলমানদের কাছে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো স্রষ্টাকে বোঝায় না। বস্তুত আরব খ্রিষ্টানরা তাদের ইশ্বর বলতে আল্লাহকেই বোঝেন। এটা আসলে এক আল্লাহর ধারণা বোঝাতে ভিন্ন ভাষায় প্রয়োগ করা ভিন্ন শব্দ মাত্র; কিন্তু গুটিকয়েক পাশ্চাত্য খ্রিষ্টান এতে আপত্তি করবেন : 'আল্লাহ আমার ইশ্বর নন। আমার ইশ্বর হলেন তিনি, যিনি মানবজাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে এবং আমার মধ্যস্ততাকারী হিসেবে তাঁর জন্ম দেয়া একমাত্র পুত্র হিসেবে যিশুকে এনেছেন। সেটা ইসলামের আল্লাহ নন।' এক অর্থে এটা পুরোপুরি ঠিক। অনেক ইহুদিও আপত্তি জানিয়ে বলবেন, 'খ্রিষ্টান ইশ্বর আমার স্রষ্টা নন, কারণ তিনি পুত্র জন্ম দিয়েছেন, এই ধারণাটি ইহুদি ধর্মে নেই। অধিকন্তু, ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুযায়ী যিশু কোনোভাবেই খ্রিষ্টানরা যেভাবে অভিহিত করে সেই মসিহ নন।' এটাও সত্য। কোনো কোনো সঙ্কীর্ণমনা মুসলমান আবার খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'আহলে কিতাব' না বলে 'অবিশ্বাসী' হিসেবে বাদ দেবে।

সম্ভবত যারা মনে করে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও সম্প্রদায় হুমকির মুখে, তারাই তীক্ষ্ণ সীমানা নির্ধরণ করে হুমকির মুখে থাকা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার নামে বর্জনমূলক বিশ্বাস রক্ষা করার প্রয়াস চালায়। এ ক্ষেত্রে আমরা আসলেই ব্যক্তিগত ও সামাজিক মনোস্তাত্বিক উপাদান নিয়ে কথা বলছি, ধর্মতাত্বিক উপাদান নিয়ে একেবারেই নয়।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কেমন করে ইসলাম সাধারণভাবে ধর্মীয় বিবর্তন ও ধর্মতাত্বিক চিন্তাধারারই একটি অংশবিশেষ এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মের ধর্মতাত্বিক মেরুকরণের মধ্যবর্তী স্থানে একে শনাক্ত করা যায়। ইসলাম অঞ্চলটিতে ধর্মতাত্বিক বেদনা হিসেবে আসেনি। বরং এটা ইতঃপূর্বের খ্রিষ্টান ধর্মের মতোই ভূ-রাজনৈতিক শক্তিগুলোর স্বার্থসিদ্ধি করেছে। এ কারণে আমাদের কাহিনীর বেশির ভাগজুড়ে থাকবে ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ওই পর্যায়ে ধর্মের যেকোনো ধরনের স্বাধীন ভূমিকায় রাষ্ট্রীয় শক্তি ও লক্ষ্যের আধিপত্য। এই বইয়ে এই বাস্তবতা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেছে : মধ্যপ্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের সম্পর্কের ইতিহাসের বেশির ভাগজুড়ে বাস্তবে রয়েছে সাম্রাজ্য এবং রাষ্ট্রগুলোর ভূ-রাজনীতি; ধর্ম নিজে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নয়, রাষ্ট্রীয় সমর্থনপুষ্ট স্লোগান, ব্যানার, আদর্শগত উত্তেজনা যতই থাকুক না কেন। ইসলামকে ওই সমীকরণ থেকে সরিয়ে নিন, তখনো এটা দেখার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, মধ্যপ্রাচ্য ওই অবস্থাতেও পাশ্চাত্যের সাথে বিবদমান রয়েছে।

অধ্যায় দুই

ক্ষমতা, ধর্মভ্রষ্টতা এবং খ্রিষ্টধর্মের বিবর্তন

ধর্মের বিরাজমান বেশির ভাগ আকার এমন যেটাকে সরকার পক্ষের স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। **: বার্ট্রান্ড রাসেল**

চতুর্থ শতক ছিল খ্রিষ্টধর্মের জন্য ভাগ্যনির্ধারণী :

এই সময়টাতেই রোমান বা বায়জান্টাইন সাম্রাজ্য খ্রিষ্টান হয়; মতাদর্শ এখন সরাসরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। আমরা দেখাব, রাজনীতি কিভাবে ধর্মতত্ত্বকে সরাসরি প্রভাবিত করে। ধর্ম ও ধর্মভ্রষ্টতা হয়ে পড়ে নানা ধরনের নগরী, অঞ্চল, গ্র"প এবং রোমান বা বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংগ্রামে জড়িত উচ্চাভিলাষী প্যাট্রিয়ার্কদের প্রধান হাতিয়ার, ব্যানার ও আকর্ষণীয় প্রতীক। এই ভিত্তিটি মধ্যপ্রাচ্য এবং এমনকি খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে আঞ্চলিক সংঘাত আরো বাড়িয়ে দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। মধ্যপ্রাচ্য চূড়ান্ত পর্যায়ে রোম, কনস্টানটিনোপল ও ইসলামের মধ্যে ত্রিমুখী দ্বন্দ্বের দিকে চূড়ান্তভাবে অগ্রসর হয়। তবে এখন আমরা দেখব, কিভাবে ক্ষমতা ও ধর্মভ্রষ্টতা এমনকি ইসলাম অস্তিত্বশীল হওয়ার আগেও পূর্ব ও পশ্চিম তথা কনস্টানটিনোপল ও রোমের মধ্যে ক্রমাগত বাড়তে থাকা বিদ্বেষসহ ওই এলাকার ভূ-রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে। ইসলাম অল্প সময়ের মধ্যেই পাশ্চাত্যের প্রতি এই ভূ-রাজনৈতিক অবিশ্বাস ও সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সচেতনতাকে গ্রহণ ও লালন করেছে। ভূখণ্ডগত বিষয়েও এটা সত্য হতে পারে।

যিশুর জীবন, মিশন ও মৃত্যুর অব্যবহিত পরই ধর্মভ্রষ্টতার বিষয়টি সামনে আসে। ওইসব নাটকীয় ঘটনাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে তা নিয়ে যিশুর অনুসারীদের মধ্যে সৃষ্ট বিভাজন পরবর্তীকালের ধর্মভ্রষ্টতার ভিত্তি তৈরি করে। সময়ের পরিক্রমায় রাষ্ট্র এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে অনিবার্যভাবে ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মভ্রষ্টতার সংজ্ঞা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে আসার ফলে রাষ্ট্রের নিজস্ব নীতিতেও এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। যে মূলনীতিটি প্রচার করা হচ্ছে, সেটির মতোই কে কোন ধর্মতাত্ত্বিক নীতিমালা প্রচার করছে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়।

শুরু থেকেই রাজনীতি জড়িত ছিল, যিশুকে হত্যা করা দিয়ে এর সূচনা। জেরুসালেমে ইহুদি ধর্মীয় নেতৃত্বের বেশির ভাগ যিশুকে ভণ্ড নবী, আন্দোলনটিতে ধর্মভ্রষ্ট বিবেচনা করে যিশুর মৃত্যু দাবি করে। রাষ্ট্র (রোমান সাম্রাজ্যের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ) শেষ পর্যন্ত ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতাদের দাবি মেনে তাঁর মৃত্যুদণ্ড মঞ্জুর করে। রোমের পক্ষ থেকে এটা ছিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, ধর্মতাত্ত্বিক নয়। কেউ ঝটপট যুক্তি দেখাতে পারেন, ইহুদি সেনহিদ্রিন নেতাদের জন্যও যিশুর নির্মূল ছিল রাজনৈতিক কাজ, কারণ তিনি সম্প্রদায়টির কর্তৃত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছিলেন।

তখনই ধর্মভ্রষ্টতার আশঙ্কাও উপস্থিত ছিল। ইহুদি এবং নতুন ধর্মের মধ্যে কোন সম্পর্ক, যদি থাকে, হবে? স্বাভাবিক এবং চূড়ান্তভাবেই যিশুর প্রথম দিককার সব অনুসারীই ছিলেন ইহুদি এবং তারা নিজেদের মনে করতেন ইহুদি খ্রিষ্টান। খ্রিষ্টান ধর্ম যদি সত্যিই ইহুদি ধর্মের একটি উপদল হয়ে থাকে, তবে কি খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণকারী নতুন পৌত্তলিকদের খ্রিষ্টান ধর্মে প্রবেশের আগে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করতে হবে? বর্তমানে বেশির ভাগ খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদের মতে, যিশু নন, পলই আসলে ইহুদি ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নতুন ধর্ম হিসেবে খ্রিষ্টান ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেন। পলের পর খ্রিষ্টান হওয়ার জন্য কাউকে আর ইহুদি হওয়ার দরকার পড়ত না। এই পলই ইহুদি বিধানের কারো জীবনে ব্যক্তিগতভাবে বাস্তবায়নের বদলে নতুন ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করে বিশ্বাসকেই মোক্ষ (মুক্তি) লাভের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। পলের অধীনে চার্চের নতুন গতিপথ ইহুদি ধর্মের ইতিহাসে সবচেয়ে বিধ্বংসী সংশয়টির সৃষ্টি করে। নতুন খ্রিষ্টান বিশ্বাসে দাবি করা হয়, এটা সর্বজনীন ধর্ম, সবার জন্য উন্মুক্ত, এতে গোষ্ঠীগত বা ধর্মীয় উৎসের কোনো ভূমিকা নেই। মনোনীত জনগোষ্ঠী বলে কিছু আর রইল না, খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে সবাই 'মনোনীত' হতে পারে। মোক্ষ লাভের পথ 'বিধান' নয় বরং 'বিশ্বাস'।

আদি খ্রিষ্ট সমাজ তাঁর জীবন, মিশন ও শিক্ষার বিষয়টি বোধগম্য করতে চাওয়ার প্রেক্ষাপটে শুরু থেকেই যিশু প্রশ্নে নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব ঘটে। খ্রিষ্টধর্মের প্রাথমিক সময়ের এসব বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের বিষয় : যিশুখ্রিষ্টের সত্যিকারের প্রকৃতি কী? এসব বিতর্ক অনিবার্যভাবে ইসলামকে প্রভাবিত করে।

যিশু কি মানুষ ছিলেন, না স্রষ্টা, কিংবা উভয়টাই? তিনি কি সত্যিই জৈবিকভাবে গর্ভে এসেছিলেন এবং কুমারীর জন্ম ছিলেন? না কি তিনি জন্মের আগে থেকেই সবসময় অস্তিত্বশীল ছিলেন? তিনি যদি সব সময় অস্তিত্বশীল থাকেন, তবে কি তিনি স্রষ্টার সমান সময় ধরে অস্তিত্বশীল? যিশু কি স্রষ্টার সমকক্ষ বা তিনি কি স্রষ্টা? স্রষ্টা কি প্রথমে এসে তার পর যিশুকে সৃষ্টি করেছিলেন? সেটা যদি হয়,

তবে কি যিশুকে স্রষ্টার পর 'দ্বিতীয়' স্থান অধিকারীতে পরিগণিত করে না? স্রষ্টা কি এক, নাকি যিশু ও স্রষ্টাকে নিয়ে দ্বৈত চরিত্র? নাকি পবিত্র আত্মা নিয়ে ত্রিত্ব ব্যক্তিত্ব? খ্রিষ্ট যদি মানুষ ও স্রষ্টা উভয়টিই হন, যা আরো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান : মানুষের উপাদান না স্রষ্টার? স্রষ্টা কি সত্যিই পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন এবং মানুষ হিসেবে বেঁচেছিলেন এবং নিহত হয়েছিলেন, ক্রুসে মারা গিয়েছিলেন? মৃত্যুর পর এবং আবার জীবিত হওয়ার পর যিশুর কী হয়েছিল? তিনি কি এখনো স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল নাকি তিনি স্রষ্টার সাথে মিশে গেছেন? কিংবা তিনি কি সব সময় আলাদাভাবে অস্তিত্বশীল?

এসব এবং আরো প্রশ্ন চার্চ ও পরবর্তীকালে রোমান সাম্রাজ্যে ঘুরে ফিরে আসে, বিদ্রোহ উসকে দেয়, নতুন নতুন উপদল সৃষ্টি করে, বেসামরিক ও সামরিক সঙ্ঘাত সৃষ্টি করে, জাগতিক শক্তিকে বিভক্ত করে। মতৈক্য ছাড়াই এগুলো বহাল থাকে, এখনো খ্রিষ্টান ধর্মকে উত্ত্যক্ত করছে এটি।

প্রথম তিন শতকে নিশ্চিতভাবেই খ্রিষ্ট ধর্মের কোনো সরকারি মর্যাদা ছিল না। তখনো এটা ছিল স্রেফ একটা আন্দোলন, রোমান রাষ্ট্রে প্রত্যাখ্যাত ও নিয়মিত নির্যাতনের শিকার হতো খ্রিষ্টানরা; অনেক সময় রোমের রাষ্ট্রীয় ধর্মের (একটি শিথিল ও নমনীয় বিষয়, এতে রাজকীয় শক্তির কয়েকটি প্রতীককে অভিবাদন জানানো এবং কারো নিজস্ব ব্যক্তিগত ধর্মানুশীলনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা পর্যন্ত ছিল) প্রতি মৌলিক মৌখিকভাবেও আনুগত্য প্রকাশ করতে খ্রিষ্টানরা অস্বীকার করত। তবে এই ন্যূনতমপর্যায়ে থাকা রাষ্ট্রীয় ধর্ম এবং এর পাশাপাশি কারো নিজস্ব ব্যক্তিগত ধর্ম স্বীকার না করাটা রাষ্ট্রকে অস্বীকারমূলক কাজ তথা বিদ্রোহ মনে করা হতো।

ইতোমধ্যে, যিশু-সম্পর্কিত প্রতিযোগী দৃষ্টিভঙ্গিগুলো দীর্ঘ সময় ধরে সহাবস্থান করার পর অবশেষে চার্চ যিশুর বিপুলসংখ্যক বিকল্প সংস্করণ ধীরে ধীরে নিয়মানুগ পদ্ধতিতে বাতিল করে সেগুলোকে পুরোপুরি ধ্বংস করে একক 'অর্থোডক্স' দৃষ্টিভঙ্গি-সংবলিত ঐক্যের পথে এগুতে চায়। কনস্টানটিনোপলে রোমান রাজকীয় শক্তির খ্রিষ্টান ধর্মকে সর্বোচ্চ আনুষ্ঠানিকতায় গ্রহণ নতুন পেশিশক্তিতে খ্রিষ্টান ধর্মমতকে সর্বসম্মতকরণের কাজটি ত্বরান্বিত করে কেবল।

রাষ্ট্রের কাছে ধর্মতত্ত্বটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় কেবল ধর্মতত্ত্ববিদদের হাতে ছেড়ে দেয়ার বিষয় ছিল না। ধর্মতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত পরিষদে পূত-পবিত্রভাবে বসে অস্পষ্ট ধর্মতাত্ত্বিক কার্যবিবরণীতে সীমিত থাকতে পারেনি বরং প্রতিযোগী কর্তৃপক্ষগুলোর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের (বিশ্বাসী, নানা ধরনের ধর্মতত্ত্ববিদ, রাজনীতিবিদ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সম্রাট) সবাই তাদের নিজ নিজ স্বার্থের আলোকে খ্রিষ্ট ধর্মের সত্যিকারের বার্তা নির্ধারণের চেষ্টা করতে থাকেন। তাদের সর্ব-গুরুত্বপূর্ণ একটিই লক্ষ্য ছিল : মতবাদটির ওপর চার্চ ও রাষ্ট্রের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করা। ব্যাখ্যার একচ্ছত্র অধিকারকে চ্যালেঞ্জ

করা মানে ছিল চার্চ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকেই চ্যালেঞ্জ করা। নতুন ধর্মের যোগে প্রাচীন দুনিয়ায় বিশেষ করে লেভ্যান্ট, আনাতোলিয়া, গ্রিস ও মিসরের ইহুদি ও জেন্টাইল সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে যিশুর প্রকৃতি নিয়ে প্রকাশ্যে বিতর্ক হতে থাকে। কনস্টানটিনোপলের ক্ষৌরকারের দোকান, পানশালায় যিশুর প্রকৃতি নিয়ে তুমুল বিতর্ক হতো বলে জানা যায়। হেলেনীয় আদর্শপুষ্ট ইহুদিরা (ইহুদি সম্প্রদায়ে তারা ছিল বিপুল অংশে) ছিল এসব বিতর্কের কেন্দ্রে। খ্রিষ্টের প্রকৃতিবিষয়ক বিতর্ক কখনোই শেষ হয়নি, পরবর্তীকালের ধর্মভ্রষ্টতায় সেগুলো বারবার আসতে থাকে, এমনকি ইসলামের আত্মপ্রকাশের সময়ও।

রোমান বা বায়জান্টাইন রাষ্ট্রের খ্রিষ্টান ধর্মকে সরকারিভাবে গ্রহণ করায় গোঁড়ামির মাত্রা প্রতিষ্ঠা এবং 'সঠিক অভিমত' নির্ধারণ করার লক্ষ্যে সাম্রাজ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন ঘরানা ও ব্যাখ্যার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে রাষ্ট্র। ভিন্নমতের অনুসারীদের একমতে আনা, বাতিল করে দেয়া কিংবা দমন করতে পদক্ষেপ নেয় হয়। সন্দেহাতীত বিষয়, বিশেষ ভিন্নমতালম্বী কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব অনিবার্যভাবেই রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের হিসাব-নিকাশে প্রভাবিত হয়েছিল। রাষ্ট্র কিভাবে যিশুর সময় থেকে জনসাধারণের মধ্যে বিরাজমান নানা মাত্রিক ধর্মীয় ধারণাগুলোকে শনাক্ত, সঙ্ঘবদ্ধ, যৌক্তিক, সঙ্কলনভুক্ত, সাজানো, অন্তর্ভুক্ত, সমন্বয় এবং চূড়ান্তভাবে আরোপ করার কাজ করবে? প্রথম পদক্ষেপ ছিল বিশ্বাসের আনুষ্ঠানিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও সঙ্কলনভুক্ত করার জন্য বেশ কয়েকটি সর্বজনীন কাউন্সিল আহ্বান করা। সম্রাট প্রথম কনস্টানটাইন যখন 'নিসিন ক্রিডে'র খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের মৌলিক নীতিমালা নির্ধারণ করার লক্ষ্যে ৩২৫ সালে 'কাউন্সিল অব নিকাই' আহ্বান করলেন, তখন কাউন্সিল মনে করেছিল, তারা খ্রিষ্টান ধর্মের ব্যাপারে সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য এমন সিদ্ধান্তসূচক ঘোষণা তৈরি করেছে।

কিন্তু আসলে তা ছিল না : আরো অনেক কাউন্সিল হতে হলো, আরো পরিবর্তন আনতে হলো। সরকারি চার্চের প্রথম কাজগুলোর অন্যতম ছিল কিতাব প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। যিশু, তাঁর শিষ্যরা এবং প্রথম যুগের খ্রিষ্টান আন্দোলনবিষয়ক অসংখ্য রচনার মধ্যে কোনটি খ্রিষ্টান মতবাদের মূলসূত্র হিসেবে পবিত্র গণ্য হবে? আর বিপুলসংখ্যক গ্রন্থের মধ্য থেকে কোন বইয়ের কোন সংস্করণটি গ্রহণ করা হবে? কোনো একটি গ্রহণ এবং অন্যটি বাতিল করার পরিণাম হতো হাতে হাতে। এতে করে সুস্পষ্ট বিজয়ী ও পরাজিত সৃষ্টি হতো, কোনো কোনো গ্রন্থ বিবেচিত হতো 'অন্তরস্থ' গ্রন্থ এবং সেগুলোকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা হয়েছিল; অন্যগুলো প্রামাণ্যহীন বা 'বহিরাগত' গ্রন্থ হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণের বৈশিষ্ট্যে ছিল বিপুল মাত্রায় পরস্পর বিরোধিতা : অনেক গ্রন্থ এত বিলম্বে লেখা হয়েছিল যে, সেগুলোকে যিশুর জীবন সম্পর্কে প্রামাণ্য বিবেচিত হওয়ার কথা নয়। কিংবা রোমে জনপ্রিয় গ্রন্থগুলোর প্রতি তাদের সমর্থন ও প্রচার করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া গ্রন্থগুলো কনস্টানটিনোপলের গ্রিকভাষী বিশ্বে তেমন জনপ্রিয় বা সুপরিচিত ছিল না। কোনো কোনো গ্রন্থ বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয় ছিল, অন্যদের কাছে নয়; কোনো কোনোটির ভাষ্য অনির্ভরযোগ্য বিবেচিত হতো, যদিও অন্যরা সেগুলোকে চার্চের শিক্ষার সাথে এত বেশি অমিলপূর্ণ ছিল যে সেগুলোকে সরাসরি ধর্মভ্রষ্ট হিসেবে

অভিহিত করত। অনেক গ্রন্থ প্রাথমিক আন্দোলনের প্রামাণ্যকরণে ঐতিহাসিক মূল্য ধারণ করলেও সেগুলো কিতাব হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল না।

তাহলে শেষ পর্যন্ত 'কিতাব'টির কী অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়? স্বীকৃত কর্তৃপক্ষ গ্রন্থগুলোর কাঠামোটাকে বস্তুনিষ্ঠ হিসেবে গ্রহণ করে একে সঙ্কলনভুক্ত এবং পরে 'পবিত্র' হিসেবে বিবেচনা করে। পরিশেষে পবিত্রতার মান নির্ধারিত হয় প্রবলভাবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর নিজস্ব অভিমতের ভিত্তিতে। এতে করে বিপুলসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ খ্রিষ্টান গ্রন্থ এসব কারণের কোনো-না-কোনোটিতে পড়ে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাতিল হয়ে যায়। টমাসের গসপেল, ডেড সি স্ক্রল, যিশুর সহযোগীদের অ্যাপোক্রিফ্যাল অ্যাক্ট ইত্যাদির মতো গ্রন্থগুলো প্রামাণ্য হিসেবে স্বীকৃতি না পেলেও খ্রিষ্ট ধর্মতত্ত্ব বোঝার জন্য এসব নথি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (পরবর্তীকালে হজরত মোহাম্মদের [সা:] জীবদ্দশায় ব্যক্ত তাঁর কথা ও কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হাজার হাজার হাদিসের নির্ভুলতা বাছাই করার সময়ই ইসলাম প্রায় একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। বর্তমানেও সেগুলো নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে, যাচাই-বাছাইয়ের মধ্যে রয়েছে।)

বিষয়টা শেষ পর্যন্ত কেবল গ্রন্থগুলোর হেরে যাওয়ার মধ্যেই শেষ হওয়া ছিল না। একই কথা প্রযোজ্য ধারণা ও বিশ্বাসগুলোর নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের বেলায়; পুরো সম্প্রদায়ই বহিষ্কৃত হয়ে যায় রাষ্ট্রের সাথে সক্রিয় চার্চ কর্তৃপক্ষের রায় প্রদান করার ফলে। পুরনো ও সযত্নে লালিত ধারণাগুলো হয় অত্যন্ত গোঁড়া ও রক্ষণশীল। আর বিভিন্ন সময় যে সর্বজনীন কাউন্সিল আহ্বান জানানো হয়েছিল, সেগুলো কারা ডেকেছিল? কে শুনেছিল? কিভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছিল? যেসব চার্চ নেতা ও সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়নি, তাদের হয় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করতে হয়েছিল নয়তো তাদের ধর্মভ্রষ্ট ঘোষণা করা হয়েছিল।

ধর্মের বিশুদ্ধকরণ, বিস্তার ও চাপিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা আগের চেয়ে আরো বেশি অনধিকারপ্রবেশমূলক হয়ে পড়ে। যদিও খ্রিষ্টধর্মে বেশির ভাগ ধর্মান্তঃকরণ খ্রিষ্টীকরণের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে হয়ে থাকলেও রাষ্ট্র প্রায়ই সেটাকে জোরদার করতে প্রাক- খ্রিষ্টান যুগের 'প্যাগান' ধর্মশালা, মন্দির ও প্রতিষ্ঠান ছিনিয়ে নিত, তাদের শাস্ত্রাচার ও উপাসনা নিষিদ্ধ করত। পরবর্তী সময়ে অনেক ধর্মান্তর মোটেই শান্তিপূর্ণ ছিল না। শার্লেমেনের ৭৩২ সালে শুরু ১৩ বছরব্যাপী চরম সহিংস যুদ্ধের মাধ্যমে স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে বিজয় ও ধর্মান্তরের বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এখানে 'ধর্মান্তর' ছিল মূলত শার্লেমেনের ফ্রাঙ্কিশ করোলিনজিয়ান সাম্রাজ্য সম্প্রসারণকে আদর্শগতভাবে যৌক্তিক করা। যেসব স্যাক্সন তাদের সনাতন দেবতার উপাসনা অব্যাহত রাখত, তাদের জন্য মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত ছিল। কার্যক্রমটি এত সহিংস ছিল যে কোনো কোনো ফ্রাঙ্কিশ বিশপ তরবারির সাহায্যে এ ধরনের রক্তাক্ত ধর্মান্তরের পরিণাম দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

রাষ্ট্রের সব ধরনের দমনমূলক ও নির্যাতনমূলক শক্তির সমর্থন পেয়ে খ্রিষ্টকরণ প্রক্রিয়াটি বেশ সুবিধাজনক হয়েছিল; রাষ্ট্রীয় মতবাদের প্রতি অনুগত মনে হওয়ায় এ ধরনের ধর্মান্তকরণ সহজ ও কৌশলপূর্ণ হয়েছিল। পৌত্তলিকতাকে হেয়প্রতিপন্ন ও নির্মূল করতে চার্চ নানা ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে। তারা প্রায়ই পৌত্তলিক দেবতাদের দানব হিসেবে চিত্রিত করত, তাদেরকে শয়তান বা ডাকিনি উপাসক হিসেবে ঘোষণার ঝুঁকি থাকত। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে চার্চ স্থানীয় পৌত্তলিক ব্যবস্থার সাথে আপস করত, স্থানীয় পৌত্তলিক দেবতাদের কিছু কিছুকে গ্রহণ করত, তাৎক্ষণিকভাবে 'সন্ন্যাসী' হিসেবে সম্মানিত করত, যাতে তারা (গুরুত্ব অনেকাংশে হারিয়ে ফেললেও) নতুন খ্রিষ্টীয় পরিবেশে স্বস্তিদায়ক উপস্থিতি বজায় রাখতে পারত। পবিত্র পৌত্তলিক স্থানগুলো প্রায়ই স্থানীয় 'সন্ন্যাসী'দের জন্য নতুন করে সাজানো হতো। এসব কৌশল ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হতো ইউরোপের বর্বর উপজাতিগুলো এবং আধুনিক সময়ে ল্যাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার স্থানীয় জনগণের মধ্যে রোমান চার্চের ধর্মান্তরের সময়। ইসলামও পূর্ব ও পশ্চিমে, উত্তর ও দক্ষিণে সম্প্রসারিত হওয়ার সময় প্রায় একই সমস্যায় পড়েছিল, আগেকার বিশ্বাস, মতবাদ ও সন্ন্যাসীদের সামনে পড়ে, যাদের অনেকে অন্তত অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও ইসলামের নতুন ধর্মান্তরিত হিসেবে ইসলামি পোশাকে অবস্থান করতে থাকে।

ভার্জিন মেরিকে ভক্তি করার রীতিটি চার্চের মণ্ডপে ক্রমাগত বেশিসংখ্যক ব্যক্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা হওয়ায় এটা ধর্মীয় বলয় সম্প্রসারণের আরেকটি মাত্রার প্রতিনিধিত্ব করছে। মেরির প্রতি আনুষ্ঠানিক ভক্তি ও ভালোবাসা স্বীকৃতি আসে যিশুর ৪০০ বছর পরে প্রবল বিরোধিতার পর। ষষ্ঠ শতকে ইস্টার্ন চার্চে মেরির প্রতি ব্যাপক জনস্বীকৃতির আগে সেটা ঘটেনি, ওয়েস্টার্ন চার্চে তা ঘটে আরো পরে। (ধর্মবিষয়ক স্কলার কারেন আর্মস্টং এমন কথাও বলেছেন, ক্যাথলিক মণ্ডপে ভার্জিন মেরিকে গ্রহণ করাটা ছিল ইহুদিবাদী কঠোর পিতৃতান্ত্রিক একেশ্বরবাদ এবং আরো পরে প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টান ধর্মের আওতায় নারী দেবীদের প্রাধান্যপূর্ণ উপস্থিতি বিলোপের অসচেতন ক্ষতিপূরণ।) মারলিন স্টোন তার 'দি বুক হোয়েন গড ওয়াজ এ ওম্যান'-এ নারী দেবীর উপাসনাকারী মাতৃতান্ত্রিক সমাজকে প্রলোভন ও পাপের উৎসের সাথে নারীকে সম্পৃক্ত করার প্রবণতাসম্পন্ন পিতৃতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরের বিষয়টি প্রতিফলিত করেছেন। ইব্রাহিমি তিনটি ধর্মই এই ধারণাটি গ্রহণ করেছে।

ধর্মতত্ত্ব ও মতাদর্শবিষয়ক এসব প্রাথমিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বেশির ভাগের জন্য দায়িত্ব বর্তায় রোমের চেয়ে বেশি কনস্টানটিনোপলের ওপর। রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম হলেও খ্রিষ্টান ধর্মকে বৈধ করার সময় ইটারনাল সিটি (শাশ্বত নগরী) বর্বরদের নিয়মিত আক্রমণ ও দখলদারিত্বের কারণে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে। এ দিকে নতুন নগরী কনস্টানটিনোপলকে বিকল্প হিসেবে বেছে নেয়া হয় বলে তার প্রভাব ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অন্য দিকে খ্রিষ্ট শক্তি রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানীতে ক্রমবর্ধমান আধিপত্য ভোগ করছিল। এখানে রোমান সম্রাট তখন প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিলেন। খ্রিষ্টান ধর্মকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেছিল ইস্টার্ন রোমান সাম্রাজ্য। বিশাল ইস্টার্ন সাম্রাজ্য বা বায়জান্টিয়াম আরো হাজার বছর রাজকীয়পূর্ণ আড়ম্বরে বহাল থেকেছে, এমনকি রোম

রাজকীয় শক্তি হিসেবে ভূ-রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। অর্থোডক্সি নির্ধারণ, প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোর সঙ্কলন শনাক্তকরণ এবং কোনোগুলো ধর্মভ্রষ্টতামূলক- সেই কাজের বেশির ভাগই করেছে এই কনস্টানটিনোপল। ইস্টার্ন রোমান (বায়জান্টাইন) সাম্রাজ্যই মধ্যপ্রাচ্য, ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা, বলকান এবং স্লাভিক বিশ্ব পর্যন্ত বেশির ভাগ স্থানে খ্রিষ্টান ধর্মের বিকাশ ঘটিয়েছিল। সাম্রাজ্য তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উত্তর আফ্রিকা, মিসর, লেভ্যান্ট, সিরিয়া এবং বর্তমানের ইরাক, এশিয়া মাইনরের (আনাতোলিয়া) বেশির ভাগ এলাকা জয় করেছিল। ইসলামের আত্মপ্রকাশের আগ পর্যন্ত পারস্যের জরথ্রীয় ধর্মই ছিল এই অঞ্চলে খ্রিষ্টধর্মের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।

ধর্মভ্রষ্টতার ছড়াছড়ি

ভূমধ্যসাগরীয় পূর্বাঞ্চলে সময়ের পরিক্রমায় প্রবল মনোমুগ্ধকর যেসব ধারণার আবির্ভাব ঘটেছিল, সেগুলোর প্রায় সবই পরে ধর্মভ্রষ্ট হিসেবে অভিহিত হয়। এসব ধর্মভ্রষ্টতা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। সেগুলো বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যে সক্রিয় ক্ষমতার রাজনীতিতে গতিশীলতা সম্পর্কে অনেক তথ্য দেয়। সেগুলো ওই সময়ের ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং মানসিকতা সম্পর্কে অনেক কিছু প্রকাশ করে, এমনকি ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক অনেক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যও মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিল। ধর্মভ্রষ্টতার গতিবিজ্ঞান আমাদের বারবার দেখিয়ে দেয়, কিভাবে কারণ নয়, বরং প্রবল জাগতিক স্বার্থ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তিতে তা সঙ্ঘাত, বিভক্তি ও দ্বন্দ্বের বাহন হয়েছিল। কারো উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য ধর্মীয় ও ঐশ্বরিক পোশাকের চেয়ে ভালো পথ আর কী হতে পারে?

প্রাচীনতম ও সবচেয়ে স্থায়ী একটি ধর্মভ্রষ্টতা হচ্ছে মারসিয়নিবাদ। খ্রিষ্টান বিশেষজ্ঞ জি আর এস মিডের মতে, মারসিয়ন (১১০-১৬০ সিই সাল) ছিলেন সিনোপের (বর্তমান তুরস্কের কৃষ্ণসাগর উপকূলবর্তী এলাকা) এক ধনী জাহাজ ব্যবসায়ী। বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি সিনোপের বিশপ হয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি চার্চে বিপুল অর্থ দান করেছিলেন। ১৪০ সালের দিকে (সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টান ধর্ম আইনসম্মত হওয়ার প্রায় ১৬০ বছর আগে) তিনি তার ভিশন প্রচার করার জন্য পরিচিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে রোম গিয়েছিলেন। এমনকি তখনো চার্চ মারসিয়নের বাণীর প্রতি বৈরী ছিল, ১৪৪ সালে তাকে বহিষ্কার করে, তার দান করা সব তহবিল ফেরত দেয়।

চার্চের দৃষ্টিতে মারসিয়নের ভুল ছিল তিনি সেন্ট পলের চেয়েও অনেক বেশি পলবাদী হয়ে পড়েছিলেন। পল নিশ্চিতভাবেই জানিয়েছিলেন, ইহুদি ধর্মের চেয়ে বেশ ভিন্ন পুরোপুরি নতুন ধর্ম প্রচার করেছিলেন যিশু। দ্বিতীয় শতকে চার্চের বিশপ হিসেবে ঘোষিত এবং এশিয়া মাইনরের স্বীকৃত মারসিয়ন ঘোষণা করেন, খ্রিষ্টান মতবাদে পুরো ওল্ড টেস্টামেন্ট অপ্রাসঙ্গিক। তিনি ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত হিব্রু" ঈশ্বরদের বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা তৈরি করার পাশাপাশি যিশুর প্রচারিত ঈশ্বরের গুণগুলো তুলে ধরেন। মারসিয়ন উপসংহার টানেন, হিব্রু" স্রষ্টার ঈর্ষা, প্রতিশোধ, সহিংসতা ও জিঘাংসার বৈশিষ্ট্যগুলো যিশুর প্রচারিত ভালোবাসা ও ক্ষমাশীল ঈশ্বরের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে হিব্রু" স্রষ্টা আসল স্রষ্টা

নন, তিনি মোটেই খ্রিষ্টানদের স্রষ্টা নন, বরং কম গুরুত্বপূর্ণ স্রষ্টা, যার ক্ষমতা নাজিল হয়েছিল যিশুর ঈশ্বরের মাধ্যমে। মারসিয়ন এমনকি বেশির ভাগ যিশু-শিষ্যদের অবিশ্বস্ত সাক্ষী হিসেবে নাকচ করে দিয়ে ঘোষণা করেন, একমাত্র পলই খ্রিষ্টের বাণীর মর্মার্থ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি উপসংহার টানেন এই বলে যে, ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান করার চেষ্টা অপ্রয়োজনীয়।

তাকে ধর্মভ্রষ্ট হিসেবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও মারসিয়নের সম্প্রদায় ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনি বিপুলসংখ্যায় বিশাল বিশাল চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন যেগুলো কয়েক শ' বছর ধরে ইতালি, মিসর, ফিলিস্তিন, আরব, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর ও পারস্যে রোমের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। মারসিয়নীয় চার্চ ছিল সরকারি চার্চের পর প্রথম দিকে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সবচেয়ে প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন।

মারসিয়নের বাণীর উপাদানগুলো এখনো তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের জন্য গঠিত গ্রুপ, সংস্থার মধ্যে ভালোভাবে বিরাজমান। মারসিয়নের চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব প্রাপ্তির কারণ নিহিত রয়েছে তার তোলা মৌলিক ধর্মতাত্ত্বিক উভয় সঙ্কটের মধ্যে : ওল্ড টেস্টামেন্টের সঙ্কীর্ণ সেমিটিক গোত্রবাদ ও সহিংসতা এবং সেই সাথে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, স্বেচ্ছাচারী এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ঈশ্বরকে কিভাবে নিউ টেস্টামেন্টের ভালোবাসায় সিক্ত যিশুর বাণীর সাথে সমন্বয় ঘটানো যায়? ফলে প্রশ্ন থেকে যায় : ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে অবিচ্ছিন্নতা নাকি তীব্র বিচ্ছেদ রয়েছে? যদি অবিচ্ছিন্নতাই থাকে, তবে ইহুদি ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রিষ্টান ধর্ম নিশ্চিতভাবেই ধর্মভ্রষ্ট; আর ইহুদি ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয়, তবে খ্রিষ্টান ধর্মকে ইহুদি ধর্মভ্রষ্ট বিবেচনা করা যায় না। সে ক্ষেত্রে খ্রিষ্টান ধর্ম হয় বিশ্বাসের স্বাধীন সত্তা। তবে এতে করে যিশুর শিক্ষায় ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নবোধক হয়ে পড়ে। এসব প্রশ্ন বিদায় নেয় না। এগুলো একটি বিতর্কের প্রাথমিক সংস্করণের (বর্তমানেও এগুলো নিয়মিত সামনে আসে) প্রতিনিধিত্ব করে, যা তিন ইব্রাহিমি ধর্মের 'অভিন্ন ঈশ্বর'-সম্পর্কিত যেকোনো ধারণা প্রত্যাখ্যান করে এবং ঘোষণা করে, তিন ধর্মের ঈশ্বর পরস্পরের ভিন্ন। তবে যেকোনো ক্ষেত্রে বায়জান্টিয়ামে মারসিয়নবাদ খ্রিষ্টান রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি একটি প্রধান চ্যালেঞ্জের প্রতিনিধিত্ব করে।

৩১৩ সালে সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টান ধর্ম আইনসম্মত হওয়ার পর পরবর্তী প্রধান ও দীর্ঘস্থায়ী ধর্মভ্রষ্টতা হিসেবে আবির্ভূত হয় আরিয়ানিবাদ। এখানেও খ্রিষ্টের প্রকৃতিই ছিল এর কেন্দ্রে। আরিয়াস (আনুমানিক ২৫০-৩৩৬ সিই সাল) ছিলেন প্রখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক। তিনি লিবিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, পড়াশোনা করেছিলেন অ্যান্টিয়কে (বর্তমান তুরস্কে)। সেখানেই তিনি তার ধারণাগুলোর বেশির ভাগ আত্মস্থ করেছিলেন। তারপর তিনি মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাস করে শিক্ষাদান করতে থাকেন। তখন সেটাই ছিল খ্রিষ্টান ধর্মের প্রধান (প্রতিদ্বন্দ্বী) কেন্দ্র এবং প্রাথমিক খ্রিষ্টধর্মের প্যাট্রিয়াকভুক্ত এলাকা। তিনি প্রচার করেন, যিশুকে সৃষ্টি করেছেন 'পিতা', ঠিক যেভাবে করা হয়েছে 'পবিত্র আত্মা'কে। আর উভয়েই

‘সত্যিকারের’ ঈশ্বর, ‘মহাস্রষ্টা’র ‘ঈশ্বর পিতা’র (গড দি ফাদার) অধীনস্থ। অর্থাৎ যিশুর একটা সূচনা ছিল, তবে তা ঈশ্বরের কখনো ছিল না। ঈশ্বর স্ব-অস্তিত্বশীল, কিন্তু ‘পুত্র’ তা নন। এ কারণে তিনি নিজে স্রষ্টা হতে পারেন না। যিশু তাই নিম্নতর সত্তা।

এ ধরনের বিশ্বাস চার্চের অর্থোডক্স অবস্থানকে (‘গড দি ফাদার’, ‘গড দি সন’, ‘গড দি হলি স্পিরিট ’-এর অস্তিত্ব সব সময় ছিল এবং সম-অস্তিত্বশীল হিসেবে একই সাথে তা বিরাজ করবে) ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আরিয়ান মতবাদটি ৩২৫ সালে কাউন্সিল অব নিকায়ায় আলোচিত নিসেন ক্রিডে ধর্মভ্রষ্ট হিসেবে বাতিল করে দেয়া হয়। তবুও আন্দোলনটি প্রবল শক্তি বজায় রাখত এবং এমনকি সম্রাট কনস্টানটাইনের উত্তরসূরির সহানুভূতিও লাভ করেছিল। আরিনিবাদ ইউরোপের জার্মানিক গোত্রগুলোর মধ্যে এবং বিশেষ করে আলেকজান্দ্রিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অংশে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ায় যিশু ‘গৌণ’ সত্তা এবং ‘গড দি ফাদার’-এর সমান পর্যায়ের নন- এমন ধরনের চিন্তাধারা গ্রহণ করার ব্যাপারে আগে থেকেই প্রবল জনমত তৈরি ছিল।

আলেকজান্দ্রিয়ার প্রভাব বাড়ানোর জন্য এই মতবাদটি একটি বাহন হিসেবে কাজ করতে থাকে। জটিল ‘ত্রিত্ব’ ধারণা এবং স্রষ্টার সমপর্যায়ে যিশুর নিজের অবস্থান নিয়ে যে অস্বস্তি ছিল, এই অ্যারিয়ান দৃষ্টিভঙ্গির অটল থাকার মধ্যে তা প্রতিফলিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, ‘এক স্রষ্টা’র (ইহুদি বিশ্বাস এবং পরবর্তী সময় আসা মুসলিম মতবাদের নির্যাস) ধারণাকে তরল না করার অনেক বেশি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের উপাদানের প্রতি স্থায়ী সহানুভূতি ছিল। এটা আধুনিক ইউনিটারিয়ান চার্চেরও ধর্মতত্ত্ব।

ধর্মভ্রষ্টতা ও বিদ্বেষের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সত্ত্বেও কোনো কোনো ধর্মভ্রষ্টতা সত্যিকারভাবেই সম্পর্ক ছিন্ন করতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। বস্তুত, খ্রিষ্টের সত্যিকারের প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক নিয়ে যেকোনো ধরনের খ্রিষ্টান মতৈক্যে কখনো পৌঁছেনি, কখনো পৌঁছা যাবে না।

আরিয়ানবাদ যিশুকে স্রষ্টার সাথে ‘সমান মর্যাদা’ প্রদানকে প্রত্যাখ্যান করে। আবার আরেকটি প্রধান ধর্মভ্রষ্ট মতবাদ মনোফিসিটিবাদ সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা উপস্থাপন করে বলতে থাকে, যিশুর কিছু মানবীয় গুণ থাকলেও মৌলিকভাবে তিনি ঈশ্বরিক প্রকৃতিসম্পন্ন। খ্রিষ্ট ছিলেন উভয়টাই তথা পুরোপুরি মানুষ এবং পুরোপুরি ঈশ্বরিক- চার্চের এই শিক্ষার সাথে এটা সাঙ্ঘর্ষিক। ৪৫১ সালে চ্যালেসেডোনে অনুষ্ঠিত চতুর্থ কাউন্সিলে মনোফিসিটিবাদের শিক্ষাকে ধর্মভ্রষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এটা ছিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং চার্চের কাঠামোতে তা প্রবল ও স্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটায়। ওই স্থায়ী বিচ্ছেদের ফলে গঠিত গ্র“পই আজকের অরিয়েন্টাল অর্থোডক্স বা মনোফাইসাইট চার্চ নামে পরিচিত হয়।

মনোফাইসাইট দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় সিরিয়া, লেভ্যান্ট, মিসরে। এসব কেন্দ্র থেকেই কনস্টানটিনোপলের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিরোধ করা হয়েছিল। এ ছাড়া আর্মেনিয়া ও ইথিওপিয়ার মতো দূরবর্তী স্থানগুলোতেও তাদের ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়।

এ ছাড়া যিশুর প্রকৃতি নিয়ে অন্যান্য ভাষ্যও আরো অনেক ধরনের ধর্মভ্রষ্টতার সৃষ্টি করে। ইবিনোনিবাদ ছিল প্রথম শতকে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের উপদল। তারা ইহুদি ধর্মের বিকৃত প্রভাব ধারণ করে : তারা মনে করে যিশুকে নবী স্বীকার করলেও তার ঐশ্বরিক প্রকৃতি স্বীকার করত না, যা পলের ভিশন প্রত্যাখ্যান। এটা বর্তমানের ইসলামের যিশু সংস্করণের সরাসরি সমান্তরাল ধারণা।

ইউতিচিয়ানিবাদ যুক্তি দেখায়, যিশু কিছুটা মানবীয় উপাদান ধারণ করলেও তাতে ঐশ্বরিক উপাদানই ছিল প্রাধান্যকর অবস্থায়। এই ইস্যু নিয়ে বিতর্কের বেশির ভাগই তা-ই মেরির সাথে সম্পর্কিত : 'যিশুর মা' কি স্রষ্টা ছিলেন? কিংবা যিশুর মানবীয় দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী কেবল তার 'মা'? এই মতাদর্শের আলোকে গ্রিকে মা মেরির পদবি ভিন্ন হয়েছিল।

এসব বিষয় নিয়ে এই প্রতীকী তাত্ত্বিক বিতর্ক ভৌগোলিক স্বার্থে বাড়ত কিংবা এমনকি স্ফুলিংও সৃষ্টি করত : ইউতিচিয়ানিবাদ ৪৩৩ সালে কনস্টানটিনোপলের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর (প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্টিয়কও এই মর্যাদা কামনা করত। এই নগরীটি যিশুর ব্যাপারে আরো গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করত।) মর্যাদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক সমাধান খোঁজার সাথে সম্পর্কিত ছিল।

ডোসিতিবাদে যুক্তি দেখানো হয়, যিশুর দেহ শারীরিকভাবে একটি মায়া এবং তার মৃত্যুটা দৃষ্টিগত ভ্রম মাত্র। বাস্তবে তিনি বিশুদ্ধ আত্মা, তিনি কখনো মারা যেতে পারেন না। এই দুনিয়ার বস্তু মাত্রই সহজাতভাবেই খারাপ এবং এ কারণে স্রষ্টা বা তার পুত্র বস্তুগত হতে পারেন নাÑ এই বিশ্বাস এই ধারণার সাথেও সম্পর্কিত। ইসলাম বিশ্বাস করে, যিশু শুধু দৈহিক সত্তা, তিনি ঐশ্বরিক নন। এতে এই ধারণার সাথে একমত পোষণ করা হয়, যিশু ক্রসে মারা গেছেন বলে দেখতে পাওয়াটা একটা ভ্রম, তাকে আসলে আল্লাহ রক্ষা করে বেহেশতে নিয়ে গেছেন।

পেল্যাজিয়ানবাদের উৎপত্তি রহস্যময় এক সন্ন্যাসীর মাধ্যমে। তিনি সম্ভবত কোনো ব্রিটিশ দ্বীপ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় চার্চের শিক্ষা 'আদি পাপ' (আদম ও হাওয়ার আদি পাপের কারণে মানবজাতি সহজাতভাবেই পাপী, এই বিশ্বাস) ধারণা অস্বীকার করেন। আদি পাপ ধারণা অস্বীকার করার মধ্যে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা হলো শুধু বিশ্বাসের মাধ্যমেই মোক্ষ লাভ করা যায়

বলে চার্চ যে শিক্ষা দিয়ে থাকে তার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। দৃষ্টিভঙ্গিটি তাই ৪১৬ সালে ধর্মভ্রষ্ট হিসেবে ঘোষিত হয়। ইসলামও আদি পাপ এবং মানবজাতির জন্মসূত্রে পাপী হওয়ার ধারণাটির বৈধতা স্বীকার করে না। যিশুর ভূমিকা একটি একক ঐশ্বরিক সত্তা নাকি মানব ও ঐশ্বরিক ইচ্ছা উভয়টির সমন্বিত রূপের প্রতিনিধিত্ব করেছিল তা নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া ও কনস্টনটিনোপলের প্রতিদ্বন্দ্বী চার্চের মধ্যে জরবদস্তিমূলক আপসের চেষ্টা করে সফল হয়নি মনোথেলেতিবাদ। এটা দুর্বোধ্য মনে হলেও মতবাদটি পুরোপুরি রাজনৈতিক ভিত্তিতে ইস্টার্ন চার্চের মনোফাইসিত ধর্মভ্রষ্টতা প্রশ্নে সৃষ্ট বিভক্তি নিরসনের চেষ্টা ছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আপসরফা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। ধর্মতত্ত্বের ওপর রাজনীতি জয়যুক্ত হয়।

এসব ধর্মভ্রষ্টতার বিস্তারিত বিবরণ বেশ বিস্ময়কর। কারণ তারা যা প্রকাশ করেছে, সেগুলো যিশুর প্রকৃতি-বিষয়ক জটিল, খুঁটিনাটি এবং আইনগত ব্যাখ্যা। আর এগুলোর সবই প্রধানত ইসলাম আবির্ভাবের আগেই ঘটেছিল। ইসলাম অবশ্যই খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব প্রশ্নে এই বিতর্কের অংশবিশেষ বিবেচনা করেছিল।

এসব বিতর্ক নিয়ে আধুনিক কিছু অন্তর্দৃষ্টির উল্লেখ ছাড়া ধর্মভ্রষ্টতা নিয়ে কোনো আলোচনাই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কোনটি ধর্মভ্রষ্টতা এবং কোনটি নয়, তা নির্ধারণে ক্ষমতা হয়তো বিশেষ সুবিধা পেয়েছিল, কিন্তু ধর্মভ্রষ্টতার সব সময়ের অর্থ কিন্তু দৃশ্যপটে নতুন কিছু বোঝাত না। ১৯ শতকের শেষ দিকে জার্মান ধর্মতাত্ত্বিক ওয়াল্টার বাউয়ার প্রাথমিককালের খ্রিষ্টান ধর্মের বিবর্তন নিয়ে বিস্ময়কর গবেষণায় দেখান, আমরা আজ যেটাকে 'ধর্মভ্রষ্ট' হিসেবে বিবেচনা করছি, সেটা আসলে প্রায় ক্ষেত্রেই যিশুর প্রকৃতি নিয়ে সর্বপ্রাচীনকালের খ্রিষ্টান উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটায়।

তিনি যুক্তি দিয়ে দেখান, বস্তুত, চার্চই পরের শতকগুলোতে নবতর ব্যাখ্যা প্রবর্তন করে নতুন নতুন গোঁড়ামি প্রতিষ্ঠা করেছিল, অনেক সময় মূল খ্রিষ্টান বিশ্বাস এবং এমনকি কিতাব পর্যন্ত বদলে দিত। পরবর্তীকালের প্রতিষ্ঠান এবং চার্চের রাজনৈতিক নির্দেশনায় চালিত হয়ে পূর্ববর্তী উপলব্ধির 'ধর্মভ্রষ্ট' ঘোষণা করার জন্য এসব ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছিল। এসব দৃষ্টিভঙ্গি সম্প্রতি আরো ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করেছেন চ্যাপেল হিলের নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব রিলিজিয়াস স্টাডিজের চেয়ারম্যান প্রভাবশালী গবেষক বার্ট এহরম্যান।

বস্তুত, আমরা এখনো ইব্রাহিমি বিশ্বাসগুলোর গুটিকয়েক ছোট শাখার ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নমনীয়তা দেখতে পাই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, স্রষ্টার বাণী নিরবচ্ছিন্নভাবে অবতীর্ণ হতে থাকার মতবাদটি কোয়াকার্স, চার্চ অব জেসাস ক্রাইস্ট অব লেটার-ডে সেন্টস (মর্মন), পেন্টেসোস্টাল এবং ক্রিস্টম্যাটিক খ্রিষ্টান এবং একই সাথে বাহাই বিশ্বাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এসব ধর্মানুশাসন অনুযায়ী,

স্রষ্টার প্রত্যাদেশ কখনো বন্ধ হয় না এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়গত পর্যায়ে প্রত্যাদেশ পেতে থাকে। সময়ের পরিক্রমায় এসব ধারণা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

অন্যান্যের মধ্যে বাহাই গ্রুপ সোচ্চারভাবে সময়ের সাথে তাল রেখে স্রষ্টার বাণী প্রচারের জন্য ক্রমাগত নবীদের আগমনের 'অগ্রগতিমূলক প্রত্যাদেশ' মতবাদ প্রচার করছে। এসব অগ্রগতিমূলক প্রত্যাদেশ এমন মানবজাতির জন্য প্রণীত, যাদের স্রষ্টা সম্পর্কিত ধারণা গভীরতর ও পরিবর্তিত হয়। তাই সৃষ্টিতত্ত্ব আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হলে মানবজাতির জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাদেশের প্রয়োজন।

ইসলামও প্রায় একই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়ে। ৭৫০ সালে প্রথম ইসলামি বংশীয় খিলাফত উমাইয়াদের পতনে অনেক কারণের মধ্যে দু'টি প্রধান ইস্যু ছিল : পুরোদস্তুর আরব নগরী দামাস্কাসে তার একটি ক্ষমতার ঘাঁটি ছিল এবং সেটা বাগদাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এবং এর ইরাকি-পারসিক সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী আব্বাসীদের উদীয়মান শক্তির চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। অধিকন্তু আব্বাসীয়রা আরব উমাইয়াদের আমলে সমান ক্ষমতা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত সদ্য মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিতদের দাবির প্রতিনিধিত্ব করেছিল। তা-ই এসব খিলাফতের উত্থান ও পতন ঘটেছিল ধর্মতাত্ত্বিক নয়, আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক কারণে।

ধর্মের শক্তির ভূমিকা আমাদের সময়কাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে স্বীকৃত। ইরানের নির্বাচন প্রশ্নে হিজবুল্লাহ নেতাদের সাথে তার মতবিরোধের পর দক্ষিণ লেবাননের টায়ারের শিয়া মুফতির এই ২০০৯ সালের জুনের মতো সাম্প্রতিক সময়ে করা মন্তব্য বিবেচনা করা যেতে পারে। সৈয়দ আলী আমিন বলেন, লেবাননি শিয়া হিজবুল্লাহ আন্দোলন ইরানে ধর্মনেতাদের ভূমিকা প্রশ্নে থিসিস নিয়ে আলোচনা বন্ধ করার প্রয়াস চালাচ্ছে এ কারণে যে, এই মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করা হলে তা লেবাননে হিজবুল্লাহর নিজস্ব ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তিনি বলেন, 'এটাই বৃহত্তম প্রমাণ যে [ধর্মনেতাদের শাসন] ধর্মীয় বিশ্বাসের অংশ নয়, বরং তা ক্ষমতা ও রাজনৈতিক মতাদর্শের।'

ধর্মতাত্ত্বিক ইস্যু প্রশ্নে ক্রুদ্ধ বিতর্ক শেষ পর্যন্ত অনিবার্যভাবে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বার্থের ভিত্তি নিয়ে বিতর্কে পরিণত হয়। ইসলাম যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন আর ধর্মতত্ত্ব অঞ্চলটিতে কোনো বিষয় ছিল না, বরং তা হয়ে পড়ে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে ক্ষমতা ও আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন। এটা মধ্যপ্রাচ্যের স্বাভাবিক রাজনীতিও। রাষ্ট্র, ক্ষমতা, মতাদর্শ এবং ধর্মভ্রষ্টতার সঙ্ঘাত পরের শতকগুলোতেও পরস্পরের সাথে মিলেমিশে যাওয়া অব্যাহত রাখবে।

তবে আমাদের বর্তমান যুক্তির জন্য সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো খ্রিষ্টান বায়জান্টাইন সাম্রাজ্য ও ওয়েস্টান চার্চের মধ্যকার দ্রুত বাড়তে থাকা উত্তেজনা। আমরা পরের অধ্যায়েও দেখব, নতুন ভৌগোলিক শক্তি হিসেবে ইসলাম শুধু কনস্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইস্টার্ন সাম্রাজ্যের নগরীগুলোর পাশ্চাত্যবিরোধিতাই নয়, সেই সাথে বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যেই সৃষ্ট অনেক রোমবিরোধী প্রচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গিও উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। বায়জান্টাইন যখন এই বিশ্বাস থেকে নিজের গভীরতম পরিচিতি সৃষ্টি করেছিল যে রোমান সাম্রাজ্যের সত্যিকারের ঐতিহ্যকেই সে চিরদিনের জন্য স্থায়িত্ব দিচ্ছে, তখন সে ওয়েস্টার্ন চার্চকে দেখতে থাকে ক্রমাগতভাবে ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে, যার শক্তি ইসলামের মতোই চূড়ান্তভাবে বায়জান্টাইন শক্তি ও পরিচিতিকে হুমকিগ্রস্ত করতে থাকে। ফলে ইসলাম না থাকলেও মধ্যপ্রাচ্য পাশ্চাত্যবিরোধী অবস্থানেই থাকার মতো যথেষ্ট সামর্থ্যবান ছিল।

অধ্যায় তিন

বায়জান্টাইন বনাম রোম : প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রিষ্টান মেরুকরণ

ইসলাম যদি কখনোই ইতিহাসের মঞ্চে আবির্ভূত না হতো, তবে আজকের মধ্যপ্রাচ্যে এখনো যে ধর্মের প্রাধান্য থাকত তা নিঃসন্দেহে ইস্টার্ন অর্থোডক্স খ্রিষ্টান। সেখানে আর কোনো বিশ্বাসযোগ্য ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আর প্রাধান্য অবস্থায় থাকা অর্থোডক্স চার্চ ঠিক এখনো সম্ভবত পাশ্চাত্যের প্রতি গভীর সন্দেহ পোষণ করত। ইস্টার্ন অর্থোডক্স এখনো ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা এবং মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে তাদের প্রাধান্য অব্যাহত রাখলে তারাই সম্ভবত পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে কয়েক শতক দুঃখ-দুর্দশা ও সংঘাত প্রশ্নে পূর্বাঞ্চলের পুঞ্জীভূত ক্রোধের পতাকাবাহী হতো। আমরা পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে এ থিমটি গড়ে উঠতে দেখব যে, ইসলাম যদি না-ও থাকত, তবুও পাশ্চাত্যকে অবিশ্বাস ও ভয় করত মধ্যপ্রাচ্য।

ইসলামের থাকা বা না-থাকা যা-ই হোক না কেন, ইস্টার্ন (বায়জান্টাইন) সাম্রাজ্য ও ওয়েস্টার্ন (রোমান) সাম্রাজ্যের মধ্যকার এসব পার্থক্যের (ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, শৈল্পিক ও মনস্তাত্ত্বিক) অস্তিত্ব স্যামুয়েল হান্টিংটনের মতো স্কলাররা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতেন, বিভিন্ন বিশ্বব্যবস্থার অন্যতম হিসেবে ইস্টার্ন অর্থোডক্স পাশ্চাত্যের সাথে 'সংঘাতে' লিপ্ত হতে পারে। বস্তুত ওই বৈরিতা এখনো সেখানে রয়ে গেছে, এমনকি যদিও চার্চ এখন আর মধ্যপ্রাচ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে না।

আমাদের পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে আমরা ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চের ব্যাপারে সত্যিই অন্ধ। আমাদের চার পাশে এসব চার্চ খুবই কম দেখি, খ্রিষ্টান এবং মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে ইস্টার্ন চার্চ কত যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল, তা আমরা অনুধাবন করতে সাধারণত ব্যর্থ হই। প্রথমত, এটাই মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে 'স্থানীয়' খ্রিষ্টান ধর্ম। রোমান ক্যাথলিক চার্চের তুলনায় শাস্ত্রাচার, ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আলাদাভাবে গড়ে উঠেছে এবং জেরুসালেম থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। অধিকন্তু মুসলিম মধ্যপ্রাচ্যে এখনো সংখ্যালঘু অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের আকারে অস্তিত্বশীল রয়েছে। মূল চার্চের সাথে আকার ও প্রকৃতিতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতার কারণে সে নিজেকে নিয়ে গর্বিত, তারা মূল চার্চ ভূমিতে জীবন শুরু করেছে, ওয়েস্টার্ন ল্যাটিন চার্চের মতাদর্শগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি তারা এড়াতে পেরেছে বলে বিশ্বাস লালন করে।

অর্থোডক্স চার্চে পাশ্চাত্য-বিরোধিতাবাদ এখনো গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত। আরো অবাক ব্যাপার হলো, ইস্টার্ন অর্থোডক্সের মধ্যে থাকা এসব পাশ্চাত্যবিরোধী অনুভূতির অনেকগুলোই পাশ্চাত্যের প্রতি সুনির্দিষ্ট মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির সাথেও প্রবলভাবে মিলে যাওয়ায় পাশ্চাত্যের প্রভাব, উদ্দেশ্য ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে একই দৃষ্টিভঙ্গি, সন্দেহ ও দুর্দশার অভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক উৎসের ধারণাই সৃষ্টি হয়। আমরা ইতোমধ্যেই ইসলামের সাথে আরো অনেক ব্যাপারে এ ধরনের সম্পৃক্ততা লক্ষ করেছি : যিশুর প্রকৃতি নিয়ে চার্চ কর্তৃপক্ষের পরবর্তীকালে ধর্মভ্রষ্ট ঘোষিত অনেক খ্রিষ্টান মতবাদ একই সাথে যিশুবিষয়ক ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির মতোই। অর্থোডক্স চার্চ এবং ইসলাম উভয়ের পক্ষ থেকে পাশ্চাত্য শক্তির প্রতি অভিন্ন অনুভূতি এটাই বলে, সভ্যতাগত 'বিভেদ রেখাটি' ¯্রফে এসব ধর্মের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা নয়; অনেক অনেক আগে থেকেই পাশ্চাত্যের প্রকৃতি এবং মধ্যপ্রাচ্যের সাথে তার সঙ্ঘাত নিয়ে অনেক কিছুই করার আছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রকৃতির পার্থক্য প্রায়ই আপাত ছোটখাটো ধর্মতাত্ত্বিক পার্থক্যকে মারাত্মক ধর্মভ্রষ্টতা ও বিদ্রোহে রূপান্তরিত করে ফেলতে পারে। (একই কথা প্রযোজ্য ইসলামের শিয়া-সুন্নি বিভক্তির ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে পার্থক্য শুরু হয়েছিল নবী সা:-এর উত্তরসূরি নিয়ে, এতে ধর্মতাত্ত্বিক বিষয় বলতে গেলে ছিলই না, তবে পরবর্তীকালে সেটা গভীরতর সাম্প্রদায়িক বৈরিতার জন্ম দেয়।)

মুরগি আগে না ডিম আগে ধরনের প্রশ্ন সৃষ্টি হয় এখানে : ধর্মতাত্ত্বিক মতপার্থক্য কি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সঙ্ঘাত উসকে দেয়? কিংবা এর বিপরীতে বিরাজমান সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতপার্থক্য ধর্মতাত্ত্বিক বা আদর্শগত বিষয়ে প্রতিফলিত হয়? একবার ছোট্ট একটা ধর্মতাত্ত্বিক বিভক্তির প্রকাশ ঘটলে, তা প্রায়ই পরিচিতির ব্যক্তি-সমাজের এবং এমনকি সম্প্রদায়গত বিষয়ে পরিণত হয়? আরেকভাবে তা দেখা যেতে পারে, যিশুর যথার্থ প্রকৃতি লোকজন ছোট ছোট ধর্মতাত্ত্বিক পয়েন্টে নিয়ে যৌক্তিকভাবে ভিন্নমতে থাকতেই পারে। কিন্তু কোন উদ্দীপনায় তারা সেগুলোর জন্য হত্যা করতে পারে বা মারা যেতে পারে? ফলে এখানে আরো অনেক বিষয় সক্রিয় থাকতে পারে।

পূর্ব-পশ্চিম ভূ-রাজনৈতিক সংগ্রামের দুই সহস্রাধিক বছরের ইতিহাসের সূচনা দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার জন্য আমাদের আলেক্সান্ডার দি গ্রেটের আমলে ফিরে যেতে হবে। আলেক্সান্ডারই ৩৩৪ বিসিইতে পাশ্চাত্য শক্তির প্রথম মহান অনধিকার প্রবেশকারী হিসেবে এশিয়া অভিযান শুরু করেছিলেন গ্রিস থেকে তার বাহিনীকে পারস্যের প্রাধান্যপূর্ণ আনাতোলিয়ায় পাঠিয়ে, ইরানের শক্তিশালী পারসি জরস্ত্রীয় আকেমেনিড সাম্রাজ্য দখল করে। এসব অঞ্চল আলেক্সান্ড্রীয় সাম্রাজ্যের মাত্র সামান্য অংশে পরিণত হয়েছিল, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সিরিয়া, মিসর ও ইরাকের অংশবিশেষ। এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতবর্ষের সীমান্ত ছুঁয়ে গিয়েছিল। এশিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা বড় ধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও মিথস্ক্রিয়া। এটা সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ হলেও রাজনৈতিকভাবে প্রায়ই বৈরিতাপূর্ণ বিরাট ক্ষত সৃষ্টি করে যায়। ইতোমধ্যেই গ্রিসের বিরুদ্ধে পারস্য কয়েক শতাব্দী ধরে সবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এশিয়ার জন্য গ্রিস ছিল পাশ্চাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু"।

গ্রিক প্রভাব পিছু হটতে থাকায় আলেক্সান্ড্রীয় সাম্রাজ্যের উত্তরসূরি সেলেসিডরা সেমিটিক ও পারসি ভাষাভাষী বিশ্বের সীমান্তগুলোতে গ্রিক সামরিক ও সীমান্ত ফাঁকি বহাল রাখে। সিরিয়া ও আনাতোলিয়া প্রধান রণাঙ্গনের প্রতিনিধিত্ব করে, এখানে এসব বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি কয়েক শ' বছর ধরে মেশে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। রোমান সাম্রাজ্যকে পরিশেষে ছাপিয়ে যায় আলেক্সান্ডারের হেলেনিস্টিক সাম্রাজ্যগুলো। চতুর্থ শতক নাগাদ, এটা কনস্টান্টিনোপল এবং এর আশপাশের এলাকায় বিস্তৃত হয়। এ অঞ্চলটি প্রথমে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব শাখা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল। ফলে ইস্টার্ন রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় পূর্ব-পশ্চিম রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর গ্রিক বা রোমান শক্তি এবং পারস্য বা সেমেটিক সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রায় ৬০০ বছর স্থায়ী যুদ্ধের প্রবল রেশ রয়ে গিয়েছিল।

তবে এই অঞ্চলের সঙ্ঘাত খুব সামান্যই গ্রিক বনাম পারস্য কিংবা সেমেটিক সংস্কৃতির মধ্যে সীমিত ছিল। রোম ও কনস্টান্টিনোপলের নিজেদের মধ্যে সক্রিয় বৈরিতা (রোমান সাম্রাজ্যের ভেতরে) অন্তত দ্বিতীয় শতকের মতো পেছনের সময়ও ছিল। ওই সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা পাঁচ প্রাথমিক খ্রিষ্টান প্যাট্রিয়াকের (রোম, কনস্টানটিনোপল, আলেক্সান্ডিয়া, জেরুসালেম ও অ্যান্টিয়ক) মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল। এদের মধ্যে তিন প্যাট্রিয়াক সপ্তম শতক নাগাদ একে একে ইসলামি শাসনের আওতায় চলে আসার প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় অবস্থা অব্যাহত রাখলেও তাদের স্থানীয় সেকুলার কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলতে থাকে। এতে করে প্রভাব ও ক্ষমতার জন্য রোম ও কনস্টান্টিনোপলের মধ্যে সংগ্রাম দুইভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সময়ের পরিক্রমায় এই দুয়ের মধ্যে ধর্মতাত্ত্বিক ও শাস্ত্রাচারগত ব্যবধান বাড়ার প্রেক্ষাপটে রোম নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি জোর দিয়ে বলা অব্যাহত রাখে, আর কনস্টান্টিনোপল একেবারে সব ব্যাপারে নিজেকে সমকক্ষ দাবি করতে থাকে। এর পরপরই রোম প্যাট্রিয়াক পদটির স্থানে রোমের পোপ প্রতিষ্ঠা করাটা ছিল প্রাচ্যের প্রধান খ্রিষ্টান কেন্দ্রগুলোতে প্যাট্রিয়াকদের 'অপেক্ষাকৃত কম' মর্যাদার বিপরীতে নিজের অবস্থান বাড়িয়ে নেয়া। শ্রেষ্ঠত্বের এ বিষয়টি এমনকি এখন পর্যন্ত দাপটের সাথে বিরাজ করছে।

ক্ষমতা নিয়ে দূরত্ব ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক ব্যবধানেও প্রতিফলিত হতে থাকে। আমরা যখন কনস্টান্টিনোপলের কথা বলি, সেটা অনিবার্যভাবে দীর্ঘস্থায়ী গ্রিক সাংস্কৃতিক অঞ্চলের কথাই বলি। কনস্টান্টিনোপল ছিল গ্রিক ভাষাভাষী বিশ্বের কেন্দ্র। এই সাংস্কৃতিক অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রিক ও ল্যাটিন খ্রিষ্টান ধর্মের (মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য) মধ্যকার সঙ্ঘাত বাড়াতে সহায়ক হয়েছিল। কনস্টান্টিনোপলের গ্রিক মূল আসলে অনেক দিনের পুরনো; এর বন্দরটি ষষ্ঠ বিসিই শতকে গ্রিকদের কাছে প্রথমে বাইজানশন নামে পরিচিত ছিল। এর প্রায় ৯০০ বছর পর ৩৩০ সিই'র দিকে রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন নগরীটি 'নতুন করে প্রতিষ্ঠা' করে নিজের নামে এর নামকরণ করেন। তিনি এটাকে বিশাল রোম সাম্রাজ্যের আরো নিরাপদ দ্বিতীয় রাজধানী বিবেচনা করেন এমন এক সময় যখন রোম সার্বক্ষণিক বর্বর হামলার মুখে পড়েছিল। রোম সাম্রাজ্যের দু'টি আলাদা শাখার (একটি ইস্টার্ন এবং অন্যটি ওয়েস্টার্ন) আবির্ভাব ঘটল এখন।

গৃহযুদ্ধ, সম্রাটদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সার্বক্ষণিক বর্বর আক্রমণের মুখে একের পর এক বিভক্তির শিকার হয়ে মহিমান্বিত 'ওয়েস্টার্ন রোমান সাম্রাজ্যের' মূল ধারণাটি পর্যন্ত এই পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান হারে কল্পকাহিনীতে পরিণত হতে থাকে। ৪৭৬ সিইতে জার্মানিক আক্রমণের মুখে রোমে রোমান সম্রাটের চূড়ান্ত পতন ঘটলে রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম শাখাটি শেষ হয়ে যায়। কনস্টান্টিনোপলের পূর্ব শাখাটি এখন রোম সাম্রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ আলখেল্লার উত্তরাধিকারী হলো। বলকান, আনাতোলিয়া, ইস্টার্ন মেডিটেডরিনিয়ান (পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয়), এবং উত্তর আফ্রিকার বিশাল ভূখণ্ডগুলো তাদের পুরোপুরি অধিকারে আসে।

রোমান সাম্রাজ্যের নতুন কেন্দ্র হিসেবে কনস্টান্টিনোপলের আবির্ভাব চূড়ান্ত সাংস্কৃতিক পরিণাম বয়ে আনে। ওয়েস্টার্ন সাম্রাজ্যে ল্যাটিনের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের বিপরীতে গ্রিক ছিল ইস্টার্ন মেডিটেরানিয়ান (পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা) পুরো এলাকার সাধারণ ভাষা। ফলে নগরী ও অঞ্চলটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রিক সাংস্কৃতিক চরিত্র প্রদর্শন করতে থাকে। কনস্টান্টিনোপলের অন্যতম তুরুপের তাস ছিল নিউ টেস্টামেন্ট। সেটাও লিখিত হয়েছিল ল্যাটিন ভাষায় নয়, গ্রিকে। ল্যাটিন আরো কয়েক শ' বছর মাত্র 'ইস্টার্ন সাম্রাজ্যে'র প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে টিকে থাকে। কনস্টান্টিনোপলের শিক্ষিত শ্রেণীটি ল্যাটিন ভাষা ও সংস্কৃতির জ্ঞান লাভ অব্যাহত রাখা এবং রোমান সভ্যতার পতাকা বহন অব্যাহত রাখার জন্য সন্দেহাতীতভাবে নিজেদের নিয়ে গর্বিত ছিল। কিন্তু ভাষা নিজেরাই তাদের বৃহত্তর সংস্কৃতি নির্ধারণ করতে শুরু করল : পশ্চিমে সাম্রাজ্যের ছিটেফোঁটা অংশবিশেষ 'ল্যাটিন', এবং পূর্বে একটি শক্তিশালী 'গ্রিক' সাম্রাজ্য। পরবর্তী শতকগুলোতে এসব পরিভাষা পারস্পরিক বিদ্রুপের ভাষায় পরিণত হলো : কনস্টান্টিনোপলে 'ল্যাটিন' কিংবা রোমে 'গ্রিক' বলা অমর্যাদার চেয়ে কম কিছু ছিল না। অধিকন্তু, এরপর আর কোনো সম্রাট একই সাথে রোম ও কনস্টান্টিনোপল শাসন করতে পারেননি। রোম সঙ্কুচিত হতে হতে 'পূর্ব' রাজধানীর মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে; পোপকে প্রতীকের চেয়ে সামান্য কিছু হিসেবে জাঁকালো নিঃসঙ্গতায় ফেলে রাখা হয়, কয়েক শ' বছর তিনি কার্যত তাকে ঘিরে রাখা বাহিনীর কাছে বন্দী ছিলেন।

ওয়েস্টার্ন সাম্রাজ্যের আর কোনো ধরনের টিকে থাকার অনুপস্থিতিতে কনস্টান্টিনোপলের এই 'রোমান' রাজধানীর প্রকৃতি কী হয়েছিল? সময়ের পরিক্রমায়, প্রাচ্যে রোমান সাম্রাজ্যের স্থায়ীকরণ ও সুরক্ষাকরণের এক ধরনের বিশেষ মিশন গঠন করে কনস্টান্টিনোপল। কনস্টান্টিনোপল এখন পশ্চিম (গথ, ফ্রাঙ্ক, অ্যালান, হুনদের বিরুদ্ধে) এবং পূর্ব (পৌত্তলিক স্লাভ, জরথ্রুস্ত্রীয় পারসি এবং পরবর্তীকালের আরব ও তুর্কিদের বিরুদ্ধে) উভয় দিকেই নতুন বর্বরদের বিজয়ের বিপরীতে খ্রিষ্টান সভ্যতা ও আধ্যাত্মিকতার শেষ ঘাঁটি। ইস্টার্ন রোমান সাম্রাজ্য এখন ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে রোম ও পাশ্চাত্য থেকে ক্রমবর্ধমান হারে ভিন্ন নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচিতি বিকাশ করতে থাকে।

নামের যুদ্ধ

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব, পূর্বঘোষিত পরিচিতি বহন করে নাম। আপনি এখনো কনস্টান্টিনোপল এবং ইস্টার্ন চার্চকে কী বলা উচিত তা নিয়ে উত্তেজিত গ্রিকদের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্ক শুনতে পারেন। ইস্টার্ন সাম্রাজ্যের মূল নামটি নিয়ে সঙ্ঘাত পূর্ব-পশ্চিম উত্তেজনার ব্যাপকতার কথা বলে।

গ্রিকভাষী বিশ্ব নিজের শিকড় থাকা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র ইতস্ততা ছাড়াই কনস্টান্টিনোপল নিজেকে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে উল্লেখ করা অব্যাহত রাখে। সেক্ষেত্রে আমরা কোন অবস্থা থেকে বলতে পারি, ইস্টার্ন রোমান সাম্রাজ্য থেকে কনস্টান্টিনোপল কার্যত গ্রিক বা বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হলো? আসলে এ ধরনের আনুষ্ঠানিক রূপান্তর কখনোই ঘটেনি। (বস্তুত 'বায়জান্টাইন' পরিভাষাটি প্রথম আবির্ভূত হয় ১৬ শতকে, যখন জনৈক জার্মান ইতিহাসবিদ ইস্টার্ন সাম্রাজ্যেকে 'বায়জান্টাইন' হিসেবে অভিহিত করেন।) কনস্টান্টিনোপল শেষ সময় পর্যন্ত নিজেকে দৃঢ়ভাবে রোমান সাম্রাজ্যে বিবেচনা করত, সে কখনোই ওই পরিভাষাটি ত্যাগ করেনি, এমনকি গ্রিক ভাষাও না।

ইস্টার্ন সাম্রাজ্য বর্ণনায় 'রোমান' শব্দটির শক্তি গ্রিক ভাষাভাষীদের ছাড়িয়ে গিয়ে ওই অঞ্চলের মুসলিম সংস্কৃতির মুখেও চলতে থাকে। লক্ষ করুন, মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান ভাষাগুলোতে (আরবি, তুর্কি ও পারসি) ইস্টার্ন খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যের পরিচিতি ছিল 'রুম' (রোম) হিসেবে, এবং এমনকি বর্তমানেও এটি প্রচলিত। রুম শব্দটি এখনো ইস্টার্ন রোমান সাম্রাজ্য বা আনাতোলিয়ার (এশিয়া মাইনর) সাথে সম্পৃক্ত সব কিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পবিত্র কুরআনের একটি সূরার নাম হলো 'রুম', তাতে বায়জান্টাইন খ্রিষ্টানদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আনাতোলিয়া-ভিত্তিক প্রথম সেলজুক তুর্কি রাষ্ট্রটি নবম ও দশম শতকে আনাতোলিয়া ভূখণ্ড দখল নিয়ে কনস্টান্টিনোপলের সাথে দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তারা ঔদ্ধত্যসহকারে নিজেদের পদবি দিয়েছিল 'রুম সালতানাত'। মূল ভূমধ্যসাগরকে আরবিতে বলা হতো 'রুম সাগর'। (প্রখ্যাত সুফি কবি রুমির ফ্যানদের জন্য আমরা কেবল এটুকু উল্লেখ করতে পারি, নামটি রুমে তথা আনাতোলিয়ার ইস্টার্ন সাম্রাজ্য হিসেবে একদা পরিচিত এলাকায় বাসকারী লোকদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হতো।)

তবে পাশ্চাত্য এ পরিভাষাটি মেনে নেয়নি। ইস্টার্ন সাম্রাজ্য বোঝাতে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে 'রোম'-এর ব্যাপক ব্যবহার সত্ত্বেও পাশ্চাত্য এখনো কনস্টান্টিনোপলের কাছে রোমান সাম্রাজ্যের আলখেল্লা সমর্পণ করতে তিক্তভাবে অনিচ্ছুক রয়ে গেছে। যদিও এটা অস্বীকার করা যায় না, বর্বরদের কাছে ওয়েস্টার্ন সাম্রাজ্য পতনের দীর্ঘকাল পরও ইস্টার্ন সাম্রাজ্য তখন পর্যন্ত প্রাচ্যে বিকশিত হচ্ছিল। পাশ্চাত্য জোরালোভাবে ইস্টার্ন সাম্রাজ্যকে কেবল ইম্পেরিয়াম গ্রাকোরাম বা 'গ্রিকদের সাম্রাজ্য' হিসেবে উল্লেখ করে সুস্পষ্টভাবে একে রোমান সাম্রাজ্য (এ পরিভাষাটি তারা কেবল পাশ্চাত্যের শাসকদের জন্য সংরক্ষণ করে রাখতে চেয়েছিল) হিসেবে বিবেচনা করা প্রত্যাখ্যান করত। আমরা দেখি, ৮০০ সিই'র ক্রিসমাসের দিন রোমের সেন্ট পিটার্সের পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতায় পোপ তৃতীয় লিও যখন শক্তিশালী নতুন জার্মানিক বর্বর শাসক শার্লেমেনকে ইমপেরেটর রোমানোরাম (মহান রোম সম্রাট) হিসেবে মুকুট পরিয়ে দেন, তখন আবার 'রোম কোনটা' নিয়ে চলা লড়াই নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে। এ পদবিটি আরোপ করার মাধ্যমে তিনি পদবিটি কনস্টান্টিনোপলের (যারা নামের এই যুদ্ধটিকে 'জবরদস্তিমূলকভাবে' সূচনা করেছিল) গ্রিকদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পাশ্চাত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ঘটনা যা-ই ঘটুক না কেন, ওই সময় পাশ্চাত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক হিসেবে শার্লেমেন নিজের জন্য রোম সম্রাটের শিরোপা জোর করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তবে তিনি শিরোপাটি পুনরুদ্ধার এবং তার কর্তৃত্বে দুই সাম্রাজ্যকে একত্রিত করার একটি উপায় হিসেবে কনস্টান্টিনোপলের সম্রাজ্ঞী আইরিনের সাথে রাজকীয় বিয়ে আয়োজনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি সফল হতে পারেননি। তবে জার্মান গোত্রগুলোর একটি ফেডারেশনের সামনে 'হলি রোমান সাম্রাজ্যের' বাগাড়ম্বরপূর্ণ পদবি গ্রহণ এবং কনস্টান্টিনোপল ও ইস্টার্ন সাম্রাজ্যের জন্য তা অস্বীকার করতে খুব বেশি দেরি হয়নি। পদবিটির সাথে বাড়তি 'পবিত্র' যোগ করার ঔদ্ধত্য আসলে আগুনে খাঁটি ঘি ঢেলেছিল; এটা জার্মান ফেডারেশনের একই সাথে সাম্রাজ্যের আধ্যাত্মিক শক্তিও দাবি করার বিষয়টি প্রকাশ করে দেয়, যদিও ফেডারেশনটি রোম নগরীর নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত নিতে পারেনি। (আর তা-ই ইউরোপিয়ান ইংরেজি স্কুলের ছাত্রদের জন্য কিংবদন্তি রচনা প্রশ্নটির উৎপত্তি হয় : 'রোম সাম্রাজ্য না ছিল পবিত্র, না ছিল রোমান, এমনকি সাম্রাজ্যও ছিল না। আলোচনা করো।')

এর মাধ্যমে নামের এই যুদ্ধ কর্তৃত্ব, বৈধতা এমনকি আধ্যাত্মিকতা প্রশ্নে প্রবল, চলমান ভূ-রাজনৈতিক সংগ্রামের মাল-মসলা বহন করতে থাকে। পদবি এঁটে রোমে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকা পোপ বিশ্বাস করতে থাকেন, তিনি খ্রিষ্টধর্মের প্রধান, এমনকি যদিও শুরুতে চতুর্থ শতকে তিনি সমান মর্যাদাসম্পন্ন পাঁচ বিশপের একজন মাত্র ছিলেন। প্রতিটি শতক অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবধান বাড়তে থাকে। কনস্টান্টিনোপলে, 'গ্রিকত্ব'-এর ধারণাটি ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে 'জাতীয়' পরিচিতি গঠনের অংশ ছিল।

আবেগ জমে বদ্ধসংস্কারে পরিণত হয়; পবিত্র ভূমিতে মুসলিম ও পৌত্তলিকদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ক্রমাগত শক্তি হারিয়ে কোনো মতে নিজেকে রক্ষায় নিয়োজিত কনস্টান্টিনোপলকে বর্বরদের প্রাধান্যবিশিষ্ট পাশ্চাত্য সময়ের পরিক্রমায় মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া, জীর্ণ এবং কলুষিত প্রাচ্য ঐতিহ্যের প্রতীক ভাবতে থাকে। উত্তর আফ্রিকা, ইস্টার্ন মেডিটেরিনিয়ান (পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা), বলকান, ফার্টাইল ক্রিসেন্ট [পারস্য উপসাগর থেকে বর্তমানকালের দক্ষিণ ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ইসরাইল ও উত্তর মিসর নিয়ে গঠিত নতুন চাঁদের মতো দেখতে এলাকা] জুড়ে শক্তি বিস্তারের প্রেক্ষাপটে হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে কনস্টান্টিনোপলের নজিরবিহীন রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক সাফল্য সত্ত্বেও এই বাতিলীকরণ মনোভাব বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু কনস্টান্টিনোপলের শক্তি চিরদিন টিকে থাকতে পারেনি। ১৪৫৩ সাল নাগাদ 'গ্রিক সাম্রাজ্যের' শেষ অংশটি নিয়তির লিখনের মতো করে মুসলিম তুর্কিদের হাতে পড়ে।

স্বল্পস্থায়ী রোমান সাম্রাজ্যের (যা মাত্র পঞ্চম শতকে সৃষ্টি হয়েছিল) বিপরীতে ইস্টার্ন রোমান সাম্রাজ্য আরো হাজার বছর দারুণভাবে পরিচালিত হয়ে ১৫ শ' শতক পর্যন্ত টিকে থাকে। আর সাম্রাজ্যটির পতন ঘটলেও ইস্টার্ন চার্চ নিজে কিন্তু তখনো বিলুপ্তির ধারেকাছেও যায়নি। ইস্টার্ন অর্থোডক্স খ্রিষ্টান চার্চ বর্তমানে ক্যাথলিক ধর্মের পর খ্রিষ্ট দুনিয়ায় দ্বিতীয় বৃহত্তম একক খ্রিষ্টীয় ধর্ম সম্প্রদায়।

জাতীয় চার্চের জন্ম

বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের সাফল্য বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা হয়তো ছবিটির বিশাল একটি অংশ মিস করব, যদি আশপাশের এলাকায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত অর্থোডক্স চার্চগুলোর বিপুল সাংস্কৃতিক প্রভাবের দিকে না তাকাই।

ইস্টার্ন সাম্রাজ্যের একক বৃহত্তম একটি অবদান এবং এই বইয়ের অন্যতম থিম হলো পূর্ব ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে এর জাতীয় চার্চ সৃষ্টি, যা বর্তমান কালে সুনির্দিষ্ট ভাষা ও জাতিগোষ্ঠীর কাছে সাংস্কৃতিক ও আবেগগতভাবে সম্পর্কিত হয়ে রয়েছে। চার্চের এই ঐতিহাসিক জাতীয়করণের পরিণাম এই ১৯৯০-এর দশকেও যুগোস্লাভিয়ার ভাঙন-পরবর্তী রক্তাক্ত ইতিহাসে আমাদের তাড়া করছে, যেখানে ইস্টার্ন অর্থোডক্স সার্বরা নেমেছে রোমান ক্যাথলিক ক্রোটদের বিরুদ্ধে।

নাম ও ধর্মতাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াও প্রাচ্যের 'গ্রিক'রা ভূখণ্ডগত প্রভাব নিয়ে, বিশেষ করে বলকান এবং মধ্যপ্রাচ্যের অংশবিশেষে, রোমের সাথে আরো বেশি মৌলিক সংগ্রামে ব্যয় করেছিল। ইতিহাসের অন্যতম ভাগ্যনির্ধারণী সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্তে ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চ পৌত্তলিকদের ধর্মান্তরিত করতে সবদিকে মিশনারি পাঠায় এবং বায়জান্টাইন ভূখণ্ড এবং এর বাইরের এলাকাজুড়ে ভাষাভিত্তিক নতুন নতুন চার্চ (বুলগেরিয়ান, সার্বিয়ান, রুশ, মেসিডিনোয়ান, কপ্টিক, আলবেনিয়ান, আর্মেনিয়ান, রোমানিয়ান ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠা করে। এই জাতিগত, বা 'জাতীয়' ইস্টার্ন চার্চগুলো খ্রিস্টান সাহিত্যে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করতে থাকে, সব স্থানে কঠোরভাবে ল্যাতিনে পাঠ্য ও শাস্ত্রাচারভিত্তিক অতিপ্রাকৃত ও 'মহাবৈশ্বিক' ক্যাথোলিক ঐতিহ্যের বিপরীতে দারুণভাবে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে অবস্থান নেয়। আর এসব 'জাতীয়' অর্থোডক্স চার্চের প্রায় প্রতিটিই পরবর্তীকালের বর্ণাঢ্য সহাবস্থানে ইসলামের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিল। অন্যদিকে ওয়েস্টার্ন চার্চ খুব বিরলভাবে ইসলামের সান্নিধ্যে, স্পেন ছাড়া, এসেছিল।

অর্থোডক্স চার্চের আসলে চার্চের ভিত্তি হিসেবে গোত্রীয় বিষয়টির ওপর আলোকপাত করার কোনো ইচ্ছা ছিল না; বরং স্বাভাবিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় তা হয়েছে। ধর্ম ও গোত্রীয় সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি

ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে পৌত্তলিক জনপদগুলোতে বায়জান্টাইন মিশনারিগুলো ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে স্লাভিক দুনিয়ায় তাদের কাছে ধর্ম প্রচারের জন্য স্থানীয় ভাষায় বাইবেল প্রচার ও অনুবাদের উদ্যোগ নেয়ায়। বলকানে সাইরিল ও মেথডিয়াস মিশনের মাধ্যমে নবম শতকে স্লাভদের ধর্মান্তর শুরু হয়। সেখানে তারা স্ল্যাভিক ভাষায় প্রথম বর্ণমালা সৃষ্টি করে।

মিশনারিকার্যক্রম কেবল ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এর তাৎপর্য ছিল আরো অনেক বেশি : পৌত্তলিকরা যাতে ওয়েস্টার্ন ক্যাথোলিক ধর্মের খপ্পরে না পড়ে ইস্টার্ন খ্রিস্টানে ধর্মান্তরিত হয়, সে জন্য রোমের সাথে ইস্টার্ন চার্চের প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ছিল এটা। সাম্রাজ্যের সীমান্তগুলোতে বিশেষ করে স্ল্যাভিক অর্থোডক্স বিশ্বের ধর্মীয় ভাষা, যেটাকে এখন ওল্ড চার্চ স্ল্যাভোনিক বলা হয়, লোকজনের মাতৃভাষায় বাইবেলের অনুবাদ তাদের ধর্মান্তরের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়; এটা তাদের জীবন্ত ভাষায় বাইবেলকে উপস্থাপন করে, তাদের সাংস্কৃতিক আনুগত্য নিশ্চিত করে, বিশেষ করে যেহেতু অনূদিত বাইবেল প্রায়ই তাদের ভাষার এযাবৎকালের প্রথম লিখিত দলিল হয়। এর জবাবে ওই অঞ্চলের জার্মান ক্যাথলিক পাদ্রিরা কোনো স্ল্যাভিক ভাষায় ধর্মীয় সাহিত্য গ্রহণ থেকে স্লাভদের বিরত রাখার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। (বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, একই সময় পাশ্চাত্যে তখনো বাইবেল সরকারিভাবে মাতৃভাষায় পুরোপুরি অনূদিত হয়নি, ৫০০ বছর পর প্রোটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশনের আগে পর্যন্ত সেটা হয়নি। বস্তুত ১২ শতক পর্যন্ত ক্যাথলিক চার্চ একমাত্র ধর্মীয় ভাষা হিসেবে ল্যাতিনকে বহাল রাখার ব্যাপারে অটল থাকে, যদিও নিউ টেস্টামেন্ট একেবারে শুরুতে লেখা হয়েছিল গ্রিকে।)

ইস্টার্ন খ্রিস্টধর্মের দ্বিতীয় আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তুলনামূলক বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন যা রোমের কাছে কঠোর আনুগত্য (এমনকি ক্যাথোলিক ধর্মের আওতায় চার্চের ক্যাথলিক বিষয়াদিসহ) শর্তের বিরোধিতা করে ইস্টার্ন চার্চ মঞ্জুর করেছিল। অধিকন্তু, পোপ এমনভাবে বিপুল সেকুলার ক্ষমতা ঔদ্ধত্যসহকারে নিজের কাছে রাখতে অটল ছিলেন, যা বায়জান্টাইন প্যাট্রিয়াকের ছিল না। ইউরোপিয়ান মধ্যযুগের ইতিহাস পোপ ও জাগতিক রাজপুরুষদের মধ্যে এ ধরনের বিপুল ক্ষমতার সংগ্রামে ভরপুর। বস্তুত, এটা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়, পাশ্চাত্যের সেকুলার রাজনীতিতে রোমান ক্যাথলিক চার্চের গভীরতর ধর্মীয় হস্তক্ষেপের ঐতিহ্য ইসলাম এবং এর পূর্বাপর সেক্যুলার (ধর্ম-সংশ্লিষ্ট নয়) শাসকদের (আধুনিক ইরান প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত) কখনোই ছিল না।

পূর্ব ইউরোপে পূর্ব-পশ্চিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা অব্যাহত থাকায় সার্ব, বুলগেরিয়ান, রোমানিয়ান, রুশ এবং আলবেনিয়ান জনগোষ্ঠীর দক্ষিণাংশ শেষ পর্যন্ত অর্থোডক্সিতে ধর্মান্তরিত হয়। কিন্তু রোম জয়ী হয় পোল, চেক, স্লোভাক, ক্রোট, স্লোভানিয়া ও হাঙ্গেরিয়ানদের ধর্মান্তরিত করতে, তারা ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করে। ধর্ম পছন্দের এই সহজ বিষয়টিই এসব দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের জন্য অন্য কোনো দিকে না তাকানোর অবস্থানে ঠেলে দিয়েছিল, যে পরিস্থিতি এখনো চলছে। ল্যাতিন-

অর্থোডক্সের একটি তীক্ষ্ণ বিভেদরেখা বাল্টিক সাগর থেকে নেমে পুরনো যুগোস্লাভিয়া থেকে অ্যাজিয়ান পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

ফলে তেমনটি করার কোনো পরিষ্কারভাবে বর্ণিত ইচ্ছা না থাকলেও কনস্টানটিনোপল অর্থোডক্স ঐতিহ্যে (বিশেষ করে সম্ভাব্য সমন্বয়ে) গোষ্ঠীর সাথে ধর্মকে গুলিয়ে দেয়। বস্তুত, অর্থোডক্স চার্চগুলোর সমৃদ্ধির উৎস নিহিত ছিল তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে, এমনকি অভিন্ন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও শাস্ত্রাচারে একটি বৃহত্তর, শক্তিশালী, অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের অংশে থেকেও। এর সম্পূর্ণ বিপরীতে ইসলাম কোনো ধরনের 'গোষ্ঠীগত' ইসলামি আন্দোলন সৃষ্টি বা প্রার্থনার ভাষা হিসেবে আরবির বদলে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করে। কিন্তু আবার ইসলাম কখনো রোমের মতো নিয়ন্ত্রণের কঠোর কেন্দ্রীয় কোনো মডেলও গ্রহণ করেনি। রোমের ছিলেন পোপ, ইসলামের ছিলেন খলিফা। তবে পোপের মতো খলিফা কখনো দূর নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় ক্ষমতাপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন না।

পূর্ব-পশ্চিম সঙঘাত গভীর হলো

১৪৫৩ সালে কনস্টানটিনোপলের পতনের আগে পর্যন্ত পরবর্তী কয়েক শ' বছর পর্যন্ত খ্রিষ্টান বায়জান্টাইন ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার সঙ্ঘাত আরো গভীর হয়েছিল। ওয়েস্টার্ন চার্চের সব ব্যাপারেই পোপের বৃহত্তর অধিকারমূলক কর্তৃত্বের দাবি দেখে ইস্টার্ন চার্চ সার্বক্ষণিক দুশ্চিন্তায় থাকে। প্রাচ্যেও পোপের অধিকার ক্ষেত্র একইভাবে গৃহীত হবে বলে পোপের ধরে নেয়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। কনস্টানটিনোপলের কাছে পোপ ছিলেন স্রেফ 'রোমের প্যাট্রিয়াক'-এর মতো কেউ এবং পুরো খ্রিষ্টান চার্চের ওপর পোপের সর্বজনীন কর্তৃত্বের বৈধতা স্বীকার করেনি, সেটা করার কোনো সুযোগ ভবিষ্যতেও দেয়নি।

প্রাধান্য বিস্তারের সংগ্রাম তাই তুলনামূলক ছোটখাটো ধর্মীয় ইস্যুগুলোকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তপ্ত প্রতীকে রূপান্তরিত করেছে। বায়জান্টাইন সম্রাট তৃতীয় লিও ৭১৭ সালে বহুল আলোচিত মূর্তিভঙ্গ বিতর্কে চার্চে ধর্মীয় মূর্তি বা ছবি ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। এই সময় ইস্টার্ন চার্চ ধর্মীয় শিল্পকলায় সব ধরনের মানবীয় চিত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় (খুব সম্ভবত এ ব্যাপারে ইহুদি ও ইসলামের একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করার জন্য)। রোমের পোপ আসলে এই ইস্যুতে তৃতীয় লিওকে উৎখাত করার চেষ্টা চালান, তবে ব্যর্থ হন। পরে তিনি ইস্টার্ন প্যাট্রিয়াককে সমাজচ্যুত করেন। এর পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ইস্টার্ন চার্চ সমাজচ্যুত করে পোপকে। এই মারাত্মক ভাঙন জোড়া লাগানোর চেষ্টা চলে, কিন্তু এটা ছিল পারস্পরিক বিদ্বেষের দৃশ্যমান অংশ মাত্র, আরো খারাপ পরিস্থিতি সামনে আসছিল।

দশম শতকে শক্তিশালী নতুন বুলগেরিয়ান রাষ্ট্রটিকে কে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করবে, তা নিয়ে ভয়াবহ ভূ-রাজনৈতিক সংগ্রাম সংগঠিত হয়; অর্থোডক্সি প্রচার করার জন্য কনস্টানটিনোপলের বিজয় ছিল রোমের প্রতি এক তিক্ত আঘাত।

দীর্ঘ দিন ধরে চলা ধর্মতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিতর্ক খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাসে সর্বোচ্চপর্যায়ে উপনীত হয় ১০৫৪ সালে : রোম ও কনস্টানটিনোপল পারস্পরিক সমাজচ্যুত করার অবিশ্বাস্য কাজে মেতে ওঠে, খ্রিষ্টান চার্চে 'মহা বিভেদের' সূচনা করে। কথিত কারণটি ছিল অবিশ্বাস্য রহস্যময় বিতর্ক :

কনস্টানটিনোপলের বলা ‘পবিত্র আত্মা সরাসরি পিতার কাছ থেকে এসেছে’ নাকি রোমের বক্তব্য অনুযায়ী পবিত্র আত্মা ‘পিতা ও পুত্র উভয়ের কাছ থেকে একসাথে এসেছে?’ সুস্পষ্টভাবেই বলা যায়, একটা বিমূর্ত ধর্মতাত্ত্বিক ইস্যু কয়েক শ’ বছরের প্রবল ভূ-রাজনৈতিক বৈরিতা ও সংগ্রামের বাহন হয়ে প্রায় একটি ‘স্নায়ু যুদ্ধ’ সৃষ্টি করেছিল। এই বিভক্তি এখনো দূর হয়নি। অর্থোডক্স চার্চ মেরির ‘পূত পবিত্র ধারণা’র ‘নতুন’ রোমান দৃষ্টিভঙ্গি এবং রোমের পবিত্রকরণের অস্তিত্ব ‘আবিষ্কারকে’ (যিশুর কয়েক শ’ বছর পর রোম এই মতবাদ গ্রহণ করেছিল) প্রত্যাখ্যান করে।

অবশ্য পূর্ব-পশ্চিমের পারস্পরিক সমাজচ্যুতকরণের এই বিস্ময়কর ঘটনা ক্রুসেড আমলে (৫ম অধ্যায়ে আলোচিত) খ্রিষ্টান দুই পক্ষের মধ্যকার তিক্ত সন্দেহ এবং চূড়ান্তভাবে সশস্ত্র সঙ্ঘাতের কাছাকাছিও নয়। ওই সময় ইউরোপ থেকে আসা ল্যাতিন (ক্যাথলিক) ক্রুসেডাররা অপরিমেয় স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টিকারী ঘটনায় কনস্টানটিনোপল লুণ্ঠন করে, যা প্রবল আবেগময় ‘কনস্টানটিনোপলের ম্যাসাকার্স অব দ্য ল্যাতিনস’ নামে পরিচিত হয়। ঘটনাটি ঘটে ১১৮২ সালে। সাধারণ মানুষের মধ্যে পাশ্চাত্যবিরোধী ভাবাবেগ গভীর হয়ে পড়ে, তারা কনস্টানটিনোপলের অর্থনীতিতে রক্তপ্রবাহকারী ভেনেশীয় (ক্যাথলিক) বণিকদের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পরিণামে সৃষ্ট দাঙ্গায় নগরীর ৮০ হাজার ‘ল্যাতিন’ গণহত্যার শিকার হয়। আর এতে করে রোম ও কনস্টান্টিনোপলের মধ্যে আবেগ, রক্তপাত ও ঘৃণা আরেক দফা বেড়ে যায়।

উসমানিয়া তুর্কিদের কনস্টানটিনোপল জয়ের প্রায় ৬০০ বছর পর আজও অর্থোডক্স বিশ্ব তার মুকুটের রত্নটি হারানোর দুঃখের কথা স্মরণ করে, শোক প্রকাশ করে, এটা যে কত তীব্র তা ইউরোপ সহজে বুঝতে পারে না। ইউরোপিয়ানরা যদিও ইসলামের কাছে নগরীটির পতনকে খ্রিষ্টান ধর্মের জন্য একটি বড় ধরনের বিপর্যয় হিসেবে দেখে, কিন্তু ইস্টার্ন সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী উদ্ধারে ক্রুসেড পরিচালনার গরজ এবং নস্টালজিয়া বা আসক্তি অনুভব করে সামান্যই। ওয়েস্টার্ন খ্রিষ্টানদের বেশির ভাগের কাছে কনস্টানিটনোপল এবং এর ঐতিহ্য কলুষিত অর্থোডক্সের গুরুত্বহীন বিষয় এবং মনোযোগ পাওয়ার মতো কোনো ঐতিহাসিক বিষয় নয় বলে বিবেচিত হয়। বিষাক্ত ঐতিহ্যটি প্রাচ্যে কখনো ভুলে যায়নি এবং রাশিয়াকে তা প্রবলভাবে প্রভাবিত করে, যা আমরা পরের অধ্যায়ে দেখব। আর প্রাচ্যের খ্রিষ্টান ধর্ম সম্পর্কে বর্তমান পাশ্চাত্যের কার সত্যিকারের ধারণা ও সচেতনতা রয়েছে?

তবে তুর্কিদের কাছে ইস্টার্ন সাম্রাজের পতন কোনোভাবেই অর্থোডক্স খ্রিষ্টধর্মের বিলুপ্তকারী ঘটনা ছিল না; বস্তুত প্যাট্রিয়াক নিজে মুসলিম ইস্তাম্বুলে (এমনকি আজও) থেকে যান। তিনি সেখান থেকে তুর্কি অনুমোদন নিয়ে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড চালাতে থাকেন, অবশ্য সেক্যুলার কোনো বিষয় নিয়ে নয়, কেবল অর্থোডক্স বিশ্বের অংশে। এমনকি পতনেও বায়জান্টাইনরা রোমের বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ লালন করতে

থাকে, যাতে মনে হয়, খ্রিষ্টান ল্যাতিনদের হাতে পরাজয়ের চেয়ে মুসলিম তুর্কিদের হাতে পরাজয়টি অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল। কারণ তারা জানত, মুসলমানদের অধীনে চার্চ টিকে যাবে, তারা কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। কারণ মুসলিম শক্তির কাছে অনেক আগে পতন হওয়া পবিত্র ভূমিসহ খ্রিষ্টান এলাকাগুলোর প্রমাণ তাদের হাতে ছিল; ওইসব এলাকায় অর্থোডক্স তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। আর রোম যদি কনস্টানটিনোপল জয় করত, তবে চার্চের ল্যাতিনকরণ হতো (যা তাদের কাছে বিভীষিকার মতো) এবং অর্থোডক্সির চিরতরে অবসান ঘটত, যা হতো আরো খারাপ পরিণতি। ফলে মুসলিম বা ল্যাতিন খ্রিষ্টানদের কোনো একটির আধিপত্য বাছাই করার ক্ষেত্রে বেশির ভাগ অর্থোডক্স বিশ্বাসীর কাছে কোনো চিন্তা করার মতো বিষয় ছিল না।

আয়না ও প্রতিধ্বনি

আমরা পূর্ব ও পশ্চিম খ্রিষ্টান বিশ্বের মধ্যকার বিপুল মাত্রার উত্তেজনা, বৈরিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংশয় ছড়িয়ে পড়া প্রত্যক্ষ করেছি। এমনকি বারবার ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কের ছদ্মবেশ ধারণ করলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সঙ্ঘাতে জড়িত ছিল ধর্মান্তরের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার জাগতিক ইস্যু এবং ভূখণ্ডগত ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি প্রশ্নে লড়াই। পরিশেষে বলা যায়, এটি বেশ স্পষ্ট, রাষ্ট্র ধর্ম ও ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কগুলো রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং এমনকি মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন পূরণের চূড়ান্ত হাতিয়ার হিসেবে কাজ করত।

স্কলার ভ্যাসিলিয়স ম্যাকরিডেস উল্লেখ করেছেন, 'স্পষ্ট ধর্মীয় চরিত্রের মনে হওয়া গণ-আন্দোলনগুলোর প্রায়ই ভিন্ন কোনো গোপন বৈশিষ্ট্য থাকত। অন্য কথায় সেগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিকের পাশাপাশি পাশ্চাত্যকরণের নীতি ও প্রভাবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রতিফলিত করত।... পাশ্চাত্যবাদ-বিরোধিতা হয়তো কোনো ধরনের চরম জাতীয়তাবাদের আকার ধারণ করত, যা ধর্মেরও প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করত। ' আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য-নেতৃত্বাধীন বিশ্বায়নের মতো ইস্যুগুলো নিয়েও পুরনো অর্থোডক্স বিশ্বে একই ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি করে পাশ্চাত্য শক্তির কাছে প্রাচ্যের পরাজয় বরণ করার আগেকার ভূ-রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রতিফলন ঘটায়।

এসব থিম বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব এবং পশ্চিমের মধ্যকার বিভেদের বিষয়টিও সমানভাবে নির্দেশ করে। পূর্ব-পশ্চিমের এই গভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উত্তেজনার গতিশীলতা এমনকি খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যেও বিরাজমান, এটি মুসলিম বিশ্ব ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার উত্তেজনাতেও একই ভিত্তির প্রতিফলন ঘটায়। ধর্মের চেয়ে পরিচিতি ও ক্ষমতাই থাকে অনেক বেশি ঝুঁকিতে; আর মূল পরিচিতির ইস্যুগুলো সাম্প্রদায়িক পার্থক্যকে জোরদার করে। ম্যাকরিডেসের মন্তব্য অনুযায়ী, অনেক অর্থোডক্স এখনো পুরোপুরি বিশ্বাস করে যে, অন্য লোকজনের চেয়ে তারাই শ্রেষ্ঠ এবং দুনিয়ায় তাদের মুক্তির [ত্রাণ] পথই সেরা। একইভাবে বলা যায়, অনেক মুসলমানও বিশ্বাস করে, ইসলামই এক দিন নৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণহীন ও টলটলে পাশ্চাত্যের জন্য মুক্তির দায়িত্বটি পালন করতে পারে।

বর্তমানে উন্নত ও শক্তিশালী পাশ্চাত্য এবং দুর্বলতর, পশ্চাৎপদ প্রাচ্যের মধ্যে ব্যবধান বাড়ায় দুর্বলতর পক্ষ স্বাভাবিকভাবেই ব্যাখ্যা খুঁজে বেড়াচ্ছে। অর্থোডক্স ও মুসলিম বিশ্বের সব ব্যর্থতার জন্য পাশ্চাত্যকে দায়ী করার প্রবণতাও রয়েছে। ম্যাকরিডেস আরো বলেছেন, অনেক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যবাদ-বিরোধিতা অর্থোডক্স বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার তৈরি জবাব এবং নির্গমনপথের ব্যবস্থা করার সহজ উপায় বলে গণ্য হচ্ছে।... ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব ও অপরাধ অনুভূতি সব সময় শয়তানের (এখানে পাশ্চাত্য) বাহ্যিক প্রধান উৎসের মাধ্যমে দূর করার এই কৌশল অর্থোডক্স প্রাচ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি সামাজিক অসন্তোষ ও অস্থিরতা ভিন্ন খাতে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা।

ম্যাকরিডেস সবশেষে উল্লেখ করেছেন, আধুনিক গ্রিস ও রাশিয়াসহ অর্থোডক্স বিশ্বের অন্যান্য স্থানে পাশ্চাত্যবিরোধী রাজনৈতিক গ্রুপিং প্রধানত কট্টর পাশ্চাত্যবিরোধী এজেন্ডায় এমনকি তুরস্কের সাথে এক ধরনের কনফেডারেশন করতে চায়। আমরা দেখব কিভাবে মুসলিমপন্থী ও তুর্কিপন্থী অনুভূতি, সেগুলো মূল ধারার চিন্তাধারার অংশ না-ও হয়, বর্তমান সময়ের রাশিয়াতেও অস্তিত্বশীল, এসব ঐতিহাসিক মানসিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করছে।

আমরা এখানেও একটি প্রক্রিয়ার প্রাথমিক শিকড় দেখব, যাতে পাশ্চাত্য প্রশ্নে অনেক ব্যাপারে ইসলাম ও ইস্টার্ন অর্থোডক্সি চূড়ান্তভাবে অভিন্ন অবস্থানে পৌঁছে যায়। বস্তুত মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম যদি কখনো আবির্ভূত না-ও হতো এবং ইস্টার্ন অর্থোডক্সি এখনো সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকত, তবুও এটি কতটা কষ্ট কল্পিত বিষয় যে, অর্থোডক্সি আজো মধ্যপ্রাচ্যে নিজে নিজেই পাশ্চাত্য-বিরোধিতার মশালটি বহন করত?

অধ্যায় চার

পূর্ব খ্রিষ্টধর্মের সাথে মিলল ইসলাম

সপ্তম শতকের মধ্যভাগে ইসলামের নতুন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ধারণায় উদ্দীপ্ত আরব সেনাবাহিনী ক্ষিপ্র গতিতে আরব ছাড়িয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। আমরা এখানে পুরনো ও নতুনের একটি ক্লাসিক মোকাবেলা দেখতে পাই। বায়জান্টাইন প্রদেশ সিরিয়ায় খ্রিষ্টান ও ইসলামের মধ্যে প্রথম সামরিক মোকাবেলা হয়েছিল। লেভ্যান্টের বায়জান্টাইন ভূখণ্ডে আরব সেনাবাহিনী বিপুল পরাক্রমে এগিয়ে যাওয়ার সময় আবির্ভূত বেশ কিছু বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। প্রথম হলো বৈরিতার অনেকটাই প্রধানত 'সেমিটিক ফারটাইল ক্রিসেন্টের' তাদেরকে শাসন করার পাশ্চাত্য প্রয়াস সম্পর্কে সচেতনতা এবং এসব অঞ্চলে 'পাশ্চাত্য' বলতে কেবল রোমই নয়, বরং সেই সাথে গ্রিক কনস্টান্টিনোপলও বোঝাত। আমরা এমন সব এলাকার কথা বলছি, যেগুলোর ইতিহাস ও সংস্কৃতি অনিবার্যভাবে প্রাচীয় ও সেমিটিক। এগুলো ছিল পারস্য সাম্রাজ্য ও গ্রিসের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকা যুদ্ধভূমির অংশবিশেষ। এখানে পরাজিত হওয়াটা গ্রিক বা বায়জান্টিয়ামের জন্য তেমন কোনো অনুরাগ ছিল না। এ কারণে আমরা দৃশ্যপটে ইসলাম আগমনের আগে থেকেই গভীরে প্রোথিত পাশ্চাত্যবাদবিরোধিতা তথা গ্রিস বা রোমের আগ্রাসন ও নিয়ন্ত্রণের প্রতিরোধ দেখতে পাই।

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখি ধর্ম কিভাবে বারবার রোম বা বায়জান্টাইনের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ আন্দোলনে স্লোগানের ব্যবস্থা করেছিল। এসব নগরী নিয়মিতভাবে তাদের বিরোধিতা প্রকাশ করার ইঙ্গিত হিসেবে 'ধর্মভ্রষ্টতা' গ্রহণ করত। ব্যাপারটা এমন সহজ সোজা নয় যে তারা মনোফাইসিট বলেই কনস্টান্টিনোপলের বিরোধী ছিল। একটা কারণ হলো, তারা কনস্টান্টিনোপলের বিরোধী ছিল বলে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি বৈরী ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করার দিকে ঝুঁকত। বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের এসব বড় বড় লেভ্যান্টাইন নগরীর মধ্যে থাকা দীর্ঘস্থায়ী বায়জান্টাইন-বিরোধী অনুভূতি মুসলিম জয় সহজতর করে দিয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম বাহিনীর এসব বিজয় এক অর্থে ধর্মীয় বিশ্বকে বদলে দিয়েছিল বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এতে করে তখন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তনটাই অনেক বেশি হয়েছিল বলে মনে হয়।

আরব প্রশাসনের সত্যিকারের কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ এসব সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে ধর্মের অতি সামান্য স্থানে থাকাটা মুগ্ধতা সৃষ্টিকারী অন্তর্দৃষ্টি দেয়। এসব বিশ্লেষণে এই ধারণাই পাওয়া যায়, ইসলাম ছিল প্রধানত সর্বশেষ ব্যানার, যার অধীনে মধ্যপ্রাচ্যের পুরনো ভূরাজনৈতিক সংগ্রাম চিরস্থায়ী হয়েছিল; আর এর মহামূল্যবান পুরস্কারটি হলো শাসন করার ফলটি উপভোগ করা।

মধ্যপ্রাচীয় নগরী, প্রদেশ ও শাসকদের মধ্যকার সংগ্রামের গতিবিজ্ঞান থেকে ইসলামের ভূমিকা পুরোপুরি বাদ দেয়াটা নিঃসন্দেহে বোকামি হবে। সর্বোপরি দৃশ্যপটে নতুন উদ্দীপনা প্রবলভাবে প্রতিনিধিত্ব করেছিল ইসলাম। তবে বাস্তবে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল কনস্টানটিনোপলের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বিবাদপ্রবণ স্থানীয় শাসক ও নগরীগুলোকে ক্ষমতা দিতে সক্ষম নতুন গতিপ্রবাহ সৃষ্টিকারী বাহিনীর জন্য তৈরি হয়েই ছিল। যে মতাদর্শই অস্তিত্বশীল থাকে, সেটা প্রায় অপরিবর্তনীয়ভাবে স্থানীয় ভূ-রাজনীতির পক্ষে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, বায়জান্টাইনবিরোধী উদ্দীপনা অনেক সেমিটিক অঞ্চলে ইসলামি বিজয় সহজ করে দেয়ার বিষয়টি আমরা দেখতে পাই।

সিরিয়া এবং ভিন্নমতের সংস্কৃতি

সিরিয়া এ ব্যাপারে একটি দুর্দান্ত উদাহরণ। কারণ অঞ্চলটি ছিল নানামুখী গুপ্ত ভিন্নমতের আশ্রয়কেন্দ্র, যা শতকের পর শতক ধরে নিয়মিতভাবে বিস্ফোরিত হতো। মুসলিম সেনাবাহিনীর আক্রমণ কেবল কনস্টানটিনোপলের বিরুদ্ধে নয়, রোমের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ধূমায়িত করার সর্বশেষ স্ফুলিঙ্গ মাত্র। প্রাথমিক ইসলামি বিজয়ের বিরুদ্ধে এসব ভূখণ্ড রক্ষার সময় বায়জান্টাইন সাম্রাজ্য যে সীমাহীন সমস্যায় পড়েছিল সেগুলোর ব্যাখ্যায় সিরিয়ার দীর্ঘ দিনের বিদ্রোহপ্রবণ চরিত্রটি (এর ভূ-রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কারণটি নিহিত) বিশাল স্থান অধিকার করে থাকবে।

কোন পরিস্থিতির কারণে সিরিয়া এই বিদ্রোহপ্রবণ ভূমিকায় ছিল? সিরিয়া সংস্কৃতির ওই সব মহা সংযোগস্থলের একটি, যেখানে ইতিহাসের মতাদর্শ ও ক্ষমতা নিয়মিতভাবে মিশে দামাস্কাসকে মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতিকে ফুটিয়ে তোলার প্রাণবন্ত ভূমিকা অর্পণ করেছিল। স্বর্ণযুগে 'সিরিয়া' নিশ্চিতভাবেই বর্তমানের সিরিয়া, জর্ডান, ফিলিস্তিন, লেবানন, ইসরাইল ও পশ্চিম ইরাক নিয়ে গঠিত ছিল। ইতিহাসজুড়ে দেশটি নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ শক্তি ধারণ করেছে, যা তার মধ্যে স্বতন্ত্র ও বিবদমান বৈশিষ্ট্যের ছাপ এঁকে দিয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩১২ সাল থেকে দেশটি ছিল বিশাল হেলেনিস্টিক সেলেসিড সাম্রাজ্যের (আলেক্সান্ডার দি গ্রেটের সাম্রাজ্যের অংশবিশেষের উত্তরসূরি। ওই সাম্রাজ্য ২৫০ বছরেরও বেশি সময় আনাতোলিয়া থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল) কেন্দ্র ছিল। এটা যেমন পাশ্চাত্যের ছিল, ঠিক একইভাবে বিশেষ করে পারস্যের স্পর্শ এবং সংস্কৃতিতে অনেকাংশেই ছিল প্রাচ্যের। এই অঞ্চলের অন্যান্য শক্তিশালী সিমেটিক ও পারসি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দেশটা ছিল গ্রিকের প্রাচ্যমুখী প্রজেকশনের নড়বড়ে উপনিবেশকেন্দ্র।

উত্তর সিরিয়ার এডেসা নগরী পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী স্থানীয় স্বাতন্ত্র্যতার বিশেষ নাটকীয় উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ইস্টার্ন রোমান সাম্রাজ্যের জন্য এডেসায় একটি গ্রিক সামরিক গ্যারিসন ছিল। কিন্তু এর শাসকদের প্রাধান্যপূর্ণ গ্রিক ভাষা ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত হতে থাকে সিরিয়াকের (আরামাইকের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত একটি সিমেটিক ভাষা) কাছে এবং সিরিয়াক সংস্কৃতি হেলেনিক উপনিবেশকেন্দ্রটিকে ম্লান করে দিতে থাকে। ইস্টার্ন রোমান সাম্রাজ্যে এর অন্তর্ভুক্তি সত্ত্বেও এডেসার টান প্রায়ই প্রাচ্যে, বায়জান্টাইনদের সাথে না হয়ে হতো পার্থিয়ান বা জরথ্রীয় ইরানের সাথে।

আবার এডেসা খ্রিষ্টবিরোধী বলেই বায়জান্টাইনবিরোধী, এমন কথাও আমরা বলতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল বিশ্বের প্রথম খ্রিষ্টান রাষ্ট্র, আবগার রাজবংশ (আরব বা নাবাতীয় গোত্র) খ্রিষ্টপূর্ব ১৩২ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিল এটি। এডেসার খ্রিষ্টান মিশনারিরাই নেস্টোরিয়ান খ্রিষ্টধর্মের বাণী প্রাচ্যের মেসোপটেমিয়া ও পারস্যে নিয়ে গিয়েছিল। ওইসব অঞ্চলে পরে নেস্টোরিয়ান চার্চ একটি শক্তিশালী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। অর্থাৎ এই অঞ্চলটি ছিল প্রাচীনতম খ্রিষ্টান সমাজগুলোর অন্যতম, তবে সিরিয়াক-ভাষী নেস্টোরিয়ান চার্চ সাংস্কৃতিক দিক থেকে সুস্পষ্টভাবেই প্রাচ্যভাবাপন্ন, সাম্রাজ্যের গ্রিকভাষী অংশগুলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল এর অবস্থান। ৪১০ খৃষ্টাব্দে নেস্টোরিয়ান চার্চ পদক্ষেপ গ্রহণ করে : পাশ্চাত্য বিশপদের শাখা হিসেবে থাকতে কিংবা অধীন থাকতে সে অস্বীকার করে। আর 'পাশ্চাত্য বিশপরা' নিজেদের রোমের নয় বায়জান্টাইন কর্তৃপক্ষের লোক হিসেবে উল্লেখ করত। তবে নেস্টোরিয়ানরা তাদের পুরোপুরি পাশ্চাত্যের শক্তি মনে করত। ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের দিকে এই নেস্টোরিয়ান পদক্ষেপটি ছিল নির্ভুলভাবে একটি রাজনৈতিক ঘোষণা, এমনকি যদিও তা ধর্মতাত্ত্বিক পরিভাষার আশ্রয় নিয়েও থাকে।

একটি ধর্মভ্রষ্ট বিশ্বাস গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত না থেকে এডেসা পরে একই সমান 'ধর্মভ্রষ্ট' এবং অতিমাত্রায় একেশ্বরবাদী খ্রিষ্টান মনোফাইসিট বিশ্বাসের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। কনস্টানটিনোপলের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও পরের শতকগুলোতে যিশুর পৃথক ও আলাদা প্রকৃতিসম্পন্ন এই মতবাদটি সিরিয়াজুড়ে দ্রুত বেগে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মীয় মতবাদ হয়ে পড়ে রাজনৈতিক আনুগত্যের সহজ পরীক্ষা তথা লিটমাস টেস্ট। সিরীয় খ্রিষ্টধর্মের কঠোর ধর্মভ্রষ্ট বৈশিষ্ট্যটি তার নিজের দৃঢ় স্বাধীনচেতা চরিত্র প্রতিফলন ঘটায়। জার্মান স্কলার আর্থার ভুবাস বিষয়টা বলেছেন এভাবে : 'সিরীয় খ্রিষ্টধর্মের এখনো টিকে থাকা প্রাচীনতম উৎসগুলো স্বাধীনতার জন্য আত্মসচেতনতার শক্তিশালী চেতনার কথা প্রকাশ করে। এই ইচ্ছা ঐতিহাসিক নথিপত্রের প্রতিটি পাতায় মুদ্রিত রয়েছে।' প্রাথমিক কালের জনৈক সিরীয় খ্রিষ্টান নেতার লেখালেখিতে আমরা দেখতে পাই, 'গ্রিক বা রোমান ছাপ দেয়া সব কিছুই ঘৃণ্য।... স্বায়ত্তশাসন হলো চার্চের সিরীয় ধারণার হলমার্ক।' এসব ঘটনা ঘটেছিল ইসলামের আগে; ইসলাম পরে খুব সহজেই অনেক 'ফারটাইল ক্রিসেন্ট' আঞ্চলিক ও পাশ্চাত্যবিরোধী (এমনকি বায়জান্টাইনবিরোধীও) সংস্কৃতির অনেকটাই আত্মস্থ করে নিয়েছিল।

আর এমনটা কেবল এডেসাই ছিল না। সিরিয়ার আরেকটি প্রখ্যাত নগরী পালমিরায় কী ঘটেছে, তা দেখুন। পূর্ব-পশ্চিম বিভক্তির আগে তৃতীয় খ্রিষ্টাব্দের মধ্যভাগে নগরীটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহে রোমান সাম্রাজ্যকে তার পায়ে এনে ফেলেছিল। পালমিরা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার পুরো শক্তি কাঠামোটাই পুনর্গঠনের হুমকি দিয়েছিল। সিরিয়ার প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে এটা দীর্ঘ দিন ধরেই পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন ও রোমের মধ্যকার বাণিজ্যের সংযোগস্থলে ছিল। এই নগরীটিও তার ভাষা হিসেবে সিরিয়াককে গ্রহণ করে এডেসার শক্তিশালী সিমেটিক সংস্কৃতির প্রতিফলন করেছিল, রোম বা গ্রিসের সমান মাত্রাতেই পারস্য সংস্কৃতিতে সমানভাবে প্রভাবিত ছিল। ২৬৯ সালে এর কিংবদন্তিপ্রতিম রানি

জেনোবিয়া রোমান শাসনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সামরিক অভিযান চালিয়েছিলেন। আর এই জেনোবিয়া কে? বলা হয়ে থাকে, তিনি ছিলেন কার্থেজের (বর্তমানের তিউনিসিয়া) এক অভিজাত বংশের সন্তান। এই কার্থেজও তার ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রোমের প্রতি ঐতিহাসিক বিদ্বেষ লালন করার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কয়েক শ' বছর আগে কার্থেজকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল রোম।

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে পালমিরা বাহিনী বিশাল এলাকা তথা পুরো সিরিয়া, মিসর ও আনাতোলিয়ার অর্ধেক দখল করে। বস্তুত 'এই পালমিরা সাম্রাজ্য' কয়েক বছর পর্যন্ত তিনটি ভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের পুরোটা নিয়েই গঠিত ছিল। প্রাচ্যে রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করেছিল পালমিরা। এই উদ্যোগটি সফল হলে বায়জান্টাইন গ্রিকের বদলে ইস্টার্ন মেডিটেরিরানের (পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা) সিরিয়াক-সিমেটিক খ্রিষ্টান শাসন স্থায়ী করতে পারত। সুন্দরী রানী জেনোবিয়াকে শেষ পর্যন্ত রোমান বাহিনী পরাজিত করে, কিংবদন্তি অনুযায়ী সোনার শেকলে বেঁধে, রোমে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তবে সবশেষে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। তিনি রোমান সমাজের শীর্ষ বহিরাগত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন, এমনকি তার সাম্রাজ্য অনেক আগে বিধ্বস্ত হওয়ার পরও। তবে রোমের বিরুদ্ধে এবং সেই সাথে কনস্টানটিনোপলের বিরুদ্ধে সিরিয়ার বিরাট অংশজুড়ে বিদ্রোহের চেতনাটি প্রবলভাবেই বিরাজ করতে থাকে। বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের ভেতরকার এই বিতর্কের কৌশলগত সুযোগটি পারস্য সাম্রাজ্য গ্রহণ করে প্রকাশ্যে নেস্টোরিয়ান খ্রিষ্টানদের প্রতি সমর্থন দিয়েছিল, তাদের পারস্যে আশ্রয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। ওই সময় ধর্ম ছিল আদর্শ, সজ্ঘাতে জড়িত ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থগুলোর প্রতি সমর্থনদানে কাজ করত।

ফলে রোম ও গ্রিসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, আদর্শগত ও ধর্মতাত্ত্বিক মতবিরোধ যিশু সম্পর্কে আরো বেশি একেশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গির (একক প্রকৃতিবিশিষ্ট, সেটা পুরোপুরি ঐশ্বরিক কিংবা পুরোপুরি মানবীয়। সেই সাথে কনস্টানটিনোপলের জটিল ত্রিত্ব তথা একের মধ্যে তিন মতবাদটি প্রত্যাখ্যান করা) প্রতি সিরীয় ধর্মীয় সংস্কৃতির পূর্ব-অনুরাগ মূর্ত করেছিল। সহজ হিসেবে আবির্ভূত মনোফাইসিট মতবাদটি খুব দ্রুত আনাতোলিয়া, সিরিয়া, লেভ্যান্ট ও মিসরের বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ওইসব এলাকায় ধর্মটি বিপুল জনসমর্থন পায় এবং অবশ্যই এখন পর্যন্ত তা টিকে রয়েছে।

পরবর্তী সময়ে মনোফাইসিট ধর্মভ্রষ্টতার নাটকও কম প্রাণবন্ত ছিল না। এর কেন্দ্র ছিল মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়া। এই নগরীটিও ছিল পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার চার্চের ক্ষমতা চর্চার অন্যতম প্রতিযোগী। আলেক্সান্দ্রিয়াও খ্রিষ্টের 'এক ঈশ্বর প্রকৃতির' প্রতি পূর্বানুরাগ পোষণ করত। এই সাদামাটা, স্পষ্টাস্পষ্টি ও সহজবোধ্য মতবাদটি সিরিয়া, মিসর ও আনাতোলিয়াজুড়ে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল। কনস্টানটিনোপল ৪৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ইফেশাস কাউন্সিলের মতবাদ ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু চার্চ রাজনীতি ও ব্যক্তিত্ব

অদ্ভুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে, মাত্র ১৮ বছর পর ইফেশাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কাউন্সিলে রাজনৈতিক কারণে একেবারে বিপরীত ধর্মতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত নিয়ে মনোফাইসিট মতবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়। মতবাদে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সাথে সাথে চার্চের প্রধান ব্যক্তিত্বদের উত্থান-পতন ঘটত, লড়াই তীব্র করে দিত। চার বছর পর উদ্ভূত রাজনৈতিক গোলযোগের মধ্যে ৪৫১ খ্রিষ্টাব্দে শ্যালসেডন কাউন্সিলে চার্চ আবারো তার মতবাদ পরিবর্তন করে। এবার আবার মনোফাইসিট মতবাদকে ধর্মভ্রষ্ট ঘোষণা করা হয়। নতুন জয়ী ও পরাজিতের আবির্ভাব ঘটে; প্রধান প্রধান বিশপ ও চার্চ নেতা অফিস থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় হয়ে যান, তারা যেসব নগরীভিত্তিক ছিলেন, সেখানকার ক্ষমতা ও প্রভাবে সেটা অনুভূত হয়। এবার উভয় পক্ষের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্মতাত্ত্বিক নতুন বিন্যাসে কৌশলপূর্ণ প্রয়াস ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনোফাইসিটরা বিপুলসংখ্যায় কনস্টানটিনোপলের রায় মেনে নিতে সরাসরি অস্বীকার করে। পরিশেষে, তারা কনস্টানটিনোপলের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে প্রধানত সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন স্বাধীন চার্চ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। এগুলো পরিচিত হয় ওরিয়েন্টাল অর্থোডক্স হিসেবে।

কাউন্সিলের সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো বিষয় মনোফাইসিট মতবাদেও ঘটে। শ্যালসেডন কাউন্সিল রোমের প্রতি আরেকটি ভয়াবহ সিদ্ধান্তসূচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে : এখানে ঘোষণা করা হয়, কনস্টানটিনোপল হবে প্রাচীন মূল রোমের সমকক্ষ 'নতুন রোম'। বস্তুত এটা পরিণত হয়েছিল 'একমাত্র রোমে।' কারণ পাশ্চাত্যে বর্বর আক্রমণের মুখে ভেঙে গিয়ে রোমান সাম্রাজ্য অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে পরিণত হয়ে পড়েছিল। 'নতুন রোমের' ধারণাটি কখনো তার শক্তিশালী অনুরণন হারায়নি : এক হাজার বছর পর খোদ বায়জান্টাইন (ইস্টার্ন রোমান) সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে গর্বভরে মস্কো নিজেকে 'তৃতীয় রোম ' শিরোপার দাবি করায় এ ধারণাই দেয়, খ্রিষ্টান কর্তৃত্বের অব্যাহত ঐতিহ্য আরো সম্প্রসারিত হয়েছে।

এসব শক্তিশালী ব্যক্তিত্বে- নিজস্ব ক্ষেত্র ও স্বার্থ-সংবলিত পোপ, প্রাচ্যের রোমান সম্রাট এবং কয়েকজন বিশপ এবং প্যাট্রিয়াক-এই সূক্ষ্ম ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কে ধর্মতত্ত্বের চেয়ে আরো অনেক বড় কিছু হারানোর বিপদে থাকতেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যিশুর প্রকৃতি নিয়ে মতাদর্শগত লড়াইয়ের মধ্যে পোপের মূল ক্ষমতার দাবিরও মূল ভিত্তি নিহিত ছিল। যিশু যদি পুরোপুরি ঐশ্বরিক প্রকৃতির হয়ে থাকেন, তবে পোপ কিভাবে ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেকে 'খ্রিষ্টের আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি' দাবি করতে পারেন? ঐশ্বরিকতার নিজস্ব কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে না- অন্য দিকে খ্রিষ্ট একই সাথে মানবীয় প্রকৃতির হলে মানুষ খ্রিষ্টের আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি হিসেবে পিটার থেকে যথাযথভাবে চার্চ ফাদার এবং পোপ পর্যন্ত উত্তরসূরি চলে আসতে পারে।

আমরা কার্যত তিনটি মাত্রায় সক্রিয় একটি প্রবল ক্ষমতার সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করছি : প্রথমত, রোম ও কনস্টানটিনোপল প্রশ্নে প্রকৃত রোমান সাম্রাজ্য কোনটি এবং কে এর নেতৃত্ব দেবেন; দ্বিতীয়ত, ইস্টার্ন

সাম্রাজ্যের ভেতরে মতবাদ নিয়ে ইস্টার্ন চার্চের মধ্যকার লড়াই; এবং সবশেষে প্রাচ্যের ধর্মভ্রষ্ট ও বিদ্রোহপ্রবণ খ্রিষ্টান বাহিনীগুলোর লড়াই, যা পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে কনস্টানটিনোপলের রাজনৈতিক পরোয়ানার পুরোপুরি বিরোধী ছিল। এমন দৃশ্যপটের মধ্যেই নানা ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পূর্বানুরাগের সব কিছু নিয়েই মারাত্মকভাবে ছিন্নভিন্ন রাজনৈতিক অঞ্চলটিতে ইসলাম তার আবির্ভাব ঘটিয়েছিল। ইতোমধ্যেই ক্ষমতা ও মতাদর্শের এই জটিল হয়ে পড়া সমীকরণে ইসলাম কেবল যুক্ত এবং উত্তরাধিকারী হয়েছিল।

বায়জান্টাইন ভূখণ্ডে ইসলামের প্রবেশ

ইসলামের সত্যিকারের সম্প্রসারণ আসলে ধর্মান্তর ও সভ্যতাগত পরিবর্তনের জটিল প্রক্রিয়া নিয়ে অনেক কিছু বলে। এটা আমাদের ধর্মীয় সমন্বয়সাধন ও সহাবস্থানের প্রকৃতি সম্পর্কেও কিছু বলে; এখানে, স্যামুয়েল হান্টিংটনের সহজ 'ইসলামের রক্তাক্ত সীমান্ত' পরিভাষাটি সংঘটিত জটিল রাজনৈতিক ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ক্যারিক্যাচারের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি।

বায়জান্টাইন শক্তির বিরুদ্ধে এডেসা ও পালমিরায় বিদ্রোহের আগেকার গাথার পর দামাস্কাস ছিল এর পরই। এখানেও আমরা এর মধ্যেই দেখছি ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মীয় গ্র"পগুলোর মতানৈক্যই নগরীর মুসলিম বিজয়ে সবচেয়ে বড় প্রভাব রেখেছিল। এটাই ছিল আরব মুসলিম সেনাবাহিনীর হাতে আসা প্রথম বড় কোনো নগরী।

নগরীটি আসলে পারসিকদের হাতে পড়েছিল এর প্রায় ২০ বছর আগে। তাতে বায়জান্টাইন বৈষম্য ও করারোপে ক্ষুব্ধ ইহুদি ও মনোফাইসিট খ্রিষ্টানরা সহায়তা করেছিল। বায়জান্টাইনরা আবার দখল করেছিল, তবে সেটার আবারো পতন ঘটে, এবারের বিজয়ী মুসলিম আরবরা। আরব বিজয়ও সহজ করে দিয়েছিল নগরীর ভেতরে থাকা নেস্টোরিয়ান ও মনোফাইসিট খ্রিষ্টানদের বিক্ষুব্ধ উপাদানগুলোর সমর্থন। সর্বোপরি, যিশু সম্পর্কে ইসলামের একক, কঠোর মানবীয় প্রকৃতির সুপরিচিত ধারণা ইতোমধ্যে যিশুর প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক ও ধর্মভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর কাছে বলতে গেলে কোনো ধরনের বিস্ময়ই ছিল না। তাদের কাছে ইসলাম ছিল প্রতিযোগী অনেক যুক্তির মাত্র আরো একটি বৈচিত্র্যতা। ইসলাম সম্পর্কে যা প্রয়োজন, তা এর ধর্মতত্ব নয়, বরং এর রাজনৈতিক শক্তি এবং তার আরোপ করা শাসনের ধরন ও বৈশিষ্ট্য।

অনেক বিতর্কের পর অবরোধের দায়িত্বে থাকা আরব কমান্ডাররা বুঝতে পারলেন যে, তাদের অগ্রাভিযানে অন্যান্য সিরীয় নগরীর কাছ থেকে প্রবল প্রতিরোধ এড়াতে চাইলে দামাস্কাসকে শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব দেয়াটা হবে কৌশলগতভাবে বুদ্ধিমানের কাজ। ফলে আরব ও বায়জান্টাইন

বাহিনীর মধ্যে দীর্ঘ মোকাবেলার পর অবশেষে ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে নগরীটি আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলো যখন মুসলিম কমান্ডার খালিদ বিন ওয়ালিদ প্রতিশ্র“তি দিলেন যে, মুসলিমরা প্রবেশ করার সময় তারা (জনগণ) নিজেদের সম্পত্তি, মন্দির ও নগরীর প্রাচীরগুলোর নিরাপত্তা পাবে, এগুলোর কোনো কিছুই ধ্বংস করা হবে না। তারা এই নিশ্চয়তা পেল আল্লাহ, আল্লাহর নবী, খলিফা এবং মুসলমানদের কাছ থেকে। তারা যতক্ষণ জিজিয়া (পোল ট্যাক্স) দেয়া অব্যাহত রাখবে, ততক্ষণ মুসলমানরা তাদের ভালো ছাড়া খারাপ করবে না।

এরপর ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আরব বাহিনীর হাতে যায় জেরুসালেম। খলিফা নিজে ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়তা দেবার শর্তে নগরীটি আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়। খলিফা উমর তখন সাদা উটে চড়ে নগরীর প্যাট্রিয়াককে সাথে নিয়ে নগরীতে প্রবেশ করেন। প্যাট্রিয়াককে নগরীর নিরাপত্তা এবং প্রার্থনা করার খ্রিষ্টানদের অধিকারের ব্যাপারে খলিফা লিখিত নিশ্চয়তা দেন। আরব সূত্রগুলো জানায়, উমর পরিত্যক্ত ইহুদি টেম্পল মাউন্ট পরিষ্কারে সহায়তা করেন, সেখানে নামাজ পড়েন এবং পরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন।

ধর্মান্তরকরণ ও ধর্মান্তরকরণ-প্রক্রিয়া

সিরিয়া এবং এর আশপাশের সাবেক বায়জান্টাইন অঞ্চলে ইসলামে ধর্মান্তরকরণ-প্রক্রিয়া রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির একটি বড় বিষয় সক্রিয় থাকার বিষয়টি প্রকাশ করছে। আমরা ওপরে যা লক্ষ করেছি তার আলোকে বলা যায়, প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে 'পাশ্চাত্যবিরোধী মুসলিম বাহিনীর কাছে অনুগত খ্রিষ্টানদের পতন' বলে অতি সরল পরিভাষায় বেশ জনপ্রিয় পাশ্চাত্যের সংস্করণটি বিবেচনা করা অজ্ঞতারই শামিল। এসব সিমেটিক অঞ্চলের খ্রিষ্টানরা বায়জান্টিয়ানের প্রতি বিশেষভাবে অনুগত বা খুশি ছিল না, তাদের মধ্যে ইতোমধ্যে পাশ্চাত্যবিরোধী মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছিল। বাস্তবতার সামনে 'ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য- এই খাড়াখাড়ি বিভাজনের সরল তত্বটি এখানে পুরোপুরি ধসে পড়ে। বস্তুত, ওই পর্যায়ে পাশ্চাত্য বা বায়জান্টাইন সামরিক শক্তির সাথে ইসলামের প্রত্যক্ষ মোকবেলা হয়েছিল অতি সামান্যই। ফলে ওই সময় পাশ্চাত্যবিরোধী কোনো প্রাক-ধারণার অস্তিত্বই ছিল না, যেমনটি বায়জান্টাইন সাম্রাজের অনেক স্তরে বিরাজমান ছিল। সিরিয়ার আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী মুসলমানদের হাতে পড়লে সাম্রাজ্যের সীমান্ত পেছনে ঠেলতে থাকে এবং অঞ্চলটিতে ইসলামে ধর্মান্তরের দীর্ঘ প্রক্রিয়া শুরু হতে থাকে।

অধিকন্তু, মুসলিম বিজয়ের পাশ্চাত্যের জনপ্রিয় কাহিনীতে প্রায়ই তরবারির মুখে ইসলামে ধর্মান্তরের ছবি আঁকা থাকে। এসব প্রক্রিয়ার বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন; রাজনৈতিক পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে গেলে বেশির ভাগ ধর্মীয় সংস্কৃতিতে প্রায় একইভাবে ধর্মান্তর-প্রক্রিয়া ঘটে। প্রথমত, একেবারে প্রথম দশকগুলোতে, সামরিক বিজয়ের সাথে সাথেই মুসলিম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নবীজীর ইন্তেকালের ৩০ বছরের মধ্যেই মুসলিম আরব সেনাবাহিনী প্রবল বেগে পশ্চিমে আজকের তিউনিসিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল, উত্তর দিকে ককেশাস সীমান্ত এবং আনাতোলিয়ার অর্ধেক এবং পূর্ব দিকে বর্তমানের পাকিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। পুরনো সরকারগুলোর পতন ঘটে, তাদের স্থলাভিষিক্ত হন নতুন মুসলিম শাসকরা। কিন্তু ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে সত্যিকারের ইসলামে ধর্মান্তর ঘটে অনেক দেরিতে। ইসলামবিষয়ক ইতিহাসবিদ ইরা ল্যাপিডাস তার মুসলিম সমাজ নিয়ে অমর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'বিজয়গুলো হয়েছিল সামরিকভাবে দুর্বল শক্তির বিরুদ্ধে দুর্দান্ত সামরিক সাফল্যে এবং প্রথম দশকগুলোতে আরব শাসন সুসংহত হওয়ার কারণ ছিল স্থানীয় জনগোষ্ঠীগুলো নতুন শাসন গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল।' মুসলিম অগ্রাভিযানের মুখে বায়জান্টাইন ও পারসি

সাম্রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরীণ বিভেদমূলক উপাদানগুলো (সিরিয়ায় মনোফাইসিট ও নেস্টোরিয়ান, ইরানে খ্রিষ্টান ও ইহুদি) একটার পর একটা নগরীর পতন ঘটিয়ে সাম্রাজ্য দু'টির পরাজয় ত্বরান্বিত করেছিল। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যযুগীয় ইসলামবিষয়ক অধ্যাপক মার্লিন সোয়াটজের মতে, বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যে ইহুদি জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগ তাদের নির্যাতনের শিকার অবস্থার কারণে অসন্তুষ্ট ছিল এবং মুসলিম সেনাবাহিনীকে স্বাগত জানায়। আর মুসলিম শাসনে ইহুদি সংস্কৃতি নতুন করে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।

অধিকন্তু, প্রত্যাশার বিপরীতে, বিজিত নাগরিকদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার প্রতি আরব বিজয়ীদের তাৎক্ষণিক কোনো লক্ষ্য একেবারেই ছিল না; তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম শক্তি ও কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ। আমরা সামাজিক পর্যায়ে সত্যিই ধর্মীয় না হয়ে সেক্যুলার পরিবর্তনের (শাসক পরিবর্তন) কথাই বেশি বলছি। ল্যাপিডাস উল্লেখ করেছেন, 'আরব বিজয়ীদের অমুসলিম লোকজনকে ধর্মান্তর করার প্রয়োজন পড়ত না, যতটুকু পড়ত অধীনস্থ করার। শুরুতে [আরব বিজয়ীরা] ধর্মান্তরের বিরোধী ছিল, কারণ নওমুসলিমরা আরবদের অর্থনৈতিক ও মর্যাদাগত সুবিধা কমিয়ে দিত।'

বস্তুত, এসব অঞ্চলের নতুন আরব প্রশাসকদের জন্য সাধারণভাবে জনগোষ্ঠীকে মুসলিম হওয়ার বিশেষ সুবিধাটি সম্প্রসারণ না করা বেশ লাভজনক বিবেচিত হতো। আরব বাহিনী বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ পেত, যা বিজিত জনগোষ্ঠী পেত না, অন্য দিকে সেনাবাহিনীতে যোগ না দেয়া এবং সুরক্ষা পাওয়ার বিনিময়ে তাদেরকে জিজিয়া (কর) দিতে হতো। সংখ্যালঘুদের মুসলিম রাজনৈতিক শাসন স্বীকার করার প্রয়োজন পড়ত এবং মুসলমানদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরের যেকোনো প্রয়াস থেকে বিরত থাকতে হতো। আরনল্ড টয়েনবি তার শাসন-সংক্রান্ত 'স্টাডি অব হিস্টরি'তে উল্লেখ করেছেন এভাবে : প্রথমেই আমরা ইসলাম প্রচারে শক্তি প্রয়োগ করার মাত্রা অতিরঞ্জিত করা খ্রিষ্টসমাজে জনপ্রিয় প্রবণতার লাগাম টেনে ধরতে পারি। নবীর উত্তরসূরিদের ধর্মনিষ্ঠতার চর্চা অল্পসংখ্যক কর্মসম্পাদন দক্ষতার মধ্যে সীমিত ছিল, খুব বেশি কষ্টদায়ক বাহ্যিক রীতিনীতি পালনে নয়।... রোমান ও সাসানীয় সাম্রাজ্যের বিজিত প্রদেশগুলোতে বিকল্প 'ইসলাম বা মৃত্যু' ছিল না, বরং ছিল 'ইসলাম কিংবা অতিরিক্ত কর।' এই নীতিটি ঐতিহ্যগতভাবেই এর জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত ও কুসংস্কারমুক্ততার জন্য প্রশংসিত হয়েছিল, যখন অনেক পর ইংল্যান্ডে লাওডিসিয়ান [ধর্মীয় বিষয়ে অনাগ্রহী] রানী এলিজাবেথ অনুসরণ করেছিলেন।

শুরুতে আরবরা ক্ষমতা ভাগাভাগিতে ইচ্ছুক ছিল না। নতুন মুসলিম প্রশাসন কমবেশি আগের জীবনযাত্রাই বহাল রাখত, পরিবর্তন ছিল শুধু নতুন শাসন। যেসব অঞ্চলে যুদ্ধের মাধ্যমে ঘন ঘন শীর্ষ পর্যায়ে পরিবর্তন ঘটে, সেখানকার সব মানুষের কাছে নিচের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন অনিবার্য না হওয়ার প্রক্রিয়াটি পরিচিত। বস্তুত, সত্যিকারের ধর্মান্তর ঘটেছে খুব কমই।

ল্যাপিডাস বিষয়টি বলেছেন এভাবে :

উমরের বসতি স্থাপনের দ্বিতীয় মূলনীতি ছিল, বিজিত জনগোষ্ঠীকে যতটা সম্ভব কম ঝামেলায় ফেলা। এর মানে এই যে, প্রচারিত ধারণার বিপরীতে লোকজনকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে আরব-মুসলিমদের চেষ্টা চালাত না। হজরত মুহাম্মদ সা: এই ব্যবস্থার প্রচলন ঘটিয়েছিলেন যে, কর পরিশোধ করলে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা আরবে তাদের ধর্ম বহাল রাখতে পারবে।...

বিজয়ের সময় ইসলাম বলতে বোঝাত আরবদের ধর্ম, যা ছিল বর্ণগত ঐক্য ও শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন। মিশনারি ভাবাবেগ আরবদের ছিল সামান্যই। ধর্মান্তর ঘটলে তা হতো অস্বস্তিকর বিষয়, কারণ এতে মর্যাদাগত সমস্যার সৃষ্টি করত এবং আর্থিক সুবিধার দাবির পথ সৃষ্টি করত।

এটা উল্লেখ করা দরকার, প্রাথমিক পর্যায়ের আরব বিজয়ীরা ছিলেন তখনো প্রবলভাবে গোষ্ঠীপ্রবণ এবং ইসলামকে মনে করতেন আরব ধর্ম হিসেবে, এই ব্যবস্থায় তারাই সুবিধা পাবেন বলে মনে করা হতো। এই দৃষ্টিভঙ্গি মুসার প্রত্যাদেশ (ওই ধর্মটি বিশেষভাবে ইহুদি জনগোষ্ঠীর জন্যই ছিল) সম্পর্কে আরব সচেতনতা প্রতিফলিত করে। ইসলাম এখন আরবদের জন্য মূল্যবান সুবিধা হিসেবে মনে করা হতে থাকে। কিন্তু এই বিশেষ আরব সুবিধা এবং অমুসলিমদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পরও তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের এ অবস্থাটাই এখন মারাত্মকভাবে তিক্ত হতে শুরু করে। এসব উত্তেজনাই শেষ পর্যন্ত ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রবলভাবে আরবমুখী উমাইয়া খিলাফতকে উৎখাত করার পথ করে দেয় অনেক বেশি বহুগোষ্ঠীমুখী আব্বাসীয়দের মাধ্যমে। আর ইসলামে আরবদের জন্য এই বিশেষ সুবিধাটি নিশ্চিতভাবেই নবীজী হজরত মুহাম্মদের সা: বিদায়ী ভাষণের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক :

জনমণ্ডলী! তোমাদের প্রভু একজন এবং তোমাদের পিতাও একজন। তোমরা সবাই আদম থেকে আর আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। আরবের ওপর কোনো আজমের (অনারব), আজমের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই; তেমনি সাদার ওপর কালোর বা কালোর ওপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মর্যাদার ভিত্তি হলো কেবল তাকওয়া (আল্লাহ-ভীরুতা)। তোমাদের মাঝে সে-ই সবচেয়ে মর্যাদাবান, যে সর্বাধিক মুত্তাকি।

ইসলামের ইতিহাস বিজয় ও ধর্মান্তর-প্রক্রিয়ার গোষ্ঠীগত ধারণা থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন এবং ইসলামের সার্বজনীনতার আরো বেশি আদর্শমণ্ডিত প্রক্রিয়ার দিকে যাওয়ার বিষয়টি প্রতিফলিত করে। ইসলামের মধ্যে স্বঘোষিত 'আরব শ্রেষ্ঠত্বের' সমস্যাটি দুর্বল হয়ে পড়লেও সাধারণ পর্যায়ে অনেক আরবের মধ্যে এখনো পুরোপুরি তা অদৃশ্য হয়নি। এর উদ্ভব ঘটেছে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে আরবে; আল্লাহর প্রতিটি বাণী প্রকাশিত হয়েছে আরবি ভাষায়; নবীজী ছিলেন আরব; এবং পবিত্র কুরআনে আরবির আলঙ্কারিকতা ও ভাষা এবং প্রাথমিক কালে আরবদের দুর্দান্ত বিজয়ের সূত্র ধরে। সারা বিশ্বের নানা

ভাষার ও জাতির মুসলমানদের একত্র করার প্রতিষ্ঠান হিসেবে হজের একটি প্রধান অনুষ্ঠান হলো প্রার্থনার জন্য এক স্থানে সমবেত করা। আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থার ফলে সব মুসলমানের মধ্যে ব্যাপকভাবে এই সচেতনতাও বাড়িয়েছে যে, জাতিগত পরিচয় বাদ দিয়ে ইসলামি সংস্কৃতির সামগ্রিকতায় অনারবদের বিপুল ভূমিকা রয়েছে।

তাহলে ধর্মান্তর আসলে কিভাবে হয়েছিল? সব ধর্মান্তর-প্রক্রিয়াই জটিল; এতে ব্যক্তিগত বিবেচনার পাশাপাশির ধর্মীয় বিষয়াদিও জড়িত থাকে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে ল্যাপিডাস দু'টি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুমান করেছেন। মরুভূমির সর্বপ্রাণবাদী ও বহুঈশ্বরবাদীদের ধর্মান্তরে বৃহত্তর ও বেশি সমৃদ্ধ সভ্যতার অংশে পরিণত হওয়ার আকর্ষণ ছিল। এতে যোগদানের ফলে নানামুখী উৎসাহও ছিল। এই প্রক্রিয়াটি নগর বা কৃষিজ একেশ্বরবাদী জনগোষ্ঠীর কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'ইসলাম ছিল বায়জান্টাইন বা সাসানীয়দের কাছে রাজনৈতিক পরিচয় এবং কোনো খ্রিষ্টান, ইহুদি বা জরস্ত্রীয়দের কাছে ধর্মীয় শাখার পরিবর্তন।... বায়জান্টাইন ও সাসানীয় সাম্রাজ্যের পুরনো এলিট ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নতুন সরকারে আত্মস্থ হয়ে গিয়েছিল।'

ফলে এক শতকের কম সময়ের মধ্যে বিশাল এলাকাজুড়ে নজিরবিহীন একটি রূপান্তর সংঘটিত হয়। ল্যাপিডাস বিষয়টা এভাবে বলেছেন :

আরবরা গোত্র বা উপজাতীয় জনগোষ্ঠী থেকে 'নগর' জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হলো, অনাবর জনসাধারণের সাথে মিলে গেল, সামরিক কার্যক্রম ত্যাগ করে বেসামরিক পেশা গ্রহণ করল এবং ইসলাম প্রশ্নে তাদের একচেটিয়া সুবিধাভোগ হারিয়ে ফেলল। একইভাবে অনারব লোকজন সামরিক ও সরকারি বিভাগে প্রবেশ করল, ইসলামে দীক্ষা নিল, আরবি ভাষা আত্মস্থ করল, তারা শুরুতে যে সাম্রাজ্যের প্রজা ছিল, সেই সরকারে স্থান দাবি করল।

অধিকন্তু বায়জান্টাইন, সাসানীয় এবং অন্যান্য শাসনে থাকা সংখ্যালঘুরা বিশ্বাস করল, মুসলিম শাসনে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে; নতুন মুসলিম খেলাফতের অধীনে সময় ও অভিজ্ঞতা তাদের ওইসব আশা মূলত নিশ্চিতই করেছিল। নিশ্চিতভাবেই বিজয়ীদের ভীতিও কিছু ধর্মান্তরে উদ্দীপ্ত করেছিল, আবার একই কথা প্রযোজ্য নতুন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ব্যক্তিগত লাভের ইচ্ছার ব্যাপারেও। দীর্ঘ দিন ধরে সংখ্যালঘু হিসেবে থাকা লোকজন সংখ্যাগুরুর ধর্মে যোগ দেয়া এবং মূলধারার সংস্কৃতির অংশে পরিণত হওয়ার মধ্যে ব্যাপকতর পৃষ্ঠপোষকতা এবং নতুন সমাজের গতিশীলতা উপভোগের বিষয় বুঝতে পারল। অনেকে এমনকি অ্যাডভেঞ্চার ও সম্পদের জন্য ইসলামি সামরিক অভিযানে যোগ দেয়ার সুযোগটি গ্রহণ করল।

তবে এই ধর্মান্তরপ্রক্রিয়াও সাধারণভাবে যেমনটা ধারণা করা হয়, তত দ্রুত ছিল না। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলার রিচার্ড বুলিটের গবেষণায় প্রথম ইসলামি শতকে অনারবদের ধর্মান্তর হার দেখাচ্ছে, প্রক্রিয়াটি কত মন্থর ছিল। উমাইয়া খিলাফত আমলে বিজিত জনসংখ্যার মাত্র ১০ ভাগ ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল, সে তুলনায় বহুজাতিক আব্বাসীয় খিলাফতে হয়েছিল ৪০ ভাগ এবং একাদশ শতকের শেষ দিকে তা হয় প্রায় ১০০ ভাগ।

সব সম্প্রদায় কিন্তু ধর্মান্তরিত হয়নি। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে নানা নামে বিপুলসংখ্যক খ্রিষ্টান সম্প্রদায় এবং সেই সাথে অনেক ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রবল অস্তিত্বই প্রমাণ করছে, 'আহলে কিতাবি জনগোষ্ঠী' ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য ছিল না, তারা খ্রিষ্টান ও ইহুদি হিসেবে প্রার্থনা অব্যাহত রাখতে পারত, জিজিয়া দিয়ে সামরিক বিভাগে যোগদান এড়াতে এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা পেতে পারত। এক হাজার বছর পর উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অধীনে বলকানে সাম্রাজ্যের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজা সত্যিই খ্রিষ্টান হিসেবে ছিল এবং তাদের জীবনের ছন্দ ও ধর্মীয় উপাসনায় তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি।

কার্যত ধর্মান্তরপ্রক্রিয়া ছিল খুবই মন্থর এবং অঞ্চলের জীবনযাত্রায় বিপুল বা আকস্মিক কোনো পরিবর্তন হয়নি, যদিও সমৃদ্ধ নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামি সংস্কৃতি ধীরে ধীরে আবির্ভূত হচ্ছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চেয়ে ধর্ম অনেক কম প্রাসঙ্গিক ছিল। ইসলাম ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার দিকে অগ্রসর হতে থাকায় আমরা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক, সামাজিক, এমনকি ভূ-রাজনৈতিক চরিত্রের চলমানতার প্রধান উপাদানগুলো প্রত্যক্ষ করি। 'ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য' বা 'ইসলাম বনাম খ্রিষ্টধর্ম'-এর মতো সরলসোজা দুই বিপরীত মেরু-সংবলিত ধ্যানধারণা পুরোপুরিই নিরর্থক।

ইসলাম রাজনৈতিক পরিবেশ বদলে দিয়েছিল, তবে পরিবেশে নিজেও বদলে গিয়েছিল। আব্বাসীয় সাম্রাজ্য স্পেন থেকে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত আরো বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ জাতিগত জনসংখ্যা, সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করা অব্যাহত রাখার প্রেক্ষাপটে সদ্য বিজিত জনসংখ্যার মধ্য থেকে প্রতিভাধরদের আকর্ষণ করতে ইসলাম অনিবার্যভাবেই আরো বেশি কসমোপলিটান দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। নেস্টোরিয়ান, সিরিয়াক ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক ও চিন্তাবিদেরা আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি গঠন করতে সহায়তা করে। নতুন মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানার ভেতরে বাসকারী নেস্টোরিয়ান প্যাট্রিয়াক আব্বাসীয় সরকারি কার্যক্রমে ব্যাপক ক্ষমতা ও প্রভাব করায়ত্ত করেন। সৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন ইসলামি সভ্যতাকে ওই সময়ের এবং পরবর্তী কয়েক শ' বছরের জন্য বিশ্বে সর্বোচ্চ মাত্রায় নিয়ে যায়।

ইসলামি সংস্কৃতি ধীরে ধীরে সীমানার মধ্যে থাকা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা, শিল্পকলা, ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা আত্মস্থ করার প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই মিশে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া সম্পন্ন

হয়ে ইসলামকে ওই এলাকায় চাপিয়ে দেয়া বহিরাগত জিনিস নয়, বরং ওই অঞ্চলের অংশে পরিণত হতে দেখি। ইসলামি সংস্কৃতির বিশ্ব সভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন অঞ্চলে এই গভীর মিশ্রিত হওয়াটাই এই ধারণা দেয়, অনেক দিক থেকেই এটা বিপুলসংখ্যক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিকতা। ইসলাম মধ্যপ্রাচ্যকে ঝা-চকচকে সম্পূর্ণ নতুন কিছুতে রূপান্তরিত করেনি, বরং অতি সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণভাবে অনেক গভীরে প্রোথিত আগের প্রতিষ্ঠিত মোজাইকের ওপরে একটি আরো সমৃদ্ধ নতুন স্তর যোগ করেছে।

অর্থাৎ অন্যান্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ইসলাম এবং ইসলামি সংস্কৃতির মিশে যাওয়ার এসব ধরণ আমাদের উপলব্ধি ও অনুধাবনের প্রমাণ দিচ্ছে যে, অঞ্চলটির শক্তিশালী ভূ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চলমানতা অব্যাহত ছিল। ইসলাম দৃশ্যপটে আবির্ভূত না হলেও এসব শক্তি একইভাবে বহাল থাকত, বিবর্তিত হতো, স্রেফ যেভাবে সেগুলোর ওপর ইসলামি সংস্কৃতির নতুন প্রলেপ দেয়ার পর করছে। একই ভূ-রাজনৈতিক শক্তি ও উত্তেজনা বহুলাংশেই স্থায়ী। যদিও এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, ইসলাম এসব অঞ্চলকে অভিন্ন সভ্যতাগত ধারায় ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে, যা বর্তমান সময় পর্যন্তও ব্যতিক্রমভাবে টেকসই, ইসলামের মধ্যকার সীমান্তগুলোর পরিবর্তন হোক বা না-হোক।

আমরা এটাও প্রত্যক্ষ করি, কিভাবে বিভিন্ন খ্রিষ্টান ধর্মভ্রষ্টতা রোম বা কনস্টানটিনোপল শক্তির বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রতিরোধের আদর্শগত বাহন হিসেবে কাজ করেছিল। এটা বিবেচনায় রাখলে ইসলামের অধীনেও স্থায়ীভাবে ধর্মভ্রষ্টতার একই সমস্যা দেখতে পাওয়াটা বিস্ময়কর মনে হবে না। উত্তর আফ্রিকাকে বিবেচনা করুন। আরব সুন্নি সেনাবাহিনী উত্তর আফ্রিকান উপকূলজুড়ে আরব শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে দ্রুতবেগে ছুটতে থাকার প্রেক্ষাপটে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাধান্যকর অবস্থায় থাকা বার্বার জনগোষ্ঠী আরব শক্তির এই বিস্তারকে মূলত গোষ্ঠীগত ও রাজনৈতিক হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেছিল। ফলে নতুন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ামাত্র বার্বাররা শিয়া বা খারেজি (ইসলামের চরমপন্থী মতবাদ) দর্শন গ্রহণ করার প্রবণতা দেখায়। এসব অ-মূলধারার ইসলামি মতাদর্শ প্রাধান্য সৃষ্টিকারী মূলধারার আরব সুন্নি শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে কাজ করেছিল। কার্যত বার্বার জাতীয়তাবাদ প্রচলিত ইসলামি ধর্মমতের বিরোধিতা করার একটি হাতিয়ার খুঁজে পেয়েছিল।

বিলম্বিত ক্ষমতা

ক্ষিপ্রগতিতে মুসলিম বিজয়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল সামরিক ও কৌশলগত দক্ষতা। আর এত বিশাল অঞ্চলজুড়ে নানা সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের এমন প্রবলভাবে বিরাজমান থাকাটাও ইতিহাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শতকের পর শতক ধরে টিকে থাকার জন্য কেবল মুসলিম সামরিক শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেই ব্যাখ্যা করার কাজ শেষ করার কোনো পথ আমাদের সামনে নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আরব শক্তি দুর্বল হওয়ার পরও সিরিয়া কেন খ্রিষ্টানধর্মে কিংবা বিশ্বাসের পূর্ববর্তী কোনো ধরনের কাছে ফিরে যায়নি? আব্বাসীয় ইসলামি সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে মঙ্গোলদের সামনে ধসে পড়ার পরও ইরান কেন প্রাচীন জরুস্ত্রীয় ধর্মে ফিরে যায়নি? ইসলাম যদি এসব বৈচিত্র্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে অস্বস্তিকর হয়ে বিরাজ করত, তবে এটা আমাদের কাছে কি অপ্রত্যাশিত নয়, ১৪ শ' বছরের বেশি সময়ের কোনো-না-কোনো পর্যায়ে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে পূর্বেকার বিশ্বাস ও সংস্কৃতিতে ফিরে যেত?

১৩০০ শতকে মঙ্গোল সেনাবাহিনী যখন প্রাচ্যের বেশির ভাগ এলাকায় ইসলামি শক্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, তখন ছাই থেকে কেমন করে ইসলামি সভ্যতা আবার উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হলো? এমনকি সর্বনিম্ন পর্যায়ে হলেও সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনৈতিক ধারা হিসেবে ইসলামের প্রতিরোধ ক্ষমতা অভিভূত করে। একেবারে শুরু থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত (ইউরোপিয়ান উপনিবেশবাদ, বিশ্বযুদ্ধ ও স্নায়ুযুদ্ধসহ) সব ধরনের ঘটনার মাধ্যমে মুসলিম সমাজগুলোর মধ্যে দৃঢ়সংলগ্নতা অব্যাহত থাকায় বহিরাগত চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে তার সভ্যতাগত একধরনের পারস্পরিক সংযুক্ততার ধারণা সৃষ্টি করে, এমনকি যদিও মুসলিম সভ্যতা আধুনিক সময়ে পাশ্চাত্য শক্তি ও প্রযুক্তির দিক থেকে অনেক পেছনে রয়েছে। ইসলাম তা-ই ইসলামি সংস্কৃতির উচ্চ মানের অভিন্ন সভ্যতায় অঞ্চলটিকে একত্র, ঐক্যবদ্ধ রেখেছে। তবে ইসলাম আবির্ভাবের আগেই গভীরভাবে শিকড় গেড়ে থাকা পাশ্চাত্য, রোম এমনকি কনস্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের মধ্যেও অব্যাহত থাকে।

ইসলামে বাণীর সরলতা দৃশ্যত ধর্মটিকে গ্রহণ করতে আসা লোকজনের সাথে কথা বলে। অসংখ্য চার্চ রাজনৈতিক-ধর্মীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে নির্ধারিত বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে জটিল (রহস্যময়ও) খ্রিষ্টীয়

ধর্মতাত্ত্বগুলোর তুলনায় ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক স্পষ্টতা ও সাবলীলতাও এর অনুকূলে কাজ করেছে। ইসলামের ধর্মীয় আবেদন এবং এর দ্রুত বিস্তারই সম্ভবত প্রথম দিকের অনেক খ্রিষ্টান শক্তির ইসলামকে ভয় পাওয়ার এবং একে দানবীয় করে প্রচার করার কারণ ছিল। সব শাসকই সরকার পরিচালনায় কঠোরতা প্রদর্শনে বেশ সক্ষম হলেও শাসনকাজের ইসলামি ফর্মুলা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিরুদ্ধবাদী ব্যবস্থাগুলোর চেয়ে অনেক ভালোভাবে কাজ করে, যা শাসনব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়িত্বেরই প্রমাণ দেয়। শুরুতে তরবারি হয়তো সক্রিয় ছিল, কিন্তু তারপর সরকার পরিচালনার ইতিবাচক দক্ষতা অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হয়। শক্তিশালী অনেক সাম্রাজ্যের পতন লক্ষ করুন।

মধ্যপ্রাচ্যে নিজের নতুন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রাধান্য নিয়ে ইসলাম ছিল অপেক্ষাকৃত পুরনো ও নতুন আইডিয়াগুলোর মিশেল; ধর্মীয় চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের সাবেক ব্যবস্থাগুলোর সাথে তুলনামূলক বেশি স্বস্তিকরভাবে খাপ খাওয়ানোর উপযুক্ত। এই যুক্তি দেয়া কঠিন যে, ইসলাম এমন ধরনের নতুন ও আগ্রাসী শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেছিল, যা হঠাৎ করেই মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিকে বদলে দিয়েছিল কিংবা পাশ্চাত্যবিরোধী উদ্দীপনার নতুন ধরনের নজির প্রতিষ্ঠা করেছিল। সনাতন সংস্কৃতি, মনোভাব ও ভূরাজনীতি ভালোভাবেই টিকে ছিল তবে এখন একটি ইসলামি স্বচ্ছ আবরণের মধ্যে। ইসলাম কখনো যদি অস্তিত্বশীল না হতো তবে কি গ্রিক ও রোমান বায়জান্টাইন সংস্কৃতির প্রতি সেমিটিক বৈরিতা অব্যাহত থাকত না?

অধ্যায় পাঁচ

ক্রুসেড (১০৯৫-১২৭২)

খ্রিষ্টান উদ্দীপনায় টগবগ করতে থাকা পাশ্চাত্য ক্রুসেডাররা ১২০০ শতকে অবিশ্বাসী মুসলমানদের কাছ থেকে পবিত্র ভূমি মুক্ত করতে পোপের অনুশাসন অনুযায়ী ব্যানার উড়িয়ে প্রাচ্যমুখী যাত্রা শুরু করল। এ ধরনের দৃশ্য পাশ্চাত্য ইতিহাসের মহান রূপকথাটির অংশ হয়ে আছে। এর পুরোটাই পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম, ঠিক তো? অনেক মৌলবাদীর (খ্রিষ্টান বা মুসলিম) কাছে সভ্যতার সঙ্ঘাত জাতীয় কোনো কিছুর সূচনার প্রতীক হলো ক্রুসেড। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, কাহিনীটি আরো জটিল আকার ধারণ করে। আমরা কি এখানে আসলেই ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার 'শাশ্বত সংঘর্ষের' আরেকটি ধাপ সভ্যতার সঙ্ঘাত নিয়ে কথা বলছি? নাকি সম্ভবত আরো জটিল কিছু ব্যাপার চলছে? এই অধ্যায়ে দেখানো হবে, পাশ্চাত্য একটি শক্তিশালী ভূরাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে তার সেনাবাহিনীকে প্রাচ্যে পাঠানোর কাজটির সাফাই গাওয়ার জন্য ধর্ম (জনপ্রিয় বর্ণনায় থাকা) আসলেই ছিল পটভূমিতে। পবিত্র ভূমিতে ইসলাম না থাকলেও কি ক্রুসেড হতো? আসুন আমরা ঘটনাগুলোর আরো গভীর কাঠামো খতিয়ে দেখি। জবাবটা বিস্ময়কর মনে হতে পারে।

এক দিক থেকে বলা যায়, ঐতিহাসিক আর কোনো ঘটনা ক্রুসেডের চেয়ে বেশি ধর্মভিত্তিক কি? ইতিহাসবিদেরা ১১০০ শতকে ইউরোপে ধর্মভক্তির সাধারণ বৃদ্ধির কথা বলেন, চার্চ সহজেই ওই সুযোগটি নিয়েছিল। উদ্যোগটি মহাপ্রলয়-সংক্রান্ত ধারণায় পর্যন্ত পরিণত হয়েছিল। অনেকেই বিশ্বাস করত, জেরুসালেমে একটি খ্রিষ্টান রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা গেলে সব সময়ের জনপ্রিয় থিম কিয়ামত নেমে আসার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। আর ধর্মপ্রচারকেরা মধ্যপ্রাচ্যে অসভ্য 'অন্য'দের সম্পর্কে জনগণকে অবগত করা শুরু করলে ইউরোপে প্রথমবারের মতো 'খ্রিষ্টরাজ্যের' অস্তিত্ব নিয়ে নতুন সচেতনতার আত্মপ্রকাশ ঘটে, যা আগে ছিল অনেক কম পরিচিত, বেশ অস্পষ্ট, ইউরোপিয়ান ইতিহাসের অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন সময়কাল।

খ্রিষ্টভূমি সম্প্রসারণের লড়াইয়ে 'চার্চের সৈন্য' হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য চার্চ জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছিল; ইতিহাসপঞ্জিগুলোতে তালিকাভুক্তির পবিত্র অনুষ্ঠানের বিবরণী প্রকাশ হয়েছিল।

তালিকাভুক্তি অনুষ্ঠানে প্রত্যেক যোদ্ধা জেরুসালেম সফর সম্পন্ন করার শপথ করতেন, চার্চের সৈন্য হিসেবে তার মর্যাদার স্বীকৃতি হিসেবে পোপের প্রতিনিধির কাছ থেকে একটা ক্রস গ্রহণ করতেন। চার্চ-বাহিনীতে কাজ করার সময় তালিকাভুক্তদের বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্ব থেকে তাদের অবমুক্তি মঞ্জুর করা হতো। অনেকের মনে অবশ্য কিয়ামত দিনের, বিশেষ করে কিভাবে পাপ স্খলন করা যাবে সে ভীতিও কাজ করত। স্রেফ এগুলোই কি ক্রুসেড যাত্রার জন্য পর্যাপ্ত ছিল? আর কেউ যাত্রা করলে ওই পর্যায় পর্যন্ত তার সব পাপই নাকি পরবর্তী সময়ে করা পাপও মাফ হয়ে যাবে? পাপমুক্তির জন্য কাউকে কি সত্যিই মৃত্যুবরণ করতে হবে? জেরুসালেম উদ্ধারের পর পাপমুক্তির এই সহজ দরজা কি আবার বন্ধ হয়ে যাবে?

ক্রুসেডে যোগদানপ্রক্রিয়ায় তাদের কাছে এগুলো ছিল উদ্বেগ সৃষ্টিকারী প্রশ্ন, সম্ভবত একই ধরনের উদাহরণ পাওয়া যায় অনেক মুসলিম মৌলবাদীর ‘শহীদি মৃত্যুর’ আলোচনার মধ্যে। যথার্থভাবে বললে বলতে হয়, শাহাদাতবরণ কঠোরভাবে বিশ্বাসকে রক্ষা বা প্রচার করতে গিয়ে মৃত্যুকে বোঝায়। কিন্তু কেউ যদি শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মঘাতী (পবিত্র কুরআনে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ করা রয়েছে) মিশন চালায়, তবে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয়া এ ধরনের মৃত্যু কি সত্যিকারের শহীদি মর্যাদা পাবে?

পোপ দ্বিতীয় আরবানের আহ্বান

ক্রুসেডের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের পক্ষে যুক্তির ক্ষেত্রে ১০৯৫ সালে ক্লেমন্ট কাউন্সিলে জনসাধারণের সামনে পোপ দ্বিতীয় আরবানের বক্তৃতাটির চেয়ে ভালো কোনো স্মৃতিজাগানিয়া বিষয় নেই। এটা হলো অবিশ্বাসী মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে খ্রিষ্টধর্মকে উসকে দেয়ার উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক পাশ্চাত্য দলিল। আরবান ঠিক কী বলেছিলেন, তার পূর্ণাঙ্গ কোনো ভাষ্য নেই, আছে কেবল উপস্থিত বিভিন্ন নেতার তাদের নিজস্ব পরস্পরবিরোধী সারসংক্ষেপ সংস্করণ। তবে আসল বিষয় ছিল বাগাড়ম্বরতা : পরবর্তীকালে খ্রিষ্টান ও মুসলিম উভয়ে চূড়ান্তভাবে যে 'সভ্যতা সংগ্রামে' আক্রান্ত হয়েছিল তার শিকড়গুলো আমরা দেখি। পোপের মন্তব্যের কিছু স্বাদ প্রকটভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের অন্যতম চারট্রেসের ফুলচারের নির্বাচিত কয়েকটি প্যারাগ্রাফ থেকে। পাশ্চাত্যে মুসলিম আক্রমণের আতঙ্ক থেকে তিনি পোপ আরবানকে উদ্ধৃত করেছেন বলে বলা হয়ে থাকে:

তোমাদের বেশির ভাগই যেমনটা শুনেছ, তুর্কি আর আরবরা [পবিত্র স্থানগুলোতে] আক্রমণ চালিয়েছে... এবং ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল থেকে হেলেসপন্ট পর্যন্ত ভূখণ্ড জয় করেছে। তারা অনেককে হত্যা, অনেককে বন্দী করেছে, চার্চগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করেছে। তোমরা যদি কিছু সময়ের জন্যও তাদের ছাড় দিতে থাকো, ঈশ্বরের নিষ্ঠাবানেরা তাদের দ্বারা আরো প্রবলভাবে আক্রান্ত হবে। এ কারণে আমি কিংবা আরো ভালো করে বললে ঈশ্বর, খ্রিষ্টের বাণী হিসেবে এটা সবখানে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করছি এবং সব মানুষকে তার মর্যাদা যা-ই হোক না কেন, পদাতিক সৈন্য বা নাইট, ধনী বা গরিব সবাইকে ওইসব খ্রিষ্টানের সাহায্যে এবং আমাদের বন্ধুদের ভূমি থেকে বজ্জাতদের ধ্বংস করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। যারা এখানে আছে, তাদেরকে আমি বলছি, যারা অনুপস্থিত আছে তাদের জন্যও এই একই কথা প্রযোজ্য। সবচেয়ে বড় কথা, খ্রিষ্ট এই নির্দেশ দিচ্ছেন।

আহ, কী লজ্জার ব্যাপার হবে, যদি এ ধরনের অসুর পূজারী ঘৃণ্য ও নীচুতম জাত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং খ্রিষ্টের নামে জয়ধ্বনি করার জন্য সৃষ্ট লোকজনের বিরুদ্ধে জয়ী হয়!

আর যারা দীর্ঘ সময় দস্যুবৃত্তি করেছে, তারা এখন নাইট হলো। যারা দীর্ঘ সময় ধরে তাদের ভাই আর স্বজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তারা এখন অসভ্যদের বিরুদ্ধে সঠিক পথে যুদ্ধ করবে।

আরবানের বক্তৃতার একটি চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হলো তাতে ‘মুসলিম’ বা ‘ইসলাম’ শব্দের দৃশ্যত অনুপস্থিতি। ‘আমাদের খ্রিষ্টান ভাইদের’ এবং পবিত্র ভূমিতে নির্যাতন পরিচালনাকারীদের ‘অসভ্য,’ ‘অবিশ্বাসী,’ ‘তুর্কি’ ও ‘আরব’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। খ্রিষ্টান কর্তৃপক্ষ এসব লোককে ঘৃণ্য হিসেবে অভিহিত করলেও মুসলিম হিসেবে স্বীকার পর্যন্ত করেনি।

শত্র“দেরকে কড়াকড়িভাবে গোষ্ঠীগত পরিভাষায় বা অবিশ্বাসী বা খ্রিষ্টান নির্যাতনকারী হিসেবে দেখা হয়েছে। অন্য যেকোনো ধর্ম নিশ্চিতভাবেই হবে অসভ্য।

ইহুদি গণহত্যা

ক্লেমন্ত কাউন্সিলে পোপ দ্বিতীয় আরবান ক্রুসেডের আহ্বান জানানোর সময় শত্র“ হিসেবে ‘অবিশ্বাসী’ পরিভাষাটি বারবার উল্লেখ করেছেন। আর এটা দিয়ে মুসলিম বা ইহুদি যেকোনোটিই ইঙ্গিত করা যেতে পারে। তত দিনে ইউরোপে সেমিটিক-বিরোধিতা বেশ সুপরিচিত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে, ইহুদিরা প্রায়ই ‘খ্রিষ্ট-ঘাতক’ বিবেচিত হতো। এর ফলে ক্রুসেডারের দল তাদের মিশনে ইউরোপ ছাড়ার আগেই জার্মানির অনেক এলাকায় ধেয়ে গেল, বিশেষ করে রাইনল্যান্ডে। সেখানে ইহুদিদের খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ কিংবা মৃত্যুর যেকোনো একটা বেছে নিতে বলা হলো। এই একটি ঘটনায় প্রায় ১২ হাজার ইহুদি নিহত হয়, বিপুলসংখ্যক ইহুদি সম্প্রদায় গণ-আত্মহত্যা করে।

পোপের আহ্বান তা-ই ধর্মীয় উদ্দেশে সহিংসতাকে ভালো কাজ হিসেবে প্রশংসিত করেছিল, সব অ-খ্রিষ্টানকে হত্যার জন্য স্বর্গে পুরস্কার প্রাপ্তির ছবি এঁকে দিয়েছিল। আরো অবাক করা বিষয় হলো, পোপ যদিও কখনোই ইস্টার্ন অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের অবিশ্বাসীদের কাতারে ফেলেননি, কিন্তু জনসাধারণ পর্যায়ে অনেক ইউরোপিয়ান খ্রিষ্টান দৃঢ়ভাবে গ্রিক খ্রিষ্টানদেরকেও অবিশ্বাসী মনে করতে থাকে, বিশেষ করে প্রথম ক্রুসেডের প্রায় এক শ’ বছর পর ১১৮২ সালে কনস্টান্টিনোপলে ‘ল্যাটিন ম্যাসাকার’ সংঘটিত হওয়ার পরে।

যা-ই হোক না কেন, পোপের প্রথম আহ্বানে প্রবল গণ-প্রতিক্রিয়ায় গুটিকতেক নাইটের মধ্যে সাড়া ফেললেও সাধারণ মানুষ পথে নামে দলে দলে। তাদের মধ্যে বিপুলসংখ্যকের যুদ্ধ করার দক্ষতার অভাব ছিল, তাদের সামনে থাকা সত্যিকারের সামরিক কাজটির ব্যাপারে অজ্ঞতা ছিল। বিপুলসংখ্যক নারী এবং অনেক শিশুও এতে যোগ দিয়েছিল। এসব দলের বেশির ভাগই ছিল প্রায় উচ্ছৃঙ্খল জনতা, পরকালের মুক্তি সম্পর্কে নিজস্ব দর্শন এবং বাড়িতে দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচার রাস্তা হিসেবে তারা এতে শামিল হয়েছিল। চলার পথে তাদের আচরণই তাদের চরিত্র প্রকাশ করে দিচ্ছিল। এই ‘গণক্রুসেড’ বলকানের খ্রিষ্টান ভূমিগুলো অতিক্রমের সময় অন্য খ্রিষ্টানদের সাথেও অল্পবিস্তর সঙ্ঘাতে মেতে ছিল। ১০৫৪ সালের রোম ও বায়জান্টিয়ামের মধ্যকার ‘মহাবিভেদের’ মাত্র অল্প সময় পর

সংঘটিত এই ক্রুসেডকালে ইস্টার্ন অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের নিম্ন মর্যাদার বলে বিবেচনা করা হতো। কনস্টান্টিনোপলের বায়জান্টাইন সম্রাট অদূরে থাকা অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছৃঙ্খল জনতার সম্ভাব্য বিপদের প্রকৃতি নিয়ে আশঙ্কায় ছিলেন। তারা নগরীর কাছাকাছি হওয়া মাত্র তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে দ্রুততার সাথে তাদেরকে নগরী অতিক্রম করে তুর্কি-নিয়ন্ত্রিত আনাতোলিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। গণবাহিনীর বেশির ভাগ সদস্যই কখনো জেরুসালেম পর্যন্ত দর্শন করতে পারেনি, রোগব্যাধি, কষ্টে মারা গিয়েছিল কিংবা আনাতোলিয়ায় তুর্কিদের হাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

আর যারা পবিত্র ভূমিতে যেতে পেরেছিল, তাদের বেশির ভাগই ছিল অজ্ঞ, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিকভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট। অনেক সময় ক্ষুধায় কষ্ট পেয়েছে। প্রাচ্যের নগরীগুলো জয়ের সময় বিপুল সহিংসতা ঘটানোর সামর্থ্য রাখত। প্রায়ই বেশির ভাগ অধিবাসীকে হত্যা করেছে, মসজিদগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছে। নগরীগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। বেশি কিছু সুস্পষ্ট প্রামাণ্য ঘটনায় দেখা যায়, তারা নরমাংস পর্যন্ত ভক্ষণ করেছে। পাশ্চাত্যের ক্রুসেডাররাই বলেছে :

মা'রায় ১০৯৮ সালের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষকারী কায়েনের রুডলফ লিখেছেন, 'মা'রায় আমাদের সৈন্যরা পৌত্তলিক লোকদের রান্না করার পাত্রে সিদ্ধ করল; তারা শিশুদের কাবাব বানানো শিকে বিদ্ধ করল, তারপর গ্রিল করে তৃপ্তিতে খেল।'

ইতিহাস লেখক এইক্সের আলবার্ট দৃশ্যত মুসলমানদের কুকুরেরও নিচে স্থান দিয়েছেন তার এই লেখনীতে : 'আমাদের সৈন্যরা কেবল তুর্কি আর স্যারাসেনদেরই ভক্ষণ করার মতো খারাপ কাজ করেনি, তারা কুকুরও খেয়েছে!'

গণক্রুসেড সত্যিকার অর্থে পাশ্চাত্য থেকে অনেক দূরের মধ্যপ্রাচ্যের সাথে ইউরোপিয়ান পাশ্চাত্যের (স্পেনকে বাদ দিলে, সেখানে ঘন ঘন সংঘটিত যুদ্ধের মধ্যে ৮০০ বছরের আরব শাসন ছিল) প্রথম বড় ধরনের সামরিক সঙ্ঘাতকে প্রতিফলিত করছে। ক্রুসেড ইউরোপিয়ান পাশ্চাত্যের মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টিকারী একটি ঐতিহাসিক বড় আক্রমণ হিসেবেও চিহ্নিত হয়ে আছে, যার প্রভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। এরপর থেকে ক্রুসেড বর্বরতার কাহিনী মুসলিম লোকমানসে দগদগ করছে।

পরবর্তী ক্রুসেডগুলোতে জেরুসালেম যাওয়ার জন্য বেশি সংখ্যায় অভিজ্ঞ নাইট সাড়া দিয়েছিল, কিন্তু একই পেশাদার সামরিক বাহিনীগুলো মুসলমানদের মতোই বায়জান্টাইনের প্রতি মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছিল : পাশ্চাত্যের এসব সৈন্য বায়জান্টাইন ভূমি থেকে যুদ্ধ করছিল, কিন্তু বায়জান্টাইন নিয়ন্ত্রণে নয়। বায়জান্টাইনের আশঙ্কা ভালোভাবেই সত্যে পরিণত হয়েছিল চতুর্থ ক্রুসেডে।

১০৯৯ সালে প্রথম ক্রুসেডের সৈন্যরা যখন শেষ পর্যন্ত জেরুসালেমে পৌঁছল, পুনঃজয়টি ছিল নৃশংস ঘটনা, প্রায় ৫০০ বছর আগে সুশৃঙ্খল আরব বাহিনীর হাতে পতনের সময় ঘটা ঘটনার চেয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটে এবার। আমরা জানি, ৬৩৭ সিইতে কয়েক মাস অবরোধের পর দ্বিতীয় খলিফা উমর ব্যক্তিগতভাবে নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন; আরব সৈন্যদের শৃঙ্খলা বহাল ছিল, নগরীতে লুন্ঠন চালানো হয়নি। অর্থাৎ আত্মসমর্পণের সময় জেরুসালেমের প্যাট্রিয়াকের সাথে করা উমরের চুক্তিটি পালন করা হয়েছিল। খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে চুক্তিটিতে বলা হয়েছিল,

তাদের চার্চগুলো দখল বা ধ্বংস করা হবে না, সেগুলোর অমর্যাদা বা আয়তন হ্রাস করা হবে না, তাদের ক্রস বা তাদের অর্থ নেয়া হবে না, তাদের ধর্ম পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হবে না, তাদের কারো কোনো ক্ষতি করা হবে না।

ইহুদি সূত্রগুলো আরো জানায়, ইহুদি টেম্পলের বিধ্বস্ত দশা দেখে উমর শোকাহত হয়েছিলেন। রোমানরা সেটিকে আবর্জনা ফেলার স্থানে পরিণত করেছিল। স্থানটি মুসলমানদের কাছেও পবিত্র হওয়ায় উমর নিজে তার সঙ্গীদের সাথে পরিচ্ছন্নতা কাজে সহায়তা করেছিলেন। প্রায় ৫০০ বছর আগে রোমানদের হাতে বহিষ্কৃত হওয়ার পর এই প্রথম ইহুদিদের নগরীটিতে ইহুদি ধর্ম অনুশীলনের অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু ১০৯৯ সালে প্রথম ক্রুসেড বাহিনীর জেরুসালেম দখল ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনী। খ্রিষ্টান শাসন আসার ভয়ে নগরী রক্ষায় মুসলমানদের সাথে ইহুদিরাও লড়াই করেছিল, কিন্তু লাভ হয়নি। দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল অবরোধের পর ১৫ জুলাই ক্রুসেডাররা নগরীতে ঢুকে পড়ে এবং ২৪ ঘন্টা ধরে চলে হত্যাপর্ব। আক্ষরিকভাবেই একেবারে প্রতিটি অধিবাসী- নারী, শিশু, পুরুষ, মুসলিম, ইহুদি এবং বেশির ভাগ ইস্টার্ন অর্থোডক্স খ্রিষ্টানকে হত্যা করা হয়। প্রায় ৬০ হাজার লোক নিহত হয়। সিনাগগে আশ্রয় নেয়া হাজার হাজার ইহুদি, আল আকসা মসজিদে থাকা আরো কয়েক হাজার মুসলমানও রক্ষা পায়নি। ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়ায় বাহুল্যবর্জিতভাবে বলেছে : ‘খ্রিষ্টানরা সব দিক থেকে জেরুসালেমে প্রবেশ করেছিল এবং বয়স ও লিঙ্গ-নির্বিশেষে প্রত্যেক অধিবাসীকে হত্যা করেছিল।’

জয়ে অংশ নেয়া ক্রুসেডার চারট্রেসের ফুলচার লিখেছেন : ‘তুমি যদি সত্যিই সেখানে থাকতে, তবে দেখতে পেতে, আমাদের পায়ের পাতা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত নিহতের রক্তে রঙিন হয়ে গেছে। আমি আর কত বর্ণনা দেব? কাউকেই জীবিত ছাড়া হয়নি; নারী বা শিশু কাউকেই রেহাই দেয়া হয়নি।’

জেরুসালেম যাওয়ার পথে মুসলিম শহর ও জনগোষ্ঠীর ওপর ক্রুসেডারদের ভয়াবহ নৃশংসতার আরো বিপুল বর্ণনা রয়েছে। অবশ্য নৃশংসতা ও হত্যাকাণ্ডের সবই একপক্ষীয় বিষয় ছিল এমনটা বিবেচনা করা হবে বোকামি। সব যুগেই যুদ্ধ মানেই পাশবিকতা। এ ধরনের কিছু নির্বাচিত বর্ণনা তুলে ধরার মানে এই নয়, ক্রুসেডাররা ছিল নরপিশাচ, আর মুসলিমরা পুরোপুরি নির্দোষ শিকার। তবে বাস্তবতা হলো ইউরোপিয়ান বাহিনী মধ্যপ্রাচ্যের কেন্দ্রভূমিতে আক্রমণ চালিয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যে কয়েক শ' বছরের পাশ্চাত্যের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের দীর্ঘ ইতিহাসের শুরু ছিল এটা। ক্রুসেডার শৌর্য-সম্পর্কিত পাশ্চাত্যের জনপ্রিয় কাহিনীগুলোতে ক্রুসেডারদের রক্তলোলুপতার বিষয়টি খুব কমই পরিচিত। অধিকন্তু ৬৩৭ সালে মুসলমানদের জেরুসালেম জয় এবং ১০৯৯ সালে খ্রিষ্টানদের জেরুসালেম জয়ের মধ্যে ধর্মীয় ও আইনগত বিষয়ে বিপুল ভিন্নতা দেখা যায়। মুসলমানদের মুসলিম সমাজে খ্রিষ্টান ও ইহুদি স্থানগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ইসলামি বিধান মেনে চলার প্রয়োজন হতো এবং মোটামুটিভাবে তা পালন করাও হতো (যদি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এমন অনেক ক্ষেত্র ছিল, যেখানে ইসলামি কঠোরতা পালন করা হতো না)। অন্য দিকে খ্রিষ্টান সমাজে বাসকারী ইহুদি ও মুসলিমদের স্থানগুলো রক্ষার খ্রিষ্টান বিধান পালন করা খ্রিষ্টানদের দরকার ছিল না এবং তারা মোটামুটিভাবে তা করতও না। আর পরিশেষে বলতে হয়, পাশ্চাত্যের প্রয়োজন ক্রুসেড কাহিনীগুলোর মুসলিম প্রতিবিম্ব-ভিশন সম্পর্কে সচেতন থাকা। এসব ঘটনার ব্যাপারে তাদের নিজস্ব বিকল্প বর্ণনা এখনো মুসলিম সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে।

দ্বিতীয় ক্রুসেড

প্রথম ক্রুসেড যদি 'গণক্রুসেড' নামে পরিচিত হয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয়টি ইউরোপিয়ান রাজরাজড়াদের অংশগ্রহণে বিশিষ্ট হয়ে আছে। প্রথম ক্রুসেডের জয়কে সম্প্রসারণ করতে চেয়েছিলেন তারা। কিন্তু সামরিক ফলাফল ছিল ভয়াবহ রকমের হতাশাজনক : পবিত্র ভূমিতে পৌঁছার আগেই সেলজুক তুর্কিরা বেশির ভাগ রাজকীয় মেহমানকে পরাজিত করেছিল। প্রথম ক্রুসেডের মতোই পাশ্চাত্য সামরিক বাহিনীর নতুন নতুন নানা গ্রুপ বায়জান্টাইন ভূখণ্ড অতিক্রম করতে থাকায় ক্রুসেডারদের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে বায়জান্টাইন আশঙ্কা বেশ বেড়ে যায়। সম্রাট আবারো বায়জান্টাইন ভূখণ্ডে পাশ্চাত্যের প্রবেশ বিলম্বিত করার সময় প্রার্থনা করেন এবং তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদেরকে বসফোরাস পার করিয়ে তুর্কি–অধিকৃত এলাকায় পাঠিয়ে দেন। এ দিকে সিসিলি থেকে আসা ক্রুসেডার বাহিনী তাদের পথে পড়া বেশ কয়েকটি গ্রিক নগরী লুণ্ঠন করে তাদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বায়জান্টাইনভীতি সত্য প্রমাণ করে।

পরিশেষে ক্রুসেডারদের প্রধান লক্ষ্য দামাস্কাস দখল করতে তারা ব্যর্থ হয় এবং দ্বিতীয় ক্রুসেডের অর্জন ছিল সামান্যই। ক্লেয়ারভক্সের বার্নাড ঘোষণা করেন, ক্রুসেডারদের পাপের কারণেই তারা ব্যর্থ হয়েছে। ক্রুসেডারদের জন্য সবচেয়ে খারাপ বিষয় ছিল, ১১৮০ সালে ওই এলাকার মুসলিম কমান্ডার সালাদিন (সালাহউদ্দিন) সেখানকার মুসলিম বাহিনীগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে ক্রুসেডারদের হাত থেকে জেরুসালেম পুনঃদখল করেন।

তৃতীয় ক্রুসেড

মুসলমানদের আবার জেরুসালেমের দখলে সৃষ্ট শোক এখন ইউরোপকে তৃতীয় ক্রুসেডে উদ্দীপ্ত করল। সালাদিনের পুনঃদখল ৬৩৭ সিইতে খলিফা ওমরের অধীনে নগরীটি মুসলমানদের প্রথম দখলের ঘটনার মতোই ছিল : এবারো মুসলমান সৈন্যদের জেরুসালেমে প্রবেশের পর খুব কম খ্রিষ্টান অধিবাসীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আর বেশির ভাগ চার্চই অস্পর্শ থেকে গিয়েছিল, যদিও ক্রুসেডারদের কাছ থেকে মুক্তিপণের অর্থ দাবি করা হয়েছিল। তৃতীয় ক্রুসেড ইংল্যান্ডের রিচার্ড দি লায়ন হার্ট (সিংহহৃদয়), ফ্রান্সের দ্বিতীয় ফিলিপ এবং আগের চেয়ে বেশি ও গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণের কারণেও বিখ্যাত হয়ে আছে। পবিত্র ভূমিতে যাওয়ার পথে রিচার্ড বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের কাছ থেকে সাইপ্রাস দখল করে নিলে বায়জান্টাইন সন্দেহ জোরদার হয়। ইউরোপিয়ান সততা এবং মানবিকতার অনুভূতি আরেক দফা সংশয়ে পড়ে আক্রা অবরোধের সময়। রিচার্ড প্রতিশ্র“তি দিয়েছিলেন, আত্মসমর্পণ করলে নগরীর সব মুসলিম নাগরিক নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু আত্মসমর্পণের পর তিনি তাদের সবাইকে হত্যা করেন। জেরুসালেম দখল করতে ব্যর্থ হওয়ার পর রিচার্ড নগরীতে চলমান খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রা অব্যাহত রাখার শর্তে সালাহউদ্দিনের সাথে সমঝোতায় পৌঁছেন।

কয়েক শ' বছর ধরে চলতে থাকা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রেষারেষি চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলো কনস্টান্টিনোপল জয়ের পর ঘটা ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞে। গ্রিকরা বুঝতে পারল, এমনকি তুর্কিরাও যদি নগরীটি দখল করত, তবুও তারা ল্যাটিন খ্রিষ্টানদের মতো এত নৃশংস হতো না। এটা ইতোমধ্যেই পতনের মুখে থাকা বায়জান্টিয়ামের পরাজয় রাজনৈতিক মর্যাদাহানি ত্বরান্বিত করল। এতে করে বায়জান্টাইনরা শেষ পর্যন্ত তুর্কিদের সহজ শিকারে পরিণত হলো। ফলে ক্রুসেড আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি ছিল ইসলামের বিজয়। অথচ এর মূল উদ্দেশ্য ছিল নিশ্চিতভাবেই ঠিক বিপরীত।

কনস্টান্টিনোপলের ওপর এই ল্যাটিন আক্রমণের বিপর্যয়কর ভবিষ্যৎ পরিণাম পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট সত্যিই পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তার দীর্ঘমেয়াদি আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে চার্চ ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, অবশ্য তার নিজের নেতৃত্বে। এ ধরনের ঐক্যের সব সম্ভাবনা প্রায়

এক হাজার বছরের জন্য শেষ করে দিয়েছিল (যা তিনি জানতে পারেননি) কনস্টান্টিনোপলের লুন্ঠন। পোপ নিজেই লিখেছিলেন :

এ ধরনের নির্যাতন চালানোর পর গ্রিকদের চার্চকে কিভাবে খ্রিষ্টের বাণী প্রচারের জন্য চার্চের ঐক্য ও আরাধনায় ফিরিয়ে আনা যায়? ল্যাতিনদের কাছে এটা সর্বনাশ ও অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই বিবেচিত হয়নি। ফলে এখন ঐক্য কুকুরের চেয়েও জঘন্য বিবেচিত হওয়ায় তারা প্রত্যাখ্যান করছে। যারা তাদের নিজের স্বার্থের বদলে ক্রিস্টের সেবা করবে বলে ধরা হয়েছিল, তাদের উচিত ছিল পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে তাদের তরবারি ব্যবহার করা, কিন্তু তারা খ্রিষ্টানদের রক্ত ঝরাচ্ছে। তারা ধর্ম, বয়স, নারী-পুরুষ কাউকে ছাড় দেয়নি, প্রকাশ্যে ব্যভিচার ও ধর্ষণ করেছে, ম্যাট্রন এবং এমনকি নানদের পর্যন্ত তাদের সৈন্যদের নোংরা বর্বরতার জন্য সমর্পণ করে দিয়েছে। সম্রাট এবং ছোট-বড় লোকদের সম্পদরাজিও তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না, তারা চার্চের কোষাগারেও তাদের হাত লাগিয়েছে... বেদি থেকে মূল্যবান রৌপ্যসামগ্রী কেড়ে নিয়েছে, সেগুলো ভেঙে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে, পবিত্রতার সীমা লঙ্ঘন করেছে, ক্রস আর স্মারকসামগ্রী সরিয়ে নিয়েছে।

ক্রুসেডাররা তারপর নগরীতে একজন ল্যাটিন পুরোহিত বসায়। জনগণ ইতোমধ্যে সম্রাট পদে ক্রুসেডারদের এক প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করে এবং 'ল্যাটিনদের' বিরুদ্ধে গণক্ষোভ টগবগ করতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক ল্যাটিন সম্রাট কনস্টান্টিনোপলের সিংহাসনে আরোহণ করেন, ১২৬১ সালে বায়জান্টাইনদের নগরীটি পুনরায় দখল করা পর্যন্ত ৫৭ বছর শাসনকাজ পরিচালনা করেন। এসব ঘটনার কোনোটাই অর্থোডক্স চার্চ ভোলেনি বা ক্ষমা করেনি। কনস্টান্টিনোপল লুন্ঠনের পর বিভিন্ন সময় পোপের ধর্মতাত্ত্বিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ইস্টার্ন চার্চ দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করে; প্রত্যাখ্যানের কঠিনতম আওয়াজ আসে জনগণের মধ্য থেকে। ঐক্যের জন্য রোমের শর্ত নিয়ে সম্ভাব্য আলোচনা করার কথাও যদি কোনো অর্থোডক্স পাদ্রি করতেন, তারা তার মর্যাদা হানি ঘটাত।

প্রায় ৮০০ বছর পর ২০০১ সালে পোপ দ্বিতীয় জন পল রোমানিয়ায় অর্থোডক্স ভূখণ্ডে প্রথম সফরকালে অর্থোডক্স চার্চের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। ২০০৪ সালে শেষ পর্যন্ত ইকুমেনিক্যাল প্যাট্রিয়াক প্রথম বার্থোলোমেউ ওই ক্ষমাপ্রার্থনা গ্রহণ করেন। প্রায় দুই হাজার বছর ধরে চলতে থাকা কাঁটাযুক্ত সম্পর্ক নিরসনে প্রথম ফলপ্রসূ পদক্ষেপ এসব কার্যক্রম। ক্রুসেডের সময় কনস্টান্টিনোপলের সাথে রোমের সঙ্ঘাত ইস্টার্ন সাম্রাজ্যের কাছে মুসলমানদের সাথে সঙ্ঘাতের মতোই ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিংবা হয়তো আরো বেশিই ছিল, কারণ এটা এসেছিল দাম্ভিক খ্রিষ্টান ভাইদের কাছ থেকে। অর্থাৎ এক অর্থে ক্রুসেড ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন চার্চের সম্পর্কের মধ্যে অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করেছিল, যা সম্ভবত মুসলিম ও পাশ্চাত্য বিশ্বের মধ্যে রোপণ করা ক্রোধকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বিশ্ব এখনো উভয়ের ক্ষত নিয়েই বাস করছে।

আরো তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ

আমরা পাশ্চাত্য, প্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ন্যূনতম মাত্রায় ধর্মীয় প্রলেপযুক্ত সঙ্ঘাতের দিকে মনোযোগ দিয়েছি। আসুন, এখন আমরা বিকল্প ব্যাখ্যা পরীক্ষা করে দেখি, যেগুলো ধর্মের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত নয়। ঐতিহাসিক বাস্তবতা এটাই বলে, আরো কিছু শক্তিশালী শক্তি সক্রিয় ছিল : বাইরের দুনিয়ায় পাশ্চাত্য শক্তির সম্প্রসারণ অভিযান এবং ইউরোপের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনার শক্তি। ক্রুসেডের পুরো উদ্যোগের জন্য ফলাও করে যে যুক্তিটি দেখানো হয়, সেই ইসলামের যদি অস্তিত্ব না থাকত, তখনো কি প্রাচ্যের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ক্রুসেড আকার ধারণ করত?

পাশ্চাত্য ক্রুসেডারদের ন্যূনতম ধর্মীয় উদ্দীপনার কোনো কোনোটিকে কেন আংশিকভাবে প্রমাণ ছাড়াই গ্রহণ করা হয়? প্রথমত, ক্রুসেডের সময়টা ছিল অদ্ভুত। যা-ই হোক, মুসলিম বাহিনীর হাতে জেরুসালেমের পতন ঘটেছিল সেই ৬৩৮ সালে। ওই ঘটনা ঘটার ৫০০ বছর অতিক্রম করে গেল ক্রুসেডের আয়োজন করতে। বিষয়টা এমনও ছিল না যে, ওইবারই প্রথম খ্রিষ্টান বিশ্ব অখ্রিষ্টানদের কাছে জেরুসালেম হারিয়েছিল। পারস্যের জরুস্ত্রীয় সাসানীয় রাজবংশ ৬১৪ সালে নগরীটি দখল করে হলি সেপালচার চার্চ পুড়িয়ে দিয়ে 'আসল ক্রস'টি নিয়ে যায়। কয়েক বছর পর ৬২৯ সালে বায়জান্টাইনরা জেরুসালেম আবার দখল করে। এর মাত্র ৯ বছর পর আবার তারা নগরীটি খোয়ায় আরব বাহিনীর কাছে। অর্থাৎ ক্রুসেডের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার আগে খ্রিষ্টানরা দুইবার পবিত্র ভূমি খুইয়েছিল।

মুসলিম শাসনকালের বেশির ভাগ সময় জেরুসালেমে খ্রিষ্টান ও ইহুদি প্রার্থনা বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই হতো, খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীরা নিয়মিত প্রবেশের সুযোগ পেত। একাদশ শতকের প্রথম দিকে মিসরে শিয়া ফাতেমি রাজবংশের আবির্ভাবের ফলে এই মহান সহাবস্থান কিছু সময়ের জন্য ভেঙে যায়। তাদের এক ধর্মান্ধ শাসক জেরুসালেমের হলি সেপালচারসহ চার্চগুলো এবং সিনাগগগুলো গুঁড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। নির্যাতনের এই নীতি পরে সংশোধিত হয়, ফাতেমিরা আর্থিক সুবিধার বিষয়টি উপলব্ধি করে চার্চগুলো আবার নির্মাণ অনুমোদন করেন, তীর্থ স্থানগুলোতে তীর্থযাত্রীদের বাধাহীন প্রবাহের ব্যবস্থা ফের চালু

করেন। এই সংক্ষিপ্ত অসহিষ্ণুতা হয়তো শত শত বছর ধরে নীরব থাকা ইস্যুটি নিয়ে পাশ্চাত্যে বিশেষ স্ফুলিঙের সৃষ্টি করেছিল।

তবে পাশ্চাত্যের নিজের নতুন শক্তিশালী বাহিনীগুলো ক্রুসেড শুরু করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। ইউরোপ কয়েক শ' বছর ধরে অব্যাহতভাবে পঙ্গুত্ব সৃষ্টিকারী হামলা, সঙ্ঘাতে জর্জরিত ছিল এবং ইউরোপজুড়ে বিচরণ করা বিভিন্ন বর্বর উপজাতির মধ্যে পুরোদস্তুর যুদ্ধবিগ্রহ চলছিল। একই সাথে দুর্ধর্ষ ম্যাজিয়ার ও ভাইকিংদের ইউরোপে প্রচণ্ড আক্রমণের কারণেও ইউরোপের সীমান্ত রক্ষার জন্য বিপুলসংখ্যক যোদ্ধাদল সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়েছিল। সময়ের পরিক্রমায় বহিরাগত হুমকি হ্রাস পেলে এসব সশস্ত্র দলের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে কমে যায়। এর পর এসব দল উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াত, নিজেদের মধ্যে লড়াই করত, গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করত, জননিরাপত্তা নস্যাৎ করত। স্থানীয় লোকজনের ওপর এদের আক্রমণ এবং নিজেদের মধ্যকার বিধ্বংসী যুদ্ধ থামাতে হিমশিম খেতে থাকা পোপের এদের আগ্রাসী ও অফুরন্ত শক্তি প্রবাহিত করার জন্য একটা পথ বের করা দরকার হয়ে পড়েছিল। এই পর্যায়ে দক্ষিণ স্পেনে দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে উত্তর স্পেনের খ্রিষ্টান নাইটদের অভিযানের মাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে 'ক্রুসেড' ঐতিহ্য বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিল। (যদিও ক্রুসেড শেষ হওয়ার অনেক পরে ১৪৯২ সালে মুসলিম ও ইহুদিদের স্পেন থেকে চূড়ান্ত বহিষ্কার পর্যন্ত চলে। বহিষ্কৃত না হলে তাদেরকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছিল)।

ক্লেমন্টে দেয়া ভাষণে পোপ তৃতীয় আরবানের বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়েছিল যে, 'যারা দীর্ঘ দিন ধরে ডাকাতি করছে, তারা এখন নাইট হলো।' আমরা এ-ও জানি, দূরবর্তী শত্র"র বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে জ্বালাময়ী ধর্মীয় বক্তৃতা বেশ ভালো রকমেই ফলপ্রসূ। 'অবিশ্বাসীর ' ধর্মীয় প্রতীকবাদ কখনো 'মুসলিম' নয় এবং তাদের কাজকর্মের জন্য ঈশ্বরের অপমান হওয়া এসব বিদেশী যুদ্ধের জন্য মুখ্য আবেগময় ও আদর্শগত ভিত্তির ব্যবস্থা করেছিল। পোপ মধ্যপ্রাচ্যের খ্রিষ্টান ভাইদের প্রতি খ্রিষ্টান সংহতি প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছিলেন। যদিও প্রায়ই ক্রুসেডারদের হাতে মুসলমানদের সাথে সাথে তারাও গণনিধনযজ্ঞের শিকার হতো।

এসব প্রধান খেলোয়াড়ের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? সেগুলো ছিল নানা প্রকৃতির ও জটিল। বায়জান্টাইনরা সপ্তম শতকে আরব মুসলিম বাহিনীর হাতে পবিত্র ভূমির নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল এবং তারপর ইসলামের কাছে আরো ভূখণ্ড হারাতে থাকে। পরের শতকগুলোতে মধ্য এশিয়া থেকে আসা সেলজুক তুর্কিরা আনাতোলিয়ার আরো গভীরে প্রবেশ করে সাম্রাজ্যকে আরেক দফা সঙ্কুচিত করতে থাকল। তুর্কি ও আরব উভয় বাহিনীর বিরুদ্ধে কনস্টান্টিনোপলের সামরিক সাহায্যের বেপরোয়া প্রয়োজন ছিল এবং তারা খ্রিষ্টরাজ্যটি রক্ষার জন্য পাশ্চাত্যের কাছে অনেকবারই সহায়তা কামনা করেছে। তবে আমরা এটাও দেখেছি, বায়জান্টাইন পুরোপুরি যৌক্তিক কারণেই কিভাবে পাশ্চাত্যের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের ব্যাপারে

সংশয় পোষণ করেছিল। পোপ এবং পাশ্চাত্যের অনেক শাসক গ্রিক বায়জান্টাইন শাসন দুর্বল হয়ে যাওয়া এবং ইস্টার্ন সাম্রাজ্যের 'ল্যাটিন' বা রোমের নিয়ন্ত্রণে ফিরে যাওয়ার আশা লালন করেছে। রোম পবিত্র ভূমিকে মুসলিম শাসন থেকে ছিনিয়ে নিতে পারলে তাতে ওই এলাকায়ই কেবল খ্রিষ্টধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতো না, সেই সাথে খোদ কনস্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে রোমের শক্তি সম্প্রসারণের দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীর হিসেবে কাজ করত। কে জানে, হয়তো এটা বিভক্ত সাম্রাজ্যের পুনঃএকত্রীকরণের পথ হয়তো খুলে দিত এবার পুরোপুরি রোমের অনুকূলে? এ কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের সাহায্য কামনা করা কি কনস্টান্টিনোপলের জন্য মুরগির ঘর পাহারা দিতে শিয়ালকে ডেকে আনার মতো হতো না?

এ ছাড়া আরো অনেক অর্থনৈতিক বিষয় ছিল। বণিক নগররাজ্য ভেনিস ও জেনোয়ার পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় সামরিক কার্যক্রম বাড়ানোতে বিরাট ফায়দা ছিল। যেকোনো পরিস্থিতিই তাদের জন্য ছিল দেয়া নেয়ার ব্যাপার : ব্যাপকভাবে নৌকা, সৈন্য ও সরঞ্জাম সরবরাহের প্রয়োজন পড়বে, আর এ দুই নগরী যুদ্ধরত পক্ষগুলোর মধ্যে আগ্রহী ও অভিজ্ঞ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ছিল তুলনাহীনভাবে যোগ্য।

প্রথম ক্রুসেডের সাথে অতিরিক্ত ভূ-রাজনৈতিক নির্দেশনার উদ্ভব ঘটে। ইউরোপে নতুন সামাজিক স্থিতিশীলতা নতুন ইউরোপিয়ান যোদ্ধা অভিজাততন্ত্র তৈরি করে। তারাই 'প্রিন্সদের ক্রুসেডের' মেরুদণ্ড সৃষ্টি করে। লেভ্যান্টে পৌঁছার পর এসব প্রিন্সের কয়েকজন এশিয়া মাইনর থেকে মিসর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের মুসলিম ভূমিতে নিজেদের নামে চারটি আলাদা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তথাকথিত এই চার ক্রুসেড রাজ্য ছিল জেরুসালেম, অ্যান্টিয়ক, এডেসা ও ত্রিপলি। এগুলো আসলে মধ্যপ্রাচ্যের কেন্দ্রভূমিতে আদি প্রকৃত ইউরোপিয়ান উপনিবেশ গঠন করে। তাদের আকার ও সমৃদ্ধি যুদ্ধে যুদ্ধে কমত, বাড়ত। এ চারটির তিনটি ১৫০ বছরের মতো টিকে ছিল। শেষ পর্যন্ত সবগুলোই মুসলিম সেনাবাহিনীর হাতে পড়ে। আনুষঙ্গিকভাবে এ চারটি নতুন রাজ্যে ল্যাটিন ক্রুসেডারের প্রতিষ্ঠার মানে ছিল জেরুসালেম ও অ্যান্টিয়ক উভয় স্থান থেকে অর্থোডক্স প্যাট্রিয়কদের বহিষ্কার, যা ছিল অর্থোডক্স চার্চের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কেন্দ্রের মারাত্মক ক্ষতি।

তা-ই বিজিত ভূমি মুসলমানদের হাতে থাকা ছিল সুবিধাজনক অজুহাত। কিন্তু পুরো এলাকা মুসলিম নিয়ন্ত্রণে না থেকে যদি ইস্টার্ন খ্রিষ্টানদের অধীনে থাকত, তবে বিরামহীন ইউরোপিয়ান অভিযাত্রীরা কোনো-না-কোনো পর্যায়ে নিকট প্রাচ্যে একই ধরনের সম্প্রসারণশীল তৎপরতা চালাত কি না, তা নিয়ে কি বেশ সন্দেহ থেকে যায় না? একই সময় ইউরোপের বিভিন্ন রাজকীয় বাহিনী কোনো-না-কোনো কারণে বায়জান্টাইন ভূখণ্ডের কিছু কিছু অংশ দখল করার সময় অন্যান্য মিথ্যা অজুহাতের সন্ধান মেলে। বস্তুত অনিবার্য মুসলিম টার্গেট না পাওয়া গেলে কী ঘটতে পারত, তার নিশ্চিত প্রমাণ হিসেবে কাজ করতে পারে ১১৮২ সালের 'ল্যাটিন ম্যাসাকার'। সংক্ষেপে বলা যায়, ইউরোপিয়ান শক্তি ছিল পূর্ণ সামরিক সাজে, তারা কোথাও যেতে প্রস্তুত ছিল। এটা কল্পনা করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়,

তখন ক্রুসেড হতো ঘৃণ্য গ্রিক চার্চের বিরুদ্ধে ল্যাটিন চার্চের নামে। বস্তুত চতুর্থ ক্রুসেডে ইস্টার্ন চার্চের বিরুদ্ধে এ ধরনের একটি আক্রমণ হয়েছিল, যদিও মুখে মুখে বলা হচ্ছিল টার্গেট অবশ্যই ইসলাম।

মুসলিম ও পাশ্চাত্য পক্ষগুলোর মধ্যকার সাংস্কৃতিক বিনিময় অনেকটাই সীমিত ছিল, কারণ বেশির ভাগ লোক নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই আটকে থাকত। ক্রুসেডাররা মুসলিম সভ্যতার মাত্রা, তাদের চারুকলা, তাদের বস্ত্রশিল্পে মুগ্ধ হয়েছিল, এগুলো ইউরোপিয়ান শিল্পকলায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর মুসলমানদের সাধারণভাবে স্রেফ অবিশ্বাসী হিসেবে বিবেচনা করা হলেও পাশ্চাত্যে জেরুসালেম চূড়ান্তভাবে পুনঃদখলকারী মুসলিম কমান্ডার সালাদিন কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। তাকে শ্রদ্ধা ও বীরধর্মের মূর্ত প্রকাশ হিসেবে দেখা হতো। অবশ্য ক্রুসেডারদের প্রতি কমই মুগ্ধ হয়েছিল মুসলমানেরা। তারা তাদের মনে করত রুক্ষ, গেঁয়ো, দুর্গন্ধময়, মুসলিম ঐতিহ্যের গণগোসলখানা ব্যবহারে অনীহা প্রকাশকারী এবং আচার-আচরণে অমার্জিত।

আরেকটা উল্লেখ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, প্রথম ক্রুসেডেই এক মুসলমান প্রথমবারের মতো বলিষ্ঠভাবে পাশ্চাত্য হানাদারদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই ডাক দিয়েছিলেন দামাস্কাসের আইনবিশেষজ্ঞ ও ভাষাবিজ্ঞানী আলী বিন তাহির আল সুলামি। আল সুলামি ক্রুসেডকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখেননি, তার কাছে এটা ছিল মুসলিম সভ্যতার বিরুদ্ধে বৃহত্তর হুমকির অংশ। তার কাছে এমনটা মনে হওয়ার কারণ হলো তখন একই সাথে স্পেনেও খ্রিষ্টান ক্রুসেডার ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সঙ্ঘাত চলছিল। মুসলিম ভূখণ্ডে পাশ্চাত্যের লোকজনের সাথে মুসলমানেরা ঘনঘন মোকাবেলা করার সময় প্রথমবারের মতো ক্রুসেড শব্দটি পরিচিত হয়; অন্যথায় মুসলিম বাহিনী ওই সময় বেশির ভাগ মোকাবেলা করত বায়জান্টাইন ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে নিয়োজিত প্রাচ্য জনগোষ্ঠীর। বায়জান্টিয়াম ছিল সুপরিচিত উপাদান, মুসলিম বিশ্ব ইউরোপিয়ান পাশ্চাত্যের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ নিয়ে তখন কেবল ভাবতে শুরু করেছিল। দ্বিতীয় ক্রুসেড ব্যর্থ হওয়ার জন্য পোপ যেভাবে ক্রুসেডারদের পাপকে দায়ী করেছেন, একইভাবে আল সুলামিও ক্রুসেডে মুসলমানদের পরাজয়ের জন্য তাদের সত্য ধর্মত্যাগকেই দায়ী করেছেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে সফল হওয়ার জন্য মনকে পরিশুদ্ধ এবং নিয়ত ঠিক করার জন্য মুসলমানদের প্রথমে নিজেকে শুদ্ধ করার আহ্বান জানান। উভয় পক্ষই ভূরাজনৈতিক সংগ্রামকে অন্ধকারে রেখে ধর্মীয় যুদ্ধের পরিভাষায় তাদের যুদ্ধকে পরিচিতি করেছিল। আল সুলামির জিহাদের আহ্বান মুসলিম শাসকেরা অগ্রাহ্য করেছিলেন। অবশ্য ক্রুসেড শুরুর অনেক বছর পর সালাদিন সামরিক অভিযানের সাথে জিহাদকে ভালোভাবে সম্পৃক্ত করেছিলেন।

উত্তরের ক্রুসেড

ক্রুসেড উদ্দীপনার প্রকৃতি এবং এর বিরামহীন সম্প্রসারণশীল প্রকৃতি নিয়ে যদি কোনো সংশয় থাকে তবে ওই সময়ের অন্য কয়েকটি ক্রুসেড এর উচ্চমাত্রার রাজনৈতিক দিকটি প্রকটভাবে প্রকাশ করে। এসব ক্রুসেড মুসলমানদের সাথে তেমনভাবে সম্পৃক্ত ছিল না। প্রথম ক্রুসেডের প্রায় ৫০ বছর পর হওয়া দ্বিতীয় ক্রুসেডটির সময় ইউরোপের মধ্যেই ক্রুসেডীয় উদ্দীপনার আরেকটি পথ খুলে দিয়েছিল। পোপের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পবিত্র ভূমিতে যেতে অনাগ্রহী জার্মান গোত্রগুলোতে জানানো হয়, বাল্টিকের অবশিষ্ট পৌত্তলিক স্লাভিক গোত্রগুলো জয় এবং তাদের ধর্মান্তরিত করার অভিযান চালানোর মাধ্যমে তারা তাদের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে পারে।

পোপের ক্রুসেড পরিকল্পনার প্রধান মুখপাত্র ক্লেয়ারভক্সের বার্নাড ঘোষণা করেন, পৌত্তলিক স্লাভরা নিহত বা ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া দরকার। তবে পৌত্তলিকদের ধর্মান্তর পর্যন্তই ক্রুসেড সীমিত ছিল না। ক্যাথলিক টিউটোনিক নাইটরা ক্যাথলিক পোল্যান্ডে তাদের সহধর্মাবলম্বীদের ওপর পুরনো জাতিগত ও ভূখণ্ডগত বিরোধ মীমাংসা করতেও আগ্রহী ছিল। ডেনমার্ক ও সুইডেনের খ্রিষ্টান রাজ্যগুলোও বাল্টিক এলাকার দক্ষিণে তাদের ক্ষমতা সম্প্রসারণ করতে মুখিয়ে ছিল। এমনকি অর্থোডক্স খ্রিষ্টান রাশিয়াকে পর্যন্ত তারা তাদের টার্গেটে পরিণত করেছিল।

নানা ধরনের ক্রুসেড অভিযানের ফলে পূর্ব বাল্টিক বিশ্ব সামরিক বিজয়ে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল : প্রথমে লিভ [লিভোনিয়ান, লাটভিয়া ও এস্টোনিয়ার মধ্যবর্তী আদিবাসী জনগোষ্ঠী], লেট [লাভভিয়ান] ও এস্টোনিয়ানরা, তারপর প্র"শিয়ান [স্লাভ] ও ফিনরা জার্মান, ডেন ও সুইডদের নানা গ্র"পের হাতে পরাজিত, ব্যাপ্টাইজ হওয়া, সামরিক দখলদারিত্বে এবং অনেক সময় সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে পড়ে।

তা-ই দ্বিতীয় ক্রুসেড জার্মান বাহিনীকে বাল্টিকে তাদের শক্তি ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মীয় অজুহাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। বস্তুত ১১৪৭ সালে পোপ তৃতীয় ইউজেন পোপীয় অনুশাসন

(ফতোয়া) জারি করে পবিত্র ভূমি বা পৌত্তলিক স্লাভদের যে কারো বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের সমান আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

ক্যাথলিক টিউটোনিক নাইটদের একটি দল ১২৪২ সালে রুশ অর্থোডক্স নোভগোরড প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয় বর্তমানের সেন্ট পিটার্সবার্গের কাছে। তীব্র শীতে জমে যাওয়া লেক ল্যাডোগায় ভারী অস্ত্রে সজ্জিত বিপুলসংখ্যক জার্মান নাইট কাবু হয়ে পড়লে তারা যুদ্ধে হেরে যায়। ঘটনাটি রুশ গণসংস্কৃতিতে হানাদার ক্যাথোলিক অপঃশক্তির বিরুদ্ধে অর্থোডক্সির ঈশ্বর প্রদত্ত অন্যতম বিজয় হিসেবে অভিহিত হয়- যা ছিল রুশ জাতীয় চিন্তনে গভীর থিম। অর্থাৎ আমরা এমনকি ইউরোপেও ইসলাম, ওয়েস্টার্ন খ্রিষ্টধর্ম ও ইস্টার্ন অর্থোডক্স খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে ত্রিমুখী ভূ-রাজনৈতিক সংগ্রামের শাখা-প্রশাখা দেখি।

এসব ঘটনার পুরোটাজুড়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রায় দুই শ' বছর স্থায়ী এসব যুদ্ধ ও অভিযানের সবগুলো আহ্বান করেছিলেন পোপই। পোপই কার্যত ইউরোপিয়ান রাজপুরুষদের রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যক্রমকে উদ্দীপ্ত, নির্দেশিত ও পরিচালনা করেছেন। ইসলামে পুরোপুরি ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের মুসলিম সেনাবাহিনীকে এভাবে পরিচালনা করার কোনো উদাহরণ আমরা পাই না। (ইসলামে খলিফা ক্ষমতা পরিচালনা করতেন, বিশেষ করে প্রথম কয়েকটি শতকে। তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে সেকুলার ক্ষমতা ধারণ করতেন এবং ক্ষমতার রাজনীতির সুনির্দিষ্ট সেকুলার পন্থায় নির্বাচিত হতেন।) মুসলিম ওলামারা হয়তো অবশ্যই মুসলিম সামরিক অভিযানের জন্য দোয়া করতেন, কিন্তু তারা তাদের উদ্দীপ্ত করতেন না বা নির্দেশ দিতেন না। আবারো বলছি, খ্রিষ্টান ইতিহাসের বিরাট অংশজুড়ে আমরা রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখি, ইসলামে তেমনটি অনেক অনেক কম।

ইতিহাসে ক্রুসেড

এটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে, যেকোনো ভাষায় লেখা ক্রুসেড ইতিহাসবিষয়ক তথ্যের উৎস প্রায় পুরোপুরি পাশ্চাত্যভিত্তিক। ক্রুসেড ছিল ইউরোপিয়ান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্য কারণে পুরোপুরি পাশ্চাত্য পরিকল্পিত যুদ্ধ। কার্যত ইউরোপ ছিল প্রাচ্যে মহামিশন শুরু করার জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত, যা ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সব ধরনের শক্তিকে আত্মস্থ করে নিরাপদে অন্য দিকে সরিয়ে দিতে পারত। ক্যাথলিক ইউরোপ তার পূর্বমুখী (পৌত্তলিক স্লাভ, ইহুদি, ইস্টার্ন অর্থোডক্স খ্রিষ্টান বা মুসলিমদের বিরুদ্ধে) বিরামহীন সম্প্রসারণ শুরু করার জন্য প্রস্তুত ছিল, ওই অবস্থায় যে ধর্মই মধ্যপ্রাচ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকুক না কেন, তা কোনো বিষয়ই ছিল না।

ক্রুসেডার চলাচলের সংযোগ স্থলের কাছাকাছি বসবাস করে না এমন কিংবা সামরিক সংগ্রামে জড়িত হয়নি, এমন মুসলিমদের বেশির ভাগই এসব ঘটনা সম্পর্কে অনেকাংশেই অজ্ঞ ছিল। ঘটনার সময় মুসলমানেরা কিন্তু ক্রুসেডকে 'সভ্যতাগত ঘটনা' হিসেবে মনে করেনি, যেভাবে ওই সময়ের ইউরোপিয়ানরা বুঝেছিল বা বর্তমানকালের চিন্তাধারায় এটাকে বোঝা হয়। বস্তুত লেভ্যান্ট উপকূল নিয়ন্ত্রণের চলমান যুদ্ধগুলোতে যেসব মুসলিম আক্রান্ত হচ্ছিল, তারা পর্যন্ত ক্রুসেডার বা 'ফ্রাঙ্ক'দেরকে (তারা এ নামেই পরিচিত ছিল) মুসলমানেরা মনে করত বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের আশপাশে নিয়োজিত নানা ধরনের বায়জান্টাইন ভাড়াটে সৈন্য বা জাতিগত মিলিশিয়ার আরেকটি নতুন মাত্রা।

এটা এমন এক সময়ও ছিল, যখন মুসলিম বিশ্বে 'ফ্রাঙ্ক' বলতে ব্যাপকভাবে সব ইউরোপিয়ানকেই বোঝানো হতো। পাশ্চাত্য থেকে আগত যেকোনো ধরনের বিদেশী বোঝাতে এই এখনো মুসলিম এশিয়াজুড়ে সবার কাছে প্রায় সর্বজনীনভাবে 'ফিরিঙ্গি' বা 'ফারানজি' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

পরিশেষে ক্রুসেড প্রকৃতপক্ষেই অন্য পক্ষের জন্য, বিশেষ করে পাশ্চাত্যে নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে দিয়েছে। ক্রুসেড বিশেষজ্ঞ ক্যারোল হিলেনব্র্যান্ড বিষয়টা এভাবে বলেছেন :

মুসলিম বিশ্বের সাথে যোগাযোগের ফলে আরব বিশ্বের হাতির দাঁত, খোদাই ধাতুসামগ্রী এবং অন্যান্য বিলাসদ্রব্যসহ সব ধরনের পণ্যের স্বাদ পেল ইউরোপ। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বস্ত্র খাত : দামাস্ক [বুটিতোলা কাপড়], ফুস্তিয়ান [খসখসে সুতি বস্ত্র], মসলিন, অরগান্ডি [বিশেষ ধরনের মসলিন], অ্যাটলাস, সাটিন ও তাফতা [পাতলা ও চকচকে রেশমি কাপড়]...।

পবিত্র ভূমি থেকে ফেরা ক্রুসেডাররা বাড়ি ফিরে ফেলে আসা অদ্ভুত সব দেশের কথা বলত। ১৮ শ ’ শতক থেকে চলমান প্রাচ্য-জাগতিক বৈশিষ্ট্য এবং পাশ্চাত্য শিল্পকলা ও সাহিত্যে এর প্রকাশ অ্যাডওয়ার্ড সাইদের জোরালো বর্ণনা ক্রুসেডের ঐতিহ্যকেই পরিপুষ্ট করেছে। মুসলিম বিশ্ব ছিল মরুভূমি, প্রাচীরঘেরা নগরী, বোরকা পরা নারী, হেরেম, খোজা, হাম্মামখানা, ষড়যন্ত্র, বিকটদর্শন প্রাণী, পোশাক, ভাষা, বিলাসসামগ্রী এবং বিদেশী ধর্ম; সংক্ষেপে রোমান্টিক রহস্য ও বিপদের ভূমি।

১৯৫০-এর দশকে ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে অভিমত জানতে চাইলে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই যে মন্তব্যটি করেছিলেন তা বিখ্যাত হয়ে আছে : ‘বলার মতো সময় এখনো আসেনি।’ এখানেও একই কথা প্রযোজ্য। সময় প্রতিনিয়ত অতীত সম্পর্কে নতুন নতুন ধারার সৃষ্টি করে চলে, সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের মতোই অনেক কিছু বলার পাশাপাশি নির্দিষ্ট অতীত ঘটনা সম্পর্কেও জানায়। সময়ের পরিক্রমায় ক্রুসেড নিয়ে অনুকূল ও প্রতিকূল সব ধরনেরই নানা ব্যাখ্যা চলছে। বর্তমানে পাশ্চাত্যে সবচেয়ে সেকুলারমনস্ক লোকজনের মধ্যে ঘটনাগুলোকে পাশ্চাত্যের সম্প্রসারণবাদের শক্তি হিসেবেই দেখার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে, যা পাশ্চাত্য ইতিহাসে বিশেষভাবে প্রশংসিত ঘটনা নয়। রক্ষণশীল খ্রিষ্টান ভাষ্যকারেরা এই যুক্তির দিকেই ঝুঁকে আছেন, চলমান মুসলিম সম্প্রসারণের ফলে খ্রিষ্টধর্ম যে মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় পবিত্র ভূমিতে পাশ্চাত্য হস্তক্ষেপ হয়েছিল বলে অজুহাত সৃষ্টির যুক্তির দিকে ঝুঁকে আছে। ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বর্তমান বিতর্কের শিকড় তা-ই পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে।

মুসলমানদের কাছে প্রেক্ষাপটের ঐতিহাসিক পরিবর্তন অনেক বেশি নাটকীয়। বর্তমানে মুসলিমরা ক্রুসেডের মধ্যে পাশ্চাত্য নীতিতে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রেরণার প্রাচীনতম নির্দেশনা উপলব্ধির জন্য পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে; উসামা বিন লাদেন এবং অন্যরা ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধ’কে মুসলিম ভূমির বিরুদ্ধে ‘জায়নবাদী-ক্রুসেডার’ আগ্রাসন হিসেবে বর্ণনা করছেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ ধারণাটি জোরদার করেছেন জর্জ ডব্লিউ বুশ, ৯/১১-এর পর প্রথম সপ্তাহে ‘এই ক্রুসেড, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ’ হিসেবে অভিহিত করলে ক্রুসেড আমলের পূর্ণ ঐতিহাসিক তাৎপর্য যেসব ইউরোপিয়ান মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন, তারা বুশের পরিভাষাটি ব্যবহারে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন।

মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমান যুদ্ধ নিয়ে আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য অতিমাত্রায় মানসিক। এগুলো কার প্রাথমিক প্ররোচনায় কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল, সেই হিসাবের মধ্যেই আমাদের অনুভূতি আটকে রাখে, যা প্রথম দায়ী কে তা শনাক্ত করতে সীমাহীন পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে ইতিহাস-রাজনীতির জন্য ডিম আগে না মুরগি আগে সমস্যার সৃষ্টি করে। ইসলাম আজ ক্রুসেডের কাহিনী সৃষ্টিকারী ভয়াবহ ভূ-রাজনৈতিক জটিলতা ফুটিয়ে তোলা সুবিধাজনক সঙ্কেতলিপি। ক্রুসেড এখন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উত্তেজনার সর্বদেবতার মন্দির। যদিও আমরা উল্লেখ করেছি, এই সংগ্রামের প্রাথমিক ভিত্তির অনেক কিছু ইসলাম আত্মপ্রকাশ করার বেশ আগেই কনস্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক বিদ্রোহের মধ্যে নিহিত ছিল; এসব আন্দোলন মূলত ভূখণ্ড ও শক্তির জন্য হলেও লড়াইয়ে নানা ধর্মীয় ব্যানার (ধর্মভ্রষ্টতা) গ্রহণ করা হয়েছিল। ইসলামের আগে অস্তিত্বশীল এসব উত্তেজনা ইসলামের সাথে সমান্তরাল চলেছে, বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে এখনো বিদ্যমান। ইসলাম না থাকলেও কি ক্রুসেড হতো? হয়তো একই অবয়বে হতো না, তবে যেকোনোভাবেই হোক না কেন, বিশ্রামহীন ও উচ্চাভিলাষী ইউরোপ প্রাচ্যমুখী অভিযানের একটা সহজ পথ ঠিকই বের করে নিত। পাশ্চাত্য তখন ইউরোপের অন্যান্য সীমান্তে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। ইসলামের ভিন্ন খাতে সরিয়ে নেয়ার উপাদানটি কখনো অস্তিত্বশীল না থাকলেও রোম ও কনস্টান্টিনোপলের মধ্যকার উত্তেজনা ওই সময় যতটা দেখা গেছে, তার চেয়ে সম্ভবত আরো সরাসরি ও সঙ্ঘাতময় হতো।

অধ্যায় ছয়

একই সুর : প্রটেস্ট্যান্ট রিফরমেশন ও ইসলাম

ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং বিদেশী হস্তক্ষেপের এক ফাঁকে একদল মৌলবাদী একটা ছোট্ট শহরের ক্ষমতা দখল করে তাদের ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে, তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের আলোকে নগরীটির নতুন নাম দেয়। বিপুল অনুসারীর সমর্থনে এক গোঁড়া স্বৈরতান্ত্রিক ধর্মীয় নেতা নিজেকে প্রধান হিসেবে উপস্থাপন করেন, সম্প্রদায়টি তাদের ধর্মবিশ্বাস চাপিয়ে দিয়েছিল, তিনি তাদের ভিশন অনুযায়ী ১৮ মাস কঠোর ধর্মতাত্ত্বিক শাসন চালান। তারা বিশ্বাসীদের সাথে তাদের সম্পদ ভাগাভাগি করে নিত, আর যারা অবিশ্বাসী তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক শক্তি প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত থাকত। তারা বহু বিবাহপ্রথা অনুশীলন করত, অনেকের চারটির বেশি স্ত্রী ছিল। এমনকি তাদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য স্থানীয় শাসকেরা (তারা মনে করতেন, তাদের নিজেদের বৈধতাও হুমকির মুখে পড়েছে) তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অবরোধ আরোপ করলেও বিদ্রোহীরা ঈশ্বরের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিকল্পনার মিলেনেরিয়ান [খ্রিষ্টীয় সহস্রাব্দ-সম্পর্কিত ভাবনা] ও অ্যাপোক্যালিপটিক [পৃথিবী চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হওয়া-সম্পর্কিত ভাবনা] ভিশন প্রচার করছিল। তারা আশা করছিল, এর মাধ্যমে বিশ্ব ক্রুসেডের সূচনা হবে। বহিরাগত কর্তৃপক্ষের সুসজ্জিত বাহিনীর কাছে বিদ্রোহীরা চূড়ান্তভাবে গুঁড়িয়ে যায়, এর নেতাদের নির্যাতন চালিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, তাদের দেহগুলো খাচায় ভরে প্রদর্শন করা হয়। ধর্মনিষ্ঠতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে।

এটা কোনো ইসলামি মৌলবাদী আন্দোলন ছিল না। স্থানটি ছিল জার্মান নগরী মুনস্টার, সময় ১৫৩৪ সাল। প্রটেস্ট্যান্ট রিফরমেশন তখন পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চলছে। আন্দোলন ও এর নেতারা ছিলেন অ্যানাব্যাপ্টিস্ট, রিফরমেশনের [১৬ শ’ শতকে ইউরোপে পোপবিরোধী ধর্ম-আন্দোলন] সবচেয়ে চরম তিনটি ধারার (অন্য দু’টি হলো লুথেরিয়ান ও ক্যালভিনিস্ট) অন্যতম। অ্যানাব্যাপ্টিস্টরা তাদের নগরীর নতুন নাম করেছিল ‘নিউ জেরুসালেম,’ তবে তাদের বাণী ও কর্মপদ্ধতির চরমপন্থা ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের (লুথেরান) ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট ছিল, তারা নগরীটি ঘেরাও করে বিপজ্জনক মতবাদটিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

এই সহিংস বৈপ্লবিক ঘটনাটি অ্যানাব্যাপ্টিস্ট রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমাপ্তি ঘটায়। ৯/১১-এর পর অনেক ইসলামি আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে, তেমনভাবেই ১৫৩৪ সালের অ্যানাব্যাপ্টিস্ট নেতাদের সহিংসতা প্রয়োগের সাথে নিজেদের সম্পর্কহীনতার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। লুথেরিয়ান ও ক্যালভিনিস্টরা অ্যানাব্যাপ্টিস্টদের বিপ্লবী কর্মসূচি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে, মুনস্টার কাহিনীর পেছনে থাকা ধর্মান্ধতায় ইউরোপ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

এই প্রেক্ষাপটে ক্যাথলিকদের কাছ থেকে একসময় চরমপন্থী গালি খাওয়া 'সংস্কারবাদী প্রটেস্ট্যান্টরা' তুলনামূলক আরো বেশি মূলধারায় আবির্ভূত হতে শুরু করে। আমরা আজ একই ঘটনা ঘটতে দেখি। ৯/১১-এর ঘটনাবলি এবং এগুলোর ক্ষতিকর পরিণতিতে অনেক মৌলবাদী মুসলিম হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। কারণ চরমপন্থী ধর্মতত্ত্বের চূড়ান্ত রাজনৈতিক ও সামরিক পরিণাম আরো স্পষ্ট হয়ে পড়ায় বিপুলসংখ্যক লোক তড়িঘড়ি করে তাদের মধ্যকার সহিংসতার ভূমিকার নিন্দা করে, যদিও যে দুর্দশার কারণে এসব ঘটনা ঘটেছে, তা তারা বুঝত।

আচ্ছা, মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলির ইতিহাসে গভীরতর কারণ খুঁজতে ধর্মবহির্ভূত ভূমিকা নির্ণয়ের জন্য যে বইটি লেখার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল, তাতে ইউরোপের রিফরমেশন এবং এর শাখা-প্রশাখা কেন বিবেচনা করা হচ্ছে? প্রচণ্ডভাবে রাজনৈতিক প্রকৃতির ঘটনাবলি আপাতদৃষ্টিতে একেবারেই ধর্মীয় চরিত্রের বলে মনে হতে থাকে বলে আমরা যে ধারণার কথা ইতঃপূর্বে বলেছিলাম, বস্তুত প্রটেস্ট্যান্ট রিফরমেশন এমন অনেক কিছুর সাবলীলভাবে মুগ্ধতা ছড়ানো ব্যাখ্যা দেয়। কিন্তু আবারো বলছি, ধর্ম হলো রাজনৈতিক সঙ্ঘাত ও গোলযোগের কারণ নয়, স্রেফ বাহন। রাজনৈতিক নেতারা তাদের প্রয়োজনের হাতিয়ার হিসেবে ধর্মের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করেন। অবশ্য তারপরও রিফরমেশনের ঘটনাবলি নাটকীয়ভাবে বিপরীত বিষয়ও অবহিত করে : কী ঘটে যখন রাষ্ট্র বা চার্চ ধর্মের বিষয়বস্তুর ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে কিংবা অন্যদের এমনকি সাধারণ মানুষকেও ধর্মতত্ত্ব বা এর অর্থ এবং এ নিয়ে সক্রিয় থাকার উপায় নির্ধারণ করার অনুমতি দেয়। ধর্মীয় মতাদর্শের কেন্দ্রীয়ভাবে ও রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখার ব্যাপারে ইসলামের চেয়ে খ্রিষ্টধর্ম অনেক অনেক বেশি সফল হয়েছে (রিফরমেশনের সময় হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত); রোমান ক্যাথলিক চার্চ এখনো ওই নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ইসলামের যদি একেবারেই অস্তিত্ব না থাকত এবং মধ্যপ্রাচ্যে এখনো ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চের ক্ষমতা অটুট থাকত, তখনো রাজনৈতিক ক্ষমতা, সম্পদ এবং মতাদর্শের নিয়ন্ত্রণের জন্য বিকশিত হতে থাকা প্রটেস্ট্যান্ট জার্মান রাজপুরুষ ও অন্যরা চ্যালেঞ্জ জানাত কেবল রোমের ল্যাটিন চার্চকে। কনস্টানটিনোপল সম্ভবত কঠোর অর্থোডক্সির প্রাচীর হিসেবেই বহাল থাকত, পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টধারাটিকে আরো বেশি করে বিভ্রান্ত, বিপজ্জনক, এমনকি বিপর্যয়কর মনে করত।

ইসলাম কখনো কোনো ধরনের প্রটেস্ট্যান্ট রিফরমেশনের মধ্য দিয়ে যায়নি, বাকি বিশ্বও তেমন অবস্থায় পড়েনি। পাশ্চাত্যের জন্য রিফরমেশন ছিল থার্টি ইয়ার্স ওয়ার (৩০ বছরের যুদ্ধ, ইউরোপের ইতিহাসে অন্যতম রক্তাক্ত লড়াই) এবং আরো নানা ঘটনার মাধ্যমে সার্বিকভাবে ইউরোপকে অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দেয়া। একে ধর্মীয় যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করা হলেও বাস্তবে পুরোটাই ছিল রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার ক্ষমতার লড়াই। রিফরমেশন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার ক্ষমতার সম্পর্ক বদলে দেয়ার পাশাপাশি অনেক সংহতিনাশকতা এবং অনেক সময় মুনস্টারের মতো সহিংস ধারারও সূচনা করেছিল। এটা সামাজিকভাবে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির কারণ হয়েছিল এভাবে যে, ধর্মীয় আদর্শ প্রশ্নে এটা জনসাধারণকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে তা মুক্তি দিয়েছিল, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যক্তিকে আরো বেশি চিন্তা করার ক্ষমতা দিয়েছিল এবং চূড়ান্তভাবে সত্যিকারের কিছু কিছু চরমপন্থী মতাদর্শকে নিয়ন্ত্রণহীন করে দিয়েছিল।

গত শতকে মুসলমানরাও ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে অনেক নতুন চিন্তাভাবনা করেছে; তারাও তাদের নিজেদের ক্ষমতাসীন মহলের তীব্র সমালোচনা এবং আরো অনেক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী শক্তির উদ্ভব ঘটিয়েছে; রাজনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য নতুন নতুন সংস্থা গঠন এবং এমনকি নির্বাচিত অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী শত্রু ও হানাদারদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের ব্যবহারের কৌশল গ্রহণ করেছে। আলকায়েদা এসব শক্তির মাত্র একটি।

অনেক দিক থেকে রিফরমেশন ছিল ধর্মের গণতন্ত্রায়নের যুগ : কোনো ধরনের কার্যকর গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক-ব্যবস্থার কথা না বলা হলেও ব্যক্তিদের ধর্মীয় গ্রন্থ নিয়ে গবেষণা করতে এবং ধর্মের অর্থ নিয়ে তাদের চিন্তা করতে উৎসাহিত করা হয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদিতে এটা সত্যিই ছিল গণমানুষের কথা বলার সুযোগ পাওয়ার সূচনা। তবে এই অধ্যায়ে এটাও দেখানো হচ্ছে যে, গণতন্ত্রায়ণের ধারা সৃষ্টি করা হলে তথা প্রত্যেককেই তাদের নিজেদের মতো করে ধর্মীয় ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেয়ে ধর্মতত্ত্ববিদে পরিণত হলে তাতে চরম পরিণতিরও উদ্ভব ঘটতে পারে। ইসলামি মৌলবাদে প্রটেস্ট্যান্ট চরমপন্থাবাদের এবং এমনকি খ্রিষ্টধর্মের কিছু সমসাময়িক চরম প্রটেস্ট্যান্ট ব্যাখ্যারও কিছু বিস্ময়কর প্রতিধ্বনি দেখা যায়। ধর্ম-সম্পর্কিত বিষয়াদিতে আরো মুক্ত ও আরো সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক চিন্তাভাবনা করার এসব নতুন প্রবণতার কারণে রাষ্ট্র, বিশেষ করে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র হুমকির মুখে পড়েছে। বস্তুত, রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় চিন্তাচেতনার স্বাধীনতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে; একটিই অন্যটিকে মুক্ত করতে কাজে লাগে।

এটাও উল্লেখ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চ কোনো পর্যায়েই রিফরমেশন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়নি। এতে ধারণা করা যায়, মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম না থাকলেও তথা অর্থোডক্স খ্রিষ্টান ধর্ম এখনো সেখানে বহাল থাকলে ইসলামের অধীনে এখন যেমন আছে তার চেয়ে কোনোভাবেই বেশি সেকুলার ও যুক্তিবাদী হতো না। বস্তুত এমন যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, যাতে মনে হয় আধুনিক সময়ে

অনেক দিক থেকেই অর্থোডক্স চার্চের চেয়ে ইসলাম অনেক বেশি গণতান্ত্রিক, আরো বেশি গণমানুষের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে (এটা ভালো কি মন্দ, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে)।

পরিশেষে এই অধ্যায়ে আধুনিক খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে থাকা চরম ভাবাপন্ন কিছু ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দিকেও আলোকপাত করা হচ্ছে, সেগুলো মূলধারার না হলেও সমসাময়িক খ্রিষ্টান চিন্তাভাবনায় এখনো বিপুল প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রায় একই রকম বিস্ময়কর ঘটনা দেখা যায় ইসলামি চিন্তাধারার চরমপন্থায়। এ প্রেক্ষাপটে তাই বলা যায়, ইসলাম কম থেকে আরো কম ব্যতিক্রমী, মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক বৈশিষ্ট্যে অনন্য এবং রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার সাথে ধর্মীয় পরিবর্তনের বৈশ্বিক প্রক্রিয়ার সাথে অনেক বেশি সম্পৃক্ত কিংবা বিপরীত দিক থেকে ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতার সাথে রাজনৈতিক পরিবর্তনের অংশবিশেষ।

১৬ শ’ শতকের প্রটেস্ট্যান্ট রিফরমেশন ওয়েস্টার্ন চার্চের পুরো প্রতিষ্ঠানটিকেই ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। চার্চ ইতিহাসে এটা সবচেয়ে বিপর্যয়কর ভাঙন, এমনকি কয়েক শ’ বছর আগের ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চ ও ল্যাটিন চার্চের মধ্যকার ‘মহাবিভক্তি’র চেয়েও বড় কি না তা তর্কসাপেক্ষ বিষয়। এর সবই ঘটে ইউরোপের অভ্যন্তরে। এর ফলে সৃষ্টি হয় গভীর ও স্থায়ী বিভক্তি। পাশ্চাত্যে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ধর্মতাত্ত্বিক মতাদর্শ টুকরা টুকরা হয়ে চার্চ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে নতুন সম্পর্ক তৈরি করে। চার্চ বা পাশ্চাত্য আর কখনো আগের মতো হয়নি।

অবশ্য রিফরমেশন কিন্তু পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত ঘটনা হিসেবে আসেনি। আগমনের সময়টায় এর অনেক কিছুই ছিল, যার রাজনৈতিক চরিত্র প্রকাশ করে দিচ্ছে। সন্ন্যাসী মার্টিন লুথার ১৫১৭ সালে উইটেনবার্গ চার্চের দরজায় চার্চের বিরুদ্ধে আনীত ৯৫টি অভিযোগ যুক্তি দিয়ে তুলে ধরার সময় তিনি চার্চের বিরুদ্ধে কয়েক শ’ বছরের ক্ষোভ একটি তীক্ষ্ণ মুহূর্তেই ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ওই সময়ে সেকুলার শক্তিতে ক্রমাগত শক্তিমান হতে থাকা জার্মান রাজরাজড়ারা এবং উত্তর ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো চার্চের মাত্রাতিরিক্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে আপত্তি উঠাচ্ছিল। ইউরোপ ইতোমধ্যে পোপতন্ত্রকে নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কয়েক শ’ বছর ধরে অমর্যাদাকর লড়াই দেখেছে। রিফরমেশন কখনোই ঘটত না, যদি লুথার ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তোলা কিছু বিক্ষুব্ধ সন্ন্যাসীর স্রেফ একজন মাত্র হতেন। তার আন্দোলন সফল হওয়ার কারণ ছিল তার প্রতি জার্মান রাজপুরুষদের সরাসরি সমর্থন। এসব রাজপুরুষ চার্চের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনার ব্যাপারে তার আকাঙ্ক্ষার সাথে একমত পোষণ করতেন। চার্চের বিরুদ্ধে আনা ধর্মতাত্ত্বিক আপত্তিগুলো পুরোপুরি সত্য হলেও সেগুলো আসলে চার্চের ক্ষমতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গভীরতর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আক্রমণের বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, লুথারের

প্রামাণ্য যুক্তিগুলো চার্চ-রাষ্ট্র সঙ্কটের দিকে নিয়ে যায়, যা আগের যুগে ইউরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থা মোকাবেলা করতে ইচ্ছুক ছিল না; কিন্তু ১৫১৭ সালে তারা প্রস্তুত হয়ে পড়ে।

রিফরমেশন তার অনেক উদার অবয়বে চার্চের ব্যাপক সংস্কার (মতাদর্শগত, সাংগঠনিক ও পরম্পরাগত) এবং রোমের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা অবসানের আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তন-প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীভূত এবং স্বাধীন মানসিকতার বিবর্তন ঘটে যাওয়ায় চিন্তাভাবনায় আরো চরমপন্থী ফর্মুলার উদয় ঘটে, চূড়ান্তভাবে এগুলোর কোনো কোনোটি একেবারে আদি সময় থেকে সত্যিকারের খ্রিষ্টধর্ম থেকে বিচ্যুতির প্রতিনিধি হিসেবে চার্চের পুরো কর্তৃত্ব, তার ধর্মতাত্ত্বিক কাঠামো, পরম্পরা, ইতিহাস এবং 'সত্য খ্রিষ্টধর্ম' থেকে বিচ্যুতি প্রতিনিধিত্ব কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করা শুরু করে।

ইসলামে সত্যিকার অর্থে পাশ্চাত্যের (এখানে চার্চ বিপুল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ধারণ করে রাখত) মতো চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। বর্তমানের ইসলামপন্থীরা (যারা রাজনৈতিক ইসলামের কথা বলে) সব সময় ইসলামের ধর্ম ও রাষ্ট্রের (দ্বীন ওয়া দাওয়া) মধ্যকার অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের কথা বললেও বাস্তবে এই ধারণা ব্যাপকভাবে আধুনিক আদর্শগত বিনির্মাণ : ইসলামে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সব সময়ই পুরোপুরি ধর্মবেত্তাদের কাছ থেকে দূরে থেকেছে (বর্তমান ইরানের ধর্মবেত্তাদের প্রাধান্য পুরোপুরি ব্যতিক্রম, এটা আধুনিক শিয়া উদ্ভাবন)। এমনকি সৌদি আরবে রাজতন্ত্র বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাধর।

নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম শাসকদের বৈধতা নির্ভর করে শরিয়াহ আইন (তাত্ত্বিকভাবে হলেও) বাস্তবায়নের ওপর, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই শাসকেরা শরিয়াহর চেতনা আন্তরিকভাবে বাস্তবায়নে আগ্রহী ছিলেন না এবং ধর্মীয় ত্রুটির কারণে তাদের উৎখাত বিরল ঘটনা। বস্তুত মধ্যযুগীয় অনেক ধর্মবেত্তা অপশাসন দূর করার জন্য সেকুলার শক্তিকে সাদা কাগজে সই করে দেয়ার মতো করেই অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন বিধানও জারি করেছেন, নিপীড়নমূলক (জুলুম) শাসনের চেয়ে নৈরাজ্য (ফিতনা) বেশি খারাপ। সত্যিই ইসলামের ইতিহাসে কোনো সুলতান বা মুসলিম শাসককেই গ্র্যান্ড মুফতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য তার সামনে নতজানু হতে হয়নি, কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেকুলার বিষয়ে পোপের কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে যেমন হয়েছিলেন পোপের সামনে ১০৭৭ সালে ক্যানোসাতে পঞ্চম হেনরি। ইংল্যান্ডের সপ্তম হেনরিকে তার স্ত্রীর সাথে বিবাহবিচ্ছেদ নিশ্চিত করার জন্য রোমের সাথেই পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছিল। অর্থাৎ খ্রিষ্টান ইতিহাসের বেশির ভাগ সময় ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় শক্তির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়, তেমন কিছুই নেই ইসলামে।

আগেকার অধ্যায়গুলোতে দেখানো হয়েছে, সম্প্রসারণশীল ধর্মগুলো কিভাবে স্থানীয় ধর্মীয় ঐতিহ্য, ধর্মীয় স্থান, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং পূর্ববর্তী ধর্মের শাস্ত্রাচার আত্মস্থ করে থাকে নতুনটির সাবলীল অগ্রযাত্রার জন্য। খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম উভয়টিই সম্প্রসারিত হওয়ার সময় এসব পৌত্তলিক ব্যবস্থার সামনে পড়েছে; তাদের সংস্কারকেরা এগুলো বাতিল করে শুদ্ধ, মূল ধর্মে ফিরে যেতে চেয়েছে। প্রটেস্ট্যান্ট রিফরমেশনেও এমন ব্যাপার ছিল তথা বিশুদ্ধ বাণীতে প্রত্যাবর্তন। মুসলিম 'মৌলবাদীরাও' মূল বিধিবিধান, মৌলিক ব্যবস্থা ও ধর্মের বিশুদ্ধতায় ফিরে যাওয়ার প্রয়াস চালায়। সৌদি আরবে ১৮ শ' শতকের ওয়াহাবিবাদ ছিল এ ধরনের অনেক আন্দোলনের একটি; এগুলো প্রায়ই 'পুনর্জীবন' আন্দোলন (তাজদিদ) হিসেবে উল্লিখিত হয়। পুনর্জীবনের অর্থ দুই রকম হতে পারে : ধর্ম যে সময় অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ছিল বলে ধারণা করা হয়, সেই সময়ে ফিরে যাওয়ার আন্দোলন বোঝানো যেতে পারে কিংবা সমসাময়িক উপলব্ধির নতুন আলোয় সনাতন গ্রন্থগুলোর সময়োপযোগী ব্যাখ্যার দিকে মনোনিবেশন করাও বোঝা হতে পারে।

তাহলে এখন যদি অর্থোডক্স বিরাজ করত, তবে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল কতটুকু বদলাত? তিনটি ধর্মের (ইসলাম, ওয়েস্টার্ন ক্যাথলিক খ্রিষ্টধর্ম ও ইস্টার্ন অর্থোডক্স খ্রিষ্টধর্ম) মধ্যে সম্ভবত অর্থোডক্সিই সবচেয়ে কম বদলিয়েছে। শাস্ত্রাচার প্রশ্নে সবচেয়ে বড় ধরনের বিভক্তিসূচক সংস্কার প্রবর্তন করা হয়েছিল ১৭ শ' শতকের রাশিয়ায়, গ্রিক অর্থোডক্স ব্যবস্থার সাথে রুশ অর্থোডক্স ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধেও ব্যাপক গণ-অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। অন্যান্য অর্থোডক্স 'সংস্কার' চার্চের ওপর রুশ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ জোরদার হয়। কনস্টান্টিনোপল পতনের পর থেকে অর্থোডক্স চার্চ রাজনৈতিক বিষয়াদিতে তার সম্পৃক্ততা থেকে দূরে থাকা বজায় রেখে চলেছে। তিন ধর্মের মধ্যে তারাই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি 'পারলৌকিক' এবং রাষ্ট্রের প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুগত। এটা রাজনৈতিক ও সামাজিক এজেন্ডায় ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হওয়া এড়িয়ে যায়। মধ্যপ্রাচ্য এখনো অর্থোডক্সির আওতায় থাকলে রাজনৈতিক বা সামাজিক ইস্যুতে ল্যাটিন খ্রিষ্টধর্ম বা ইসলামের চেয়ে সম্ভবত অনেক বেশি রক্ষণশীল থাকত।

সব আইনের উৎস ধর্মগ্রন্থ

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রিফরমেশনের শিক্ষার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে খুব সামান্য। সেটা হলো– রাষ্ট্র কিংবা চার্চের মতো শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলো যখন ধর্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, তখন ধর্ম দ্রুততার সাথে রাষ্ট্র এবং এর শক্তিগুলোর ওপর আক্রমণ চালানোর হাতিয়ারে পরিণত হয়। কোনো কোনো চরমপন্থী প্রটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের (বিশেষ করে ক্যালভিনিস্ট ও অ্যানাব্যাপ্টিস্ট) কাছে গণতন্ত্রায়ন ও ব্যক্তিবাদের বৃহত্তর শক্তি ধর্মগ্রন্থের আরো ব্যক্তিগত ও চরম ব্যাখ্যার দরজা খুলে দেয়া বিবেচিত হয়ে আসছে। সমাজ ও শাসনকাজ পরিচালনার জন্য এ প্রক্রিয়াটির তাৎক্ষণিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

ইসলামও তার অতীতের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ধর্মবেত্তাদের চিন্তাভাবনা থেকে মুক্তির পথে চলেছে; নানা ধরনের আধুনিক ইসলামি আন্দোলন বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়েছে। যখনই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ধর্মবেত্তারা বিশ্বাসযোগ্যতা ও বৈধতা হারান, তখনই অন্যরা ইসলামের ব্যাখ্যা দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধর্মের বাণী নির্দেশ করতে পারে। অবশ্য এসব আন্দোলনের অনেক (কঠোর, রূঢ়, চরমপন্থী ও সহিংস) পুনর্বিবেচনাধীন ইসলামি প্রক্রিয়াকে সরাসরি ছাড়িয়ে গেছে। রাষ্ট্রের জন্য কর্মরত ধর্মবেত্তাদের ক্ষেত্র না থাকা, শাস্ত্রাচার ও বিশুদ্ধতার 'নিরাপদ' কৈফিয়তের সীমা না থাকায় রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নবতর ইসলামি আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। দুর্নীতি, অদক্ষতা, নির্যাতন এবং অপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের মোকাবেলায় এবং 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধে'র চাপে ভঙ্গুর দশায় থাকা নাজুক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উত্তরণে ভূমিকা পালনের জন্য ধর্মকে আহ্বান করে।

নানা ধরনের সমসাময়িক ইসলামবাদ রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং এমনকি ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী স্থিতাবস্থা আগ্রাসীভাবে পরিবর্তনের কথা পর্যন্ত জোরালোভাবে বলার চেষ্টা করে। পরিবর্তন প্রক্রিয়াটি সংযত থাকা চরমপন্থাবাদ ও সহিংসতাকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে। কোনো কোনো গ্রুপ সমসাময়িক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ইসলামের আরো উদার ব্যাখ্যার দিকে অগ্রসর হলেও অনেক গ্রুপ আবার ধর্মীয় গ্রন্থগুলোকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে অসহিষ্ণুতার দিকে অগ্রসর হয়, সমসাময়িক বিশ্বে সেগুলো অপরিবর্তনীয়ভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা

করে। প্রটেস্ট্যান্ট রিফরমেশনের মতো ইসলামেও প্যান্ডোরার বাক্স খুলে গেছে। তারা বর্তমানের মেরুকরণ করা পরিস্থিতিতে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক অগ্রগতির মধ্যকার সম্পর্কের গুরুত্ব দেয়ায় মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক মানের অবনতি ঘটবে। প্রক্রিয়াটি ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে : ৯/১১ এবং 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধ' চরমপন্থা এবং একই সাথে এর চূড়ান্ত প্রতিষেধকগুলোর উৎপাদন ত্বরান্বিত করেছে।

রিফরমেশনে রোমান চার্চের কেন্দ্রীভূত ধর্মতাত্ত্বিক কর্তৃত্ব পতনের ফলে ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর বিষয়বস্তু কিভাবে শুভ (এবং ঐশ্বরিক) সমাজ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হতে পারে– সে প্রশ্নের দরজা খুলে গেছে। বাস্তবে সমাজের তাৎক্ষণিক প্রয়োগের জন্য কোনো ধর্মই আগে থেকে তৈরি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থার জোগান দিতে পারে না : নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীরা কেবল গ্রন্থগুলো থেকে মূল্যবোধগুলো সংগ্রহ করে তাদের প্রয়োজন অনুসারে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগানোর আইন প্রণয়নের চেষ্টা করতে পারে। খ্রিষ্টান ও ইসলাম উভয়েই সমাজ ও শাসনব্যবস্থায় ধর্মগ্রন্থ ও মূল্যবোধের প্রয়োগের সংগ্রাম করে যাচ্ছে এবং করে যাবে। প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টধর্ম বিশেষ করে সমাজের জন্য নিজেদের মতো করে ধর্মতত্ত্ব এবং নৈতিক সিদ্ধান্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে, ইতঃপূর্বেকার রোমান ক্যাথলিক ও অর্থোডক্স ঐতিহ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী অপ্রতিনিধিত্বশীল চার্চ কাউন্সিলের রায় নয়।

ইসলামও এই একই প্রশ্নের জবাব খুঁজে বেড়াচ্ছে :

ইসলাম সম্পর্কে ব্যক্তির ধারণা গঠন এবং ইসলামি আইন প্রণয়নে পবিত্র কুরআনের ভূমিকা কী? ইসলামি সংস্কারবাদ ও প্রটেস্ট্যান্টবাদ উভয়ই কাজ ও ফলাফলে আগ্রহী, কেবল বিমূর্ত ধর্মতত্ত্বে না থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও তাদের সামাজিক সংশ্লিষ্টতা প্রয়োগ করতে চায়।

লুথেরিয়ানবাদ ও অ্যানাব্যাপ্টিস্টবাদের সাথে ক্যালভিনবাদও ছিল রিফরমেশনের প্রধান তিনটি আন্দোলনের অন্যতম। জন ক্যালভিন শক্তিশালী অতীন্দ্রিয় ব্যক্তিগত ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করার ফলে তাকে দৃঢ়ভাবে প্রটেস্ট্যান্ট ধরনের বিশ্বাস গ্রহণের দিকে চালিত করে : 'ঈশ্বর এক আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিয়ে আমার আত্মাকে কোমল করে বশীভূত করেছেন' এবং তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করলেন, বিশ্বের আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের জন্য ঈশ্বরের হাতিয়ার হিসেবে তার একটি ঐশ্বরিক মিশন রয়েছে। ক্যাথলিক ফ্রান্সে তাকে ধর্মভ্রষ্ট বিবেচনা করায় ক্যালভিন জেনেভায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ওই সময় স্বাধীনতা লাভের জন্য নগরীটি শক্তিশালী বহিরাগত বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল। ১৫৩৬ সালে জেনেভা তিনটি বিস্ময় সৃষ্টিকারী চরম পদক্ষেপ গ্রহণ করে : রাজতন্ত্র উচ্ছেদ, গির্জার উৎসব বাতিল এবং পোপের কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান। ক্যালভিন নগরীর জন্য দৃঢ়ভাবে 'শাসন-সংক্রান্ত বিধানের' তথা প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মবেত্তাদের শাসনের তথা ধর্মতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নেন। এটা ছিল দৃশ্যত

ধর্মতান্ত্রিক ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনির পূর্ববর্তী নজির। জেনেভা নেতাদের সমর্থন লাভ এবং তার চার্চের মতবাদ ও সংস্থা গঠন করার ব্যাপারে তার কর্তৃত্ব আরোপ এবং জমায়েতের নৈতিক আচরণ প্রতিষ্ঠা নিয়ে ক্যালভিন ১৪ বছর পরিশ্রম করেন। আমরা এখানে পরবর্তীকালে সৌদি আরবের ওয়াহাবি চিন্তাধারার নীলনকশাই যেন দেখতে পাই। ক্যালভিন জেনেভায় 'ঈশ্বরের নগরী' প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ঘোষণা করেন সব সামাজিক বিধিবিধানের উৎস হবে বাইবেল, যা অনেকটাই সব আইনের উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআনকে গ্রহণ করার ইসলামি চিন্তাধারার মতোই। বস্তুত সৌদি আরবে পবিত্র কুরআনকেই দেশটির 'সংবিধান' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ক্যালভিনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সব উপাদান পুরোপুরি এসেছিল বাইবেল থেকে। পরবর্তীকালে ওয়াহাবিরা যেমনটা করেছিল, সেভাবেই ক্যালভিন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র, চার্চ ঘণ্টা এবং রঙিন পোশাক, শিল্পকর্মের ব্যবহারের বিরোধিতা করেন। চার্চ ঐতিহ্যে থাকা প্রায় সব ধরনের পবিত্র দিবস ও সন্ন্যাসী ভোজসভা পরিত্যক্ত হয়। ক্যালভিনের একটি মৌলিক বিষয় ছিল মানবজাতির পাপপূর্ণ ও পঙ্কিলতাপূর্ণতায় বিশ্বাস। কঠোর নৈতিক বিধিমালা আরোপ করা হয়েছিল। এগুলোর লঙ্ঘন ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ : ধর্মীয় বিধানের লঙ্ঘনের জন্য গির্জা থেকে বহিষ্কার ও সমাজচ্যুতি, ব্লাসফেমির জন্য মৃত্যুদণ্ড। সাদামাটা পোশাকই ছিল ড্রেস কোড। পানশালাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, থিয়েটার ও নৃত্যের অনুমতি ছিল না, গুপ্তচর দিয়ে সাধারণ লোকজনকে সার্বক্ষণিক নজরদারির মধ্যে রাখা হতো। 'নৈতিক পুলিশবাহিনী' (সৌদি আরবের মাতাওয়ার মতো) এলাকাগুলো চষে বেড়াত নৈতিক বিধিমালা সমুন্নত রাখা নিশ্চিত করতে। সব ধরনের জৈবিক আনন্দানুষ্ঠান গভীর সন্দেহের চোখে দেখা হতো।

ক্যালভিনের লক্ষ্য ছিল জেনেভাকে পৃথিবীর বুকে ঈশ্বরের রাজ্য এবং পাপ বা কলঙ্কহীন সম্প্রদায়ে পরিণত করা। ক্যালভিন ও তার আন্দোলন প্রটেস্ট্যান্ট রিফরমেশনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও তার দৃষ্টিভঙ্গি রিফরমেশনের লুথেরিয়ান শাখার চেতনার (যেখানে বাইবেল ও ঈশ্বরের বাণী ব্যাখ্যা ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের ওপর জোর দেয়া হতো) সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক ছিল। ক্যালভিনের নৈতিক ভিশন আরোপ করার জন্য ক্যালভিনবাদ স্বৈরতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করত। তিনি নিজে কঠোর, নিয়মানুবর্তী ও দৃশ্যত নিরানন্দ জীবন যাপন করতেন, সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগতেন।

জেনেভাবাসীর কোনো অংশের মধ্যে যত অসন্তোষই থাকুক না কেন, স্কটিশ প্রটেস্ট্যান্ট নেতা জন নক্স নগরীটিকে 'খ্রিষ্টের সবচেয়ে নিখুঁত ঘরানা' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। জেনেভা পরিণত হয়েছিল সারা ইউরোপে কার্যকর 'বিপ্লব রফতানি'র লক্ষ্যে ক্যালভিনবাদী নীতিমালার প্রশিক্ষণ ও মিশনারি কেন্দ্র। অল্প সময়ের মধ্যেই আন্দোলনটি গোপন বার্তাবাহক ও গুপ্ত সম্প্রদায় ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছিল, ইউরোপ এবং পরে আমেরিকায় নিজেকে বিস্তৃত করার মতো অবস্থা সৃষ্টি করেছিল।

জন ক্যালভিনের পুরোহিততান্ত্রিক-বিরোধী খ্রিষ্টধর্ম

আইন প্রণয়ন ও সামাজিক সংস্কার ভিত্তি হিসেবে ধর্মগ্রন্থের কঠোর ব্যাখ্যায় মৌলবাদী ইসলামও ছেয়ে আছে। বিশ্বাসের মৌলিক গ্রন্থগুলোতে প্রত্যাবর্তনে জোর দেয়া ওয়াহাবিবাদ ব্যাপকভাবে লুথেরিয়ানবাদ ও ক্যালভিনবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আন্দোলনটি পরে সব বিশ্বাসীর ধর্মকর্মের পক্ষে অবস্থান নেয়। ওয়াহাবি মতবাদও ধর্মগ্রন্থ ও ইবাদত-বন্দেগিতে আগের আমলে ধর্মীয় ব্যাখ্যা এবং এমনকি পারিবারিক ও সনাতন ধর্মীয় অনুশীলনের স্থায়ী পদ্ধতিগুলোও অন্ধভাবে অনুসরণে নিন্দা করে। এর বদলে এতে ধর্মগ্রন্থগুলোর ব্যক্তিগত উপলব্ধি অর্জন করার ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলিমের দায়দায়িত্ব থাকার ওপর জোর দেয়।

এতে অবশ্যই অন্ধভাবে সনাতনী ঐতিহ্য গ্রহণের বিপরীতে ব্যক্তিকে তার নিজস্ব বিশ্বাস এবং নৈতিক মূল্যবোধ ব্যক্তিগতভাবে, বিশ্লেষণ করে উপলব্ধি করার ব্যক্তির দায়দায়িত্বের ওপর জোর দেয়ার আলোকিত আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু রিফরমেশনের (এবং মৌলবাদী ইসলাম) অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, যখন ব্যক্তিরা নিজেদের ক্ষমতাবান এবং ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম বলে মনে করে, তখন বিকল্প, অনির্ভরশীল এবং এমনকি উদ্ভট দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটতে বাধাহীনভাবে চলা অব্যাহত রাখতে পারে। সিনিয়র ধর্মতত্ত্ববিদেরা (ক্যাথলিক বা ইসলামি) তখন ধর্মগ্রন্থের 'সঠিক' অর্থ প্রদানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। বস্তুত লুথেরিয়ানবাদে ধর্মবেত্তাদের নিয়ন্ত্রণ হারানো এবং ব্যক্তি বিশ্বাসীর কাছে কর্তৃত্ব ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি ধরে নেয়া হয়। আমরা এখানে ইব্রাহিমি ধর্মবিশ্বাসে অবতীর্ণ ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর স্থায়ী উভয় সঙ্কটে ফিরে যাচ্ছি : ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য কার আছে? প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠতা কে নির্ধারণ করবে? এ যাবৎকালের কোনো একক উৎসই পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়নি, দায়িত্বহীন এবং এমনকি বিপজ্জনক পরিণামসংবলিত সবার জন্য উন্মুক্ত ধর্মতত্ত্ব সহজেই উদ্ভব হতে পারে। ঠিক এমনটাই ঘটেছে রিফরমেশন এবং কিছু কিছু মৌলবাদী ইসলামি আন্দোলনে। মৌলবাদী ইসলাম এখানে কোনো অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে না, বরং অবতীর্ণ ধর্মগুলোর বিবর্তনের সম্ভাব্য রেখা ধরেই চলছে।

রিফরমেশনকালে কিংবা ওয়াহাবি চিন্তাধারার আবির্ভাবের সময়কালের মতোই ইস্যুটি এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে আরবের বাইরে অবস্থানকারী অনেক ধর্মবিশারদ 'ওয়াহাবি' ধরনের স্বাধীন চিন্তাধারাকে কলুষিত ধারা হিসেবে অভিহিত করে বলে থাকেন, সেগুলো স্থানীয় ঐতিহ্য ও উপলব্ধির সাথে সাংঘর্ষিক 'বাইরে থেকে আমদানি করা' বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করছে। খ্রিষ্টধর্মের মতোই ধর্মের কেন্দ্রীভূত 'প্রামাণ্য' উপলব্ধি এবং স্থানীয়, সনাতনী বা 'অপ্রামাণ্য' ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অকৃত্রিম উত্তেজনা রয়েছে। ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা হয়তো গ্রন্থের গভীরতর উপলব্ধির দিকে চালিত করবে, কিন্তু এতে অজ্ঞতাপূর্ণ চরম পন্থার অবাধ লাইসেন্স দিয়ে দেয়া হতে পারে।

রিফরমেশনে 'ধর্মীয় আদর্শগুলো বেপরোয়া চলতে পারার' আশঙ্কা দ্রুতই যৌক্তিক হয়ে পড়েছিল : প্রাথমিক প্রটেস্টান্টবাদ নানা উপমতের আকস্মিক বিস্তার প্রত্যক্ষ করে, অনেক সময় বাইবেল পাঠ নিয়ে বিপুল মতপার্থক্য নিয়ে। সব ধারণারই পরিণতি রয়েছে। নতুন নতুন ব্যাখ্যার ফলে সৃষ্ট চরমপন্থী নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক গ্রুপিং সহিংসতার দিকে ধাবিত হয় এবং অনেক সময়ই স্থানীয় শক্তিগুলো সেগুলো অন্য শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

দি (প্রটেস্টান্ট) ডিকশনারি অব ক্রিশ্চিয়ানিটির হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে ২০ হাজার ৮০০ ভিন্ন ভিন্ন প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায় রয়েছে; ওয়ার্ল্ড ক্রিশ্চিয়ান এনসাইক্লোপিডিয়া সংখ্যাটি অনেক বাড়িয়ে বলেছে ৩৩ হাজার ৮২০। সঠিক সংখ্যা কোনটি তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে তবে সংখ্যার বিশালতাই অনিবার্যভাবে রিফরমেশনের বপন করা বীজের ফলফলাদির প্রকাশ করছে। এটা চার্চের মতাদর্শ ও ক্রমপরম্পরা প্রশ্নে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হলে যে পরিণতির আশঙ্কা ক্যাথলিক চার্চ করেছিল, সেটিই পুরোপুরি যৌক্তিক করে তুলেছে।

আর ইসলামে বিশেষ করে সুন্নি শাখাটির অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো কেন্দ্রীভূত ধর্মতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণের কিংবা এমনকি পোপের মতো কোনো একক কর্তৃত্ববাদী কণ্ঠের অনুপস্থিতি। ফলে এক দিক থেকে এটি প্রটেস্টানবাদের মতো একই ধরনের সঙ্কটে পড়েছে। সুন্নি ইসলামে এমন একক কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, যিনি ইসলামের ব্যাখ্যার ব্যাপারে নিরঙ্কুশ বা বাধ্যবাধকতাপূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়ে কথা বলতে পারেন। কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব বিভাগের রেক্টর কিছু সম্মান পেয়ে থাকলেও তার বক্তব্য কোনো ধরনের প্রকৃত কর্তৃত্বের চেয়ে অনেক বেশি ঐতিহ্যমুখী এবং মিসরীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। কাতারে শীর্ষ মুসলিম ব্রাদারহুড রেসিডেন্ট স্কলার ইউসুফ আল কারজাবি সম্ভবত আলজাজিরার সাপ্তাহিক টিভি প্রোগ্রামে অন্য যেকোনো ব্যক্তিত্বের চেয়ে বেশি সম্মান পেয়ে থাকেন। এতে তিনি সমসাময়িক পরিবেশে ধর্মীয় ইস্যু প্রশ্নে শরিয়তনিষ্ঠ ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে থাকেন।

রিফরমেশন কয়েক শ' বছর আগে বহু চরমপন্থী গ্র"প সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ইসলামে ঐতিহাসিক কিছু প্রান্তিক গ্র"প বাদ দিলে, ২০ শতকের আগ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারায় সর্বব্যাপী চরমপন্থী ব্যাখ্যা আবির্ভূত হয়নি। এসব ধারণা যে বীজ বপন করেছিল, সেগুলো পরে আরো প্রান্তিক আকার ধারণ করে আলকায়েদার মতো চরমপন্থী গ্র"পের সৃষ্টি করেছে। মিসরের চরমপন্থী গ্র"প তাকফির ওয়াল হিজরা (আক্ষরিকভাবে অন্যদের অবিশ্বাসী হিসেবে নিন্দা করে এবং দূষিত পৃথিবী থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চায়) চিন্তাধারায় পুরোপুরি ক্যালভিনবাদীদের মতো, যদিও ক্যালভিনবাদ সন্ত্রাসবাদের অনুশীলন করেনি। এ উপদলটি প্রচার করে যে, এই পৃথিবীতে সত্যিকারের ইসলাম আছে সামান্যই এবং ব্যক্তিবিশেষের কাছে একমাত্র যে পথ খোলা আছে তা হলো সমসাময়িক মুসলিম সমাজকে 'অজ্ঞতাপূর্ণ' বা অবিশ্বাসী হিসেবে প্রকাশ্যে বর্জন করা কিংবা বিশেষ সত্যনিষ্ঠ সমাজে আশ্রয় গ্রহণ (ক্যালভিনের মতো ঈশ্বরের নগরীতে) কিংবা আরো সাধারণভাবে নিজের মধ্যে বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা অনুসন্ধান এবং সমাজের দুর্নীতি সৃষ্টিকারী কর্তৃত্বগুলোর বিরুদ্ধে সক্রিয় হওয়া।

আর এই ধর্মীয় প্রচারকাজের টার্গেট কে? অবাক করা বিষয় হলো, খ্রিষ্টান ও মুসলিম উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্য কিন্তু অন্যান্য ধর্ম থেকে ধর্মান্তর নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামপন্থীর দাওয়া বা মিশনারি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় অন্য মুসলমানদের বদলানোর জন্য, যাদের ইসলামি বিশ্বাসকে ত্র"টিপূর্ণ বা অশুদ্ধ বিবেচনা করা হয়; তারা তাদের সত্য বিশ্বাসে ফিরিয়ে আনতে চায়। এসব মৌলবাদীর অনেকের দৃষ্টিতে সমসাময়িক মুসলিম বিশ্ব গভীরভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত, নৈতিক পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং এমনকি জাহেলি বা 'অজ্ঞানতাপূর্ণ' (এই পরিভাষাটি মূলত ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। এ দিয়ে বোঝানো হয়, ইসলামের আগে সমাজটি ছিল অজ্ঞ) হিসেবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। বিশ শতকের মধ্যভাগে মিসরের ইসলামি চিন্তাবিদ সাইয়েদ কুতুব এই পরিভাষাটির নতুন ব্যাখ্যা দিতে সমসাময়িক মুসলিম সমাজের সার্বিক অবস্থা বোঝাতে ব্যবহার করেন। কারণ, তার দৃষ্টিতে বর্তমান মুসলিম সমাজ সত্য ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার চোরাবালিতে ডুবে গেছে।

রিফরমেশনকালের তিনটি প্রধান প্রটেস্ট্যান্ট ধারার মধ্যে সবচেয়ে চরমপন্থী ছিল সম্ভবত অ্যানাব্যাপিস্টরা। তারা অনেক ইসলামপন্থীর মতোই মিশনারিকার্যক্রমের প্রতি দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্র"তিবদ্ধ ছিল। অ্যানাব্যাপ্টিস্টবাদের আক্ষরিক অর্থ ছিল 'নতুন করে ব্যাপ্টাইজ হওয়া'। এ ধারণা অনুযায়ী ব্যাপ্টাইজ হওয়ার কোনো অর্থ হয় না, যদি না এটি দিয়ে প্রাপ্তবয়স্কের ঈশ্বরের সাথে নতুন ও ব্যক্তিগত সচেতন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত না বোঝায়। অ্যানাব্যাপ্টিস্টরা প্রাপ্তবয়স্কদের 'আবার ব্যাপ্টাইজ' করার আহ্বান জানায়, এতে তারা এবার তাদের ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্তের প্রকৃতির ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন থাকবে। অ্যানাব্যাপ্টিস্টদের মূল বিষয়ও হলো ব্যক্তির ক্ষমতায়ন এবং নির্দিষ্ট পরম্পরায় ধর্মীয় অনুশাসন (যা সাধারণত পারিবারিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই

গ্রহণ করা হয়ে থাকে) পালন করে যাওয়ার ধারণার প্রত্যাখ্যান। আর একইভাবে অনেক ইসলামি মৌলবাদীর কাছেও সামাজিক পরিবেশের মাধ্যমে ধর্মের উত্তরসূরি হওয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা নয়; ধর্মগ্রন্থের ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে যারা মুসলিম হিসেবে তাদের নবলব্ধ প্রত্যয় উপলব্ধি করতে পারবে, তারাই সত্যিকারের মুসলমান হিসেবে বিবেচিত হবে। আবার ইসলামি মৌলবাদীদের মতো অ্যানাব্যাপ্টিস্টরাও ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে তাদের বিপুল জ্ঞানের জন্য খ্যাতিমান ছিল। এ অধ্যায়ের শুরুতে ১৮ মাস স্থায়ী মুনস্টার বিদ্রোহের মাধ্যমে অ্যানাব্যাপ্টিস্টদের চরমপন্থার চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

একই ধরনের সামাজিক পরিবেশ বিভিন্ন সমাজে একই ধরনের ধর্মীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে। ওই সময়ে ধর্মতত্ত্বের ওপর সর্বাত্মক মনোযোগ থাকায় এর রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি রিফরমেশনকে পরিচালিত করেছিল। এটি ছিল মহাপরিবর্তনের সময় : সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচারে সম্পৃক্ত সামন্তবাদী-ব্যবস্থা টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়ায় যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে নতুন বুর্জোয়াদের উদ্ভব এবং ব্যক্তির অধিকারের সচেতনতা ঘোষণা ত্বরান্বিত করেছিল। এসব পরিবর্তন সামন্তবাদী শক্তিগুলো প্রতিরোধ করেছিল, নিজ নিজ লাভক্ষতি বিবেচনা করে অনেক সময় রাজপুরুষেরাও প্রতিরোধ করেছেন, অনেক সময় করেননি। সদ্য আত্মপ্রকাশ করা রাষ্ট্রগুলো চার্চের অর্থসম্পদ এবং সেগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ চাইল। সর্বোপরি রিফরমেশন জার্মান রাজপুরুষ এবং উত্তর ইউরোপের অন্য শাসকদের জন্য বিপুল ও পরিকল্পিত রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বয়ে এনেছিল। আপনি কোথায় রিফরমেশনের ধর্মতত্ত্বকে সমর্থন করবেন, সেটি নির্ভর করেছিল আপনার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ কোথায় নিহিত তার ওপর।

আমরা এমনটিই দেখতে পাই পরিবর্তনশীল মক্কার গোলমেলে পরিস্থিতিতে। গোত্রবাদী থেকে ব্যাপকতর বাণিজ্যিক মূল্যবোধে পরিবর্তন এবং আরো সনাতনী গোত্রীয় নিরাপত্তা বলয়ের ক্ষতি এবং (হজরত) মুহাম্মদ সা:-এর আবির্ভাব। যিশুও এমন এক নতুন সামাজিক পরিবেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যেখানে আরো অনেক কিছুর সাথে, গ্যালিলি ছিল জেরুসালেমের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় শক্তির প্রতি বৈরী।

এসব কিছুর মধ্যকার অভিন্ন থিম হলো রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির মধ্যকার সম্পর্ক : রাষ্ট্র যখন মতাদর্শের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায় তখন কী ঘটে। আমরা প্রায় সব জায়গায় রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনায় জনগণের অংশগ্রহণের একই ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দেখি, বিশেষ করে পরিস্থিতি খারাপ হলে অনেক সময় চরমপন্থার বিকাশ ঘটে।

মহা ধর্মত্যাগ

খ্রিষ্টান চার্চের ভিত্তির ওপর এ যাবৎকালের সবচেয়ে চরম ও প্রবল আঘাত হলো ‘মহা ধর্মত্যাগ’। এটি একগুচ্ছ ধারণা। ছোট্ট তবে স্পষ্টভাষী ও সোচ্চার একটি সংখ্যালঘু দলের চিন্তাভাবনাকে আচ্ছন্নকারী এসব ধারণা খ্রিষ্টান সম্প্রচার ও প্রকাশনায় ব্যাপক প্রচার লাভ করে। এই মতবাদে চার্চের মূল প্রতিষ্ঠানকে একেবারে প্রায় সূচনা থেকে নিন্দা করা হয়, এর বিরুদ্ধে সাহসী ও নানামুখী অভিযোগ উত্থাপন করা হয় :

চার্চের মূল শিক্ষা ও অনুশীলন একেবারে প্রথম থেকে, এমনকি সম্ভবত কোনো কোনো যিশু-শিষ্যের জীবনকাল থেকেই চরমভাবে বিকৃত, পরিবর্তিত এবং এমনকি কলুষিত হওয়া শুরু করে; খ্রিষ্ট ধর্মের মূল নীতিমালার পক্ষে অবস্থান গ্রহণকারীদের নির্যাতন ও বহিষ্কার করে চার্চ এসব ত্র“টি বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে।

রোমান সাম্রাজ্যের খ্রিষ্টধর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে চার্চ জাগতিক দুর্নীতির অপ্রতিরোধ্য পথে নামতে শুরু করে; এই ঘটনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে চার্চের মিলন ঘটায় এবং রাষ্ট্র তার নিজের স্বার্থে চার্চ এবং এর মতাদর্শকে ব্যবহার করে। চার্চ কেবল মারাত্মক ভুলই করেনি, সেই সাথে এ ব্যাপারে পরিবর্তন বা সংস্কার করতে মৌলিকভাবে অসমর্থও ছিল। চার্চ তার ত্র“টি আরো বাড়িয়ে তোলে, যখন সে মতাদর্শ ইস্যু প্রশ্নে চার্চীয় অভ্রান্ততার মতবাদ উপস্থাপন করে এবং তার পর আবার যখন চার্চ এই চার্চীয় অভ্রান্ততার মতবাদ খোদ পোপের কাছে দিয়ে দেয়। বাস্তবতা হলো চার্চ (ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয়েই) শেষ সময়ের আগে কখনো অভ্রান্ততা নিয়ে কথা বলতে সমর্থ হবে না। ‘মানবিক দুর্বলতার কারণে সহজাতভাবেই বস্তুবাদী, জাঁকজমকপূর্ণ, শাস্ত্রাচারে ভরপুর, পৌরষময়, বহু ঈশ্বরবাদী এবং জাদুকরি চিন্তাভাবনায় আচ্ছন্ন ভুয়া ধর্ম গঠনের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং ঈশ্বরের কাজের (ঐশ্বরিক মহানুভবতা) চেয়ে ওইগুলোর দিকেই মানুষ বেশি আগ্রহী থাকে বা বেশি বাস্তব মনে করে।’ মানুষ বাইবেলের লিখিত ভাষ্যের মতোই ঐতিহ্য গ্রহণ করতে আগ্রহী থাকে।

এসব ধারণা বৈপ্লবিক এমনকি বিভিন্ন চরমপন্থী প্রটেস্ট্যান্ট চিন্তাধারার নানা সমন্বয়ে (এগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সময়ের অ্যানাব্যাপ্টিস্ট, চার্চ অব জেসাস ক্রাইস্ট অব লেটার-ডে সেইন্টস, অ্যাডভেন্টিস্ট ও জোহোভাস উইনেসেস) চার্চের ধ্বংসকামী সমালোচনার প্রতিনিধিত্ব করে। ক্ষমতার মাধ্যমে, ধর্মের কলুষতার সরাসরি অভিযোগ চার্চের মৃত্যু মর্যাদাহানির চিন্তাভাবনাকেও প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দেয়। মজার ব্যাপার হলো, ক্লাসিক শিয়া বাণীও একই বিশ্বাসের কথা বলে : রাষ্ট্র ও ক্ষমতার সাথে ধর্মবেত্তাদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সত্য ধর্মে দুর্নীতি অনিবার্য (যদিও সমসাময়িক ইরানের মতাদর্শে তা লঙ্ঘিত হয়েছে)। বর্তমানে চরমপন্থী সুন্নি ইসলাম মুসলমানদের নিজেদের মতো করে চিন্তা করার আহ্বান জানায়, এমনকি রাষ্ট্রের ইসলামি বৈধতা না থাকলে রাষ্ট্রকেও প্রতিরোধের আহ্বান জানায়। কিন্তু এটা সুন্নি ইসলামে তুলনামূলক নতুন বিষয় এবং অন্যায় ও অবৈধ সরকারকে উৎখাত করার বাধ্যবাধকতাপূর্ণ জেফারসনিয়ান মতবাদের মতোই।

পুনর্গঠনবাদ

চরমপন্থী খ্রিষ্টান চিন্তাধারার আরেকটি শাখা পুনর্গঠনবাদীরা যে প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে তা হলো : সামাজিক-ব্যবস্থার মধ্যে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করতে শক্তিপ্রয়োগ কতটুকু যথাযথ? রাষ্ট্রের মূল অস্তিত্বে (সংজ্ঞা অনুযায়ী) সমাজ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং নৈরাজ্য প্রতিরোধে শক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। তবে কতটুকু মাত্রার বলপ্রয়োগ প্রয়োজন এবং কোন কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে এবং কে তা আরোপ করবে সেটাই কেবল অজানা। এখানে ধর্মীয় প্রশ্নের মতোই সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ও রয়েছে। কারণ, সব রাষ্ট্রই খুন, অপরাধ, দুর্বৃত্তায়ন, চুরি এবং শিশুদের সাথে যৌনতার মতো সামাজিক নৈতিকতার নির্দিষ্ট উপাদান নিয়ে আইন প্রণয়ন করে।

সামাজিক, ধর্মীয় বা সেকুলার যেকোনো ধরনের সংস্কারকের জন্য রাষ্ট্র একটি আকর্ষণীয় টার্গেট। কারণ এটির দখল সমাজের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ আরোপ ও বাস্তবায়নের হাতিয়ার (প্ররোচিত করে বা নির্যাতন চালিয়ে) যোগান দেয়। তবে মূল্যবোধ যে কেবল ধর্মই হবে এমনটি অনিবার্য নয় : লেনিনবাদীরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমাজতান্ত্রিক-ব্যবস্থা বাস্তবায়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে রাষ্ট্র দখলকে দেখেছিল। অনেক ইসলামপন্থীও, বিশেষ করে আগের সময়কালে, সত্যিকারের ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামি রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে প্রবল উৎসাহী ছিলেন। সময়ের পরিক্রমায় এই ধারণাটির গ্রহণযোগ্যতা কমতে থাকে, ইসলামপন্থীদের অনেকে অভিজ্ঞতার আলোকে পাপের শাস্তি দেয়ার ভারটি রাষ্ট্রের নয়, আল্লাহর কাছেই প্রদান করার দিকে ঝুঁকে পড়েন। জনৈক তুর্কি ইসলামপন্থী আমাকে বিষয়টি বলেছেন এভাবে : 'দোজখের দরজা বন্ধ করে রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের নয়, এসব দরজা সবার জন্যই অবাধ আর খোলা রাখা উচিত।'

খ্রিষ্টধর্মের, বিশেষ করে পাশ্চাত্যে, কিছু উপাদানও একই ধরনের মনোভাব পোষণ করে। গত শতাব্দীজুড়ে একটি 'পুনর্নির্মাণ' আন্দোলন আবির্ভূত হয়েছে যেটা আবারো খ্রিষ্টান মূল্যবোধের ভিত্তিতে সত্যিকারের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তত্ত্বে বিশ্বাস করে। অনেক মুসলমান যেভাবে পবিত্র কুরআনকে আইন প্রণয়নের উৎস বিবেচনা করে, ঠিক তেমনি খ্রিষ্টান পুনর্নির্মাণবাদীরা মার্কিন সংবিধান নয়, বরং বাইবেলকেই যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যতের নির্দেশিকা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করে। পারিবারিক,

সমাজ ও বেসামরিক সরকারের জন্য আইনের ভিত্তি হওয়া উচিত বাইবেল থেকে নেয়া নৈতিক নীতিমালা। তাদের এই মনোভাবে জেনেভায় ক্যালভিনের ছায়াই প্রতিফলিত হয়। অনেক পুনর্নির্মাণবাদী এমন যুক্তিও দেখান, সরকারের দায়িত্ব থাকা উচিত খ্রিষ্টান ধর্মবেত্তাদের হাতে, তথা দেশ পরিচালনার ভার থাকা উচিত ধর্মবেত্তাদের ওপর, ঠিক যেমন আছে ইরানের ধর্মীয় রাষ্ট্রে। সরকারও হওয়া উচিত ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের নৈতিক বিধিবিধানের আওতাভুক্ত। কোনো কোনো পুনর্নির্মাণবাদী গর্ভপাত ও সমকামিতাকে আবার অপরাধ হিসেবে গণ্য করাকে সমর্থন করে। তারা অবশ্য এসব অপরাধের জন্য বর্তমানে মৃত্যুদণ্ডের কথা না বললেও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, ওল্ড টেস্টামেন্টে যে প্রায় ২০টি অপরাধকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য বলা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অজাচার, পতিতাবৃত্তি, ব্যভিচার, ঈশ্বর অবমাননা, সাবাত ভঙ্গ এবং এক ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনো দেবতার উপাসনা করা। খ্রিষ্টান ধর্ম অস্বীকারকারীদের সাথে আপস করে উন্নতি করা যাবে না, কারণ তাদের যুক্তি হলো, আমরা অভিন্ন কোনো অবস্থান স্বীকার করি না। বহুত্ববাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সেগুলো বাইবেলের সাথে সম্পর্কহীন নীতিনৈতিকতার অনুসারীদের সাথেও সহযোগিতা নির্দেশ করে।

অনেক মুসলমান যেমন মনে করে, এক দিন ইসলাম (স্রেফের মতাদর্শগত শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই) সমগ্র মানবজাতির একমাত্র ধর্মে পরিণত হবে, ঠিক সেভাবেই পুনর্নির্মাণবাদীরাও বিশ্বাস করে, এক দিন সবাই খ্রিষ্টধর্মকেই স্বীকার করে নেবে এবং এর মাধ্যমে বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তার করবে খ্রিষ্টধর্ম। শক্তিপ্রয়োগ অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রয়োজনীয় এবং দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী; খ্রিষ্টধর্ম এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

পুনর্নির্মাণবাদীরা সহিষ্ণুতাকে এমন কোনো সহজাত ধারণা বলে স্বীকার করে নেয় না যে, আইনের কাছে সব ধর্মীয় বিশ্বাস সমান বৈধ। এর বদলে তারা 'খ্রিষ্টান সহিষ্ণুতার' কথা বলে, যাতে সমান সুযোগ অনুমোদন করলেও সব মতাদর্শ সমান গ্রহণযোগ্য নয়। পুনর্নির্মাণবাদীরা ব্যক্তিগত বিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে না চাইলেও জনসাধারণের কার্যক্রম ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে আগ্রহী। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ইসলামপন্থীর সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, তারা একইভাবে শরিয়াহ আইনের প্রচলন চায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামি রাষ্ট্রে সহিষ্ণুতা বলতে বোঝাবে কেবল এটুকু রাষ্ট্র অন্যান্য বিশ্বাসের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে, তবে সব মতাদর্শ একই রকম বৈধতা পাবে না।

স্বঘোষিত পুনর্নির্মাণবাদীদের সংখ্যা খ্রিষ্টানদের মধ্যে খুবই কম। তবে 'খ্রিষ্টান রাইট'-এর ব্যাপারে তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সার্বিকভাবে ব্যাপক প্রভাবশালী এবং 'ডোমিনিয়নিজম' হিসেবে আরো বড় ধারার সৃষ্টি করছে।

সমাজতত্ত্ববিদ সারা ডায়মন্ডের মতে, 'ডোমিনিয়নিজম'-এর মূল ধারণায় বলা হয়, 'বাইবেলের নির্দেশনা অনুযায়ী খ্রিষ্টের প্রত্যাবর্তনের আগপর্যন্ত খ্রিষ্টানরাই কেবল সব সেকুলার প্রতিষ্ঠান দখল করার অধিকারপ্রাপ্ত।' খ্রিষ্টধর্মের এই সংস্করণটি ধর্মের এলাকা থেকে অবতরণ করে সেকুলার এলাকায়, এমনকি জাতীয়তাবাদের এলাকায়ও প্রবেশ করছে। গবেষক ফ্রেডেরিক ক্লার্কসন 'ডোমিনিয়নিজম'কে 'খ্রিষ্টান জাতীয়তাবাদ' প্রচার হিসেবে অভিহিত করেন। তার মতে, এই মতবাদ যুক্তরাষ্ট্রকে 'খ্রিষ্টান জাতি' হিসেবে এর মর্যাদায় ফিরে যাওয়ার তাগিদ দেয়, যেখানে 'টেন কমান্ডমেন্টস' আইনব্যবস্থা ও সরকার পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা পালন করবে। 'খ্রিষ্টান প্রেম প্রেম'-বিষয়ক বইপত্র রয়েছে প্রচুর।

যুক্তরাষ্ট্রে এসব খ্রিষ্টান আন্দোলন ঘিরে তীব্র বিতর্ক রয়েছে, তাদের অনেক সমালোচক তাদের বিরুদ্ধে 'খ্রিষ্টান সর্বগ্রাসবাদ' চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টার যে অভিযোগ আনে, তারা তা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে। এই বিতর্ক ইসলামি আন্দোলনের মধ্যেও দেখা যায়। এখানে খ্রিষ্টান নয়, মুসলিম দেশে সংস্কার বা 'ইসলামীকরণ' বাধ্যতামূলক করার দাবি ওঠে।

পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে 'ধর্ম সম্পর্কে কোনো জবরদস্তি নেই' (লা ইকরা ফিদ্দিন; কুরআন ২:২৫৬) বক্তব্যের মাধ্যমে একেবারে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য দিয়েছে। একই সময় ইসলামের সমালোচকেরা যথাযথভাবেই উল্লেখ করেছেন, পবিত্র কুরআন বলে একটা আর সামাজিক অনুশীলন বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো স্থান থেকে স্থানে থাকে অন্যটা। পবিত্র কুরআনে অনেক পারস্পরিক সাংঘর্ষিক আয়াত রয়েছে, এগুলোর প্রতিটিই বিভিন্ন সময়ে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে নাজিল হওয়ার বিষয়টি প্রতিফলিত করে। যারা ধর্মগ্রন্থের কঠোর বা অসহিষ্ণু ব্যাখ্যা অন্যদের ওপর আরোপ করতে চায়, তারা সবসময় তা করার ব্যাপারে প্রচুর ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি খুঁজে পান। কিংবা লুথারের যে বক্তব্যটি বিখ্যাত হয়ে আছে : 'শয়তানও তার পক্ষে ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারে।'

এমনকি রিফরমেশনের সময়ও প্রখ্যাত চিকিৎসক, ধর্মতত্ত্ববিদ ও বিজ্ঞানী মাইকেল সারভেটাসের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি নাটকীয় ঘটনায় ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং ইসলামের সাথে খ্রিষ্টান সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি ত্রিত্বের প্রকৃতি নিয়ে ক্যালভিনের সাথে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন : সারভেটাস যুক্তি দিয়েছিলেন, যিশু ও পবিত্র আত্মা স্বাধীন কোনো অস্তিত্ব নয়, বরং কেবল ঈশ্বরের প্রকাশ; যা আসলে পুরনো কাহিনী। কিন্তু সারভেটাস অগ্রসর হয়ে এটাও ঘোষণা করলেন, খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্বে ত্রিত্বের ধারণাটি মুসলিম ও ইহুদিদের সাথে খ্রিষ্টান সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় প্রবল বাধা হয়ে আছে। এক ক্যাথলিক প্রসিকিউটর তার বিরুদ্ধে 'ইহুদি ও তুর্কিদের' প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনের অভিযোগ আনেন, তাকে পবিত্র

কুরআন পাঠের জন্য অভিযুক্ত করেন। ১৫৫৩ সালে জেনেভায় সাভেটাসকে প্রকাশ্যে বেঁধে পুড়িয়ে মারেন ক্যালভিন। বর্তমানে সারভেটাসকে প্রথম ইউনিটারিয়ান আত্মদানকারী বিবেচনা করা হয়।

আধুনিক রাজনৈতিক ইসলামে খ্রিষ্টান ছায়া

রিফরমেশনের এসব রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সঙ্ঘাত খ্রিষ্টধর্মের প্রাথমিক দিনগুলোতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করা থিমগুলোকে উচ্চকিত করেছে। প্রাথমিক সময়কার ধর্মভ্রষ্টতার ইস্যুগুলো ১৬ শতকে আরো শক্তিশালী আকারে আবির্ভূত হয়। তবে এবার উদীয়মান ইউরোপিয়ান নগরকেন্দ্রগুলোর নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্দেশনায়, সমৃদ্ধিশালী বণিকতান্ত্রিক কার্যক্রম, নতুন জাতীয়তাবাদ এবং নবগঠিত জাতিরাষ্ট্র ও শাসকদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষে চালিত হয়ে। ইসলামও একই ইস্যুগুলো আঁকড়ে ধরায় সব ধর্ম এসব বিষয়ে বাধ্যগত প্রকৃতির বলেই ইঙ্গিত দেয় আমাদেরকে। আর এসব সংগ্রাম সংগঠিত হচ্ছে মুসলিম বিশ্ব যখন প্রবল চাপ ও নিপীড়িত হওয়ার সময়। ধর্ম ও রাজনৈতিক শক্তির মধ্যকার সম্পর্ক, নৈতিকতায় জবরদস্তিমূলক ভূমিকা, রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ ও সরকার পরিচালনায় নৈতিক মূল্যবোধের বাস্তবায়নজনিত উভয় সঙ্কটে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত সব ধর্মই পড়ে। যদিও যখন রাষ্ট্র বা সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে, তখন ধর্মীয় মূল্যবোধের নামে রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করা এবং সংস্কারের দাবিতে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে শিগগিরই ব্যবহৃত হতে পারে ধর্ম।

আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি, কিভাবে ধর্মীয় মতবাদের নিয়ন্ত্রণ লাভের সংগ্রামটি ছিল ক্ষমতার সংগ্রামের অনিবার্য উপাদান। রিফরমেশন পাশ্চাত্যে ওই সংগ্রামের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। অতীতে ইসলামি ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা কখনোই আসলে পাশ্চাত্যে খ্রিষ্টধর্ম যেভাবে ৫০০ বছর ধরে করেছে সেভাবে রাষ্ট্র শক্তির নেতৃত্ব ও নীতিনির্ধারণ করতে পারত না। এখন ইসলামে ‘সংস্কারের’ ফলে কাহিনীটি বদলে গেছে। আধুনিক মৌলবাদীদের আত্মপ্রকাশে ইসলাম আর রাষ্ট্রের আওতাবহির্ভূত কিছু নয়; ভালো হোক আর মন্দ হোক, ‘অপেশাদার’ ধর্মবেত্তারা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি সোচ্চার ও প্রভাব বিস্তার করে। এসব স্বশিক্ষিত ধর্মতত্ত্ববিদ ইসলামের রক্ষক হিসেবে রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করে। একটি প্ল্যাকার্ডে এ কারণেই লেখা রয়েছে : ‘এটি তোমার ইসলাম নয়, আমার ইসলাম।’ প্রশিক্ষিত বা প্রশিক্ষণহীন এই মৌলবাদীরাই ইসলাম এবং প্রাসঙ্গিক অংশ ব্যবহার করতে চাইছে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রকে বদলাতে কিংবা উৎখাত করতে যা ইসলামের জন্য কল্যাণকর নয়, জনগণের জন্যও নয়।

তা–ই বর্তমান মৌলবাদী ইসলামের দিকে তাকানোর সময় আমরা মধ্যপ্রাচ্যের কিছু অদ্ভুত ধর্মীয় পণ্য দেখছি না। ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্ম একই শক্তির সক্রিয় থাকার সমান্তরাল থাকার বিষয়টি প্রকাশ করছে, যা ক্ষমতার সাথে সহাবস্থান করার প্রয়াসে বেশির ভাগ ধর্মের বিবর্তনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগে, এটা বিস্ময়কর নয় যে 'জনগণ' তাদের ধর্মের নিয়ন্ত্রণ ইতিহাসের বেশির ভাগ সময় থাকা এলিট বা রাষ্ট্রের হাত থেকে কেড়ে নিতে চাইছে। ইসলাম না থাকলে এই একই জিনিস মধ্যপ্রাচ্যের ইস্টার্ন অর্থোডক্সেও ঘটত। এসব হলো 'ইসলামি রিফরমেশনের' বৈশিষ্ট্য। ভালো হোক আর খারাপ হোক।

দ্বিতীয় খণ্ড

ইসলামের সভ্যতাগত সীমান্তগুলোতে মিলন

স্যামুয়েল হান্টিংটন তার গ্রন্থ দ্য ক্ল্যাস অব সিভিলাইজেশন্সে অশোভন পরিভাষা 'ইসলামের রক্তাক্ত সীমান্ত' ব্যবহার করেছেন। সার্বিকভাবে রক্তাক্ত বিশ্বে এটা মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, কোনো সীমান্তকে রক্তাক্ত করতে হলে সাধারণভাবে দু'টি দেশের প্রয়োজন। আমরা এখন ইসলামকে তার মধ্যপ্রাচ্যের জন্মভূমি থেকে দূরে সরিয়ে নিতে যাচ্ছি, আর দেখতে চাচ্ছি চারটি প্রধান সংস্কৃতির (রাশিয়া, ইউরোপ, ভারত ও চীন) সংস্পর্শে এসে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল সহাবস্থান প্রতিষ্ঠায় কেমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

প্রথমত, আমি 'ইসলাম' পরিভাষাটির স্বাভাবিক ব্যবহার থেকে অল্প একটু পেছনে যাবো এটা উপলব্ধির চেষ্টা করব যে, ধর্মটি বিস্তারের সময় আমরা আসলে মুসলমান সম্পর্কে কথা বলছি– তারা কী ভাবত, বলত ও করত এবং অমুসলিম সংস্কৃতির সাথে তারা কিভাবে সম্পর্কিত হয়। মুসলমানেরা কিভাবে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মকে দেখে এবং এ নিয়ে তৎপর থাকে সেটা অন্যরা ইসলামকে কী বিবেচনা করে তার চেয়ে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সবশেষে ইসলাম হলো তা-ই, যা মুসলমানেরা করে এবং এ নিয়ে তাদের তৎপরতা। সেটা অনেক ভিন্ন বিষয় হতে পারে।

প্রধান কয়েকটি অমুসলিম সমাজের সাথে মুসলমানদের মেলামেশার বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে আমরা ইসলাম কিভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ করে, এর নমনীয়তা এবং এর বিচিত্র রূপ আরো ভালোভাবে বুঝতে পারব। এসব মিথস্ক্রিয়া দেখার সময় আমরা আবারো উল্লেখ করব, ধর্মীয় মতবাদ প্রায় কখনো ঝুঁকিতে ছিল না, তবে জাতি ও সম্প্রদায় ছিল। মুসলমানেরা কি এসব অমুসলিম সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অদম্য বৈরিতা এবং ধর্মীয় যুদ্ধের ভঙ্গি প্রদর্শন করে চলেছে? নাকি সম্ভবত শীতল যুদ্ধবিরতি বা সম্ভাব্য সহাবস্থান? কিংবা তারা অমুসলিম সংস্কৃতিগুলোর সাথে অভিন্ন স্বার্থ একইভাবে গ্রহণ করেছে?

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'ইসলামের সীমান্ত' সংক্রান্ত বিষয়গুলো আসলে সীমান্ত-সম্পর্কিত নয়, বরং অনিবার্যভাবে সংখ্যালঘু হিসেবে অমুসলিম সংস্কৃতিগুলোর অভ্যন্তরে মুসলিমবিষয়ক ব্যাপার। অমুসলিম শক্তির সাথে বাস করার একেবারে প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানেরা সৃষ্টিশীল সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। অবশ্য তারা একটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি থেকে কখনোই বিচ্যুত হয়নি : এসব রাষ্ট্রের মধ্যে ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে অটুট ও সুরক্ষিত রাখা। এর মানে হলো, তাদের মুসলিম পরিচিতি ত্যাগ করতে অনাগ্রহ কিংবা সাংস্কৃতিকভাবে এত বেশি সম্পৃক্ত ও মিলেমিশে যাওয়া যে সংস্কৃতি হিসেবে লোপ পেয়ে যায়। এর মানে এই নয় যে, তারা তাদের সমাজে সক্রিয় ও সম্পৃক্ত নাগরিক হিসেবে পুরোপুরি একীভূত হবে না। ইহুদিরা তাদের পুরো ইতিহাসে তাদের সম্প্রদায়কে সুরক্ষা করা, তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সহজাত গুণসম্পন্ন সংস্কৃতির অনন্যতা বজায় রাখার পাশাপাশি একীভূত হওয়া, শোষিত হওয়া এবং বিলীন হওয়া সচেতনভাবে প্রতিরোধে সংগ্রাম করার জন্য একই অভিজ্ঞতার মুখে পড়েছিল। আমরা দেখতে পাবো, মুসলমানেরা সমাজে সহাবস্থান এবং এমনকি সাংস্কৃতিক বিনিময় করেছে, যা অনেক সময় চেতনার দিক থেকে প্রবল বহুসাংস্কৃতিক মাত্রার ছিল না। আমরা এই চারটি ঘটনা পরীক্ষা করার সময় খাপ খাওয়ানো, মিশে যাওয়া, অনেক সময় হুমকি প্রতিরোধ করা, তবে অমুসলিম সমাজে তাদের মুসলিম সংখ্যালঘুর বাস্তবতা সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক স্বীকারোক্তির মতোই নানা ধরনের মুসলিম কৌশল উপলব্ধি করতে পারব।

তবে সীমান্ত নিয়ে হান্টিংটনের ব্যবহৃত পরিভাষাটি কোনোভাবেই পুরোপুরি ভুল নয়। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন (যদিও প্রথমবার তা করেননি) যে, ইতিহাসজুড়ে 'সভ্যতা' বস্তুত তাৎপর্যপূর্ণ বিভেদরেখার প্রতিনিধিত্ব করেছে। বিভেদরেখা যেকোনো ধরনেরই হোক না কেন, আসলেই সীমানা যা হঠাৎ করে সঙ্ঘাতে জ্বলে উঠতে পারে : সেগুলো কোনো গোত্রের মধ্যে, কোনো গ্রামে, কোনো অঞ্চলে, কোনো দেশে বা দেশ বা সভ্যতাগুলোর মধ্যেও হতে পারে। 'সভ্যতা' আসলে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একধরনের সম্প্রদায়।

একটি সভ্যতা বা সম্প্রদায় কতটা সঙ্ঘবদ্ধ থাকে? এটা নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর, কারণ নির্দিষ্ট ধরনের চাপের মুখে প্রায় সব সম্প্রদায়ই ছোট ছোট উপাদানে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সম্প্রদায়গুলোর মধ্যকার সীমানা তৈরি করে কোন জিনিসটা- এবং সেগুলো কতটা স্থির থাকে? এটা অত্যন্ত পরিস্থিতিগত বিষয়। একটা পুরনো প্রবাদ বিষয়টি বেশ খোলাসাভাবে তুলে ধরেছে : 'আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে আমি, আমি আর আমার ভাই আমার কাজিনের বিরুদ্ধে, আমি, আমার ভাই আর আমার কাজিন অন্য গোত্রের বিরুদ্ধে।' এসব কিছুই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ মুসলমানদের প্রতিবার সাড়া দেয়ার জন্য বাধ্যতামূলক সীমা নির্দেশ করে না ইসলাম। যুদ্ধরেখা বরাবর একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে টিকে থাকা প্রকৃত সম্প্রদায়গুলোর পরিণতি হতে পারে। একটি পরিস্থিতিতে তা হতে পারে মুসলিমদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান কিংবা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমান; তবে তা শিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে

সুন্নি মুসলমানও হতে পারে। কিংবা তুর্কি মুসলমানরা থাকতে পারে কুর্দি মুসলমানদের বিরুদ্ধে। কিংবা ইরাকি শিয়া মিলিশিয়াদের বিভিন্ন গ্র"পের মধ্যেও হতে পারে। সংহতির ইউনিট অব্যাহতভাবে বদলে যেতে থাকে ঠিক যেমন হয় ক্যাথলিক বা প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়গুলোর ক্ষেত্রে। আপনি এমনটাও কল্পনা করতে পারেন, মারাত্মকভাবে বিভক্ত বিশ্ব হঠাৎ করে মঙ্গল গ্রহের আক্রমণের জবাবে তাদের বহিষ্কার করতে একতাবদ্ধ সংহতি প্রকাশ করতে পারে।

ব্যাপক মাত্রার সঙ্ঘাতের চেয়ে স্থানীয় সঙ্ঘাতই যে সব স্থানে অনেক বেশি দেখা যায়। এটা বিস্ময়কর কিছু নয়। যেখানেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, সেখানেই সঙ্ঘাতের সৃষ্টি হয়। সঙ্ঘাতের আবির্ভাব ঘটে নৈকট্য থেকে, যেভাবে লোকজন অন্যদের বিরুদ্ধে ঘষাঘষিতে থাকে। যেকোনো 'সভ্যতা সঙ্ঘাতের' চেয়ে মুসলমানদের নিজেদের এবং খ্রিষ্টানদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বিপুলভাবে বেশি দেখা যায়। হান্টিংটন কথিত এসব মহা 'সভ্যতা-সংক্রান্ত সঙ্ঘাত' সাধারণত অতি মাত্রায় তাত্ত্বিক বা কাল্পনিক। কোনো সভ্যতার পুরোটাই অন্য এক সভ্যতার বিরুদ্ধে সঙ্ঘাতে নামা কঠিন ব্যাপার, তবে আধুনিক সময়ে তা সত্যিই অনেক সহজ হয়ে পড়েছে, যোগাযোগব্যবস্থা ক্রমাগত বড় মাত্রায় গ্রুপ সংহতি প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আপনি বসার ঘরে টিভি পর্দায় দূরের শত্রুকে দেখতে পারেন, অনেক দূর থেকে আবেগকে বাস্তবায়ন করতে পারেন। 'এটা মুসলিম,' বা 'এটা খ্রিষ্টান,' বা 'এটা পাশ্চাত্য।'

ক্রুসেডাররা সম্ভবত ছিল এ যাবৎকালে বিশ্বের দেখা 'সভ্যতাসংক্রান্ত সঙ্ঘাতে' ঘনিষ্ঠতম বিষয়- পোপ দ্বিতীয় আরবানের 'পৌত্তলিক' ভয় দেখানো বক্তৃতা তাদের উদ্দীপ্ত করেছিল। কিন্তু ঘটনাটি ঘটার সময় বেশির ভাগ মুসলমানই বিষয়টা অবগত ছিল না। আমাদের অন্য সমাজে বসবাসকারী মুসলিম সংখ্যালঘুর প্রশ্নটি বিবেচনা করার সময় এই বিষয়টার বেশ গুরুত্ব রয়েছে। তারা কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে? শক্ত মুসলিম ব্লক হিসেবে? সম্ভবত নয়, যদি না কেবল মুসলমান হওয়ার জন্য তারা মারাত্মক চাপে থাকে কিংবা ভয়াবহ বৈষম্যের শিকার হয়। ঠিক একইভাবে এমন ঘটনা ঘটতে পারে, দক্ষিণ অঞ্চলের সব নাগরিক উত্তর অঞ্চলের বিরুদ্ধে খেপে যেতে পারে। কিংবা অভিন্ন ভাষার মুসলিম-খ্রিষ্টান বা মুসলিম-হিন্দুদের মিশ্র সম্প্রদায় ভিন্ন ভাষার গ্রুপের কোনো জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যোগ দিতে পারে- যেমন শিয়া ও সুন্নি কুর্দিরা শিয়া ও সুন্নি তুর্কিদের বিরুদ্ধে। আপনি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন না। লোকজন ও সম্প্রদায়গুলো সবসময় তাদের নিজেদের স্বার্থ পুনর্মূল্যায়ন করতে থাকায় সব কিছুই পরিস্থিতিবিষয়ক ও পরিবর্তনশীল। ফলে কোনো খারাপ কিছু না ঘটলে মুসলমানরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈরী (যা প্রায়ই ঘটে) হয়ে যাবে, এমনটা ভাবা বোকামিপূর্ণ হবে। তা-ই ধর্ম-বিশেষ করে ইসলাম বনাম অন্যান্য ধর্ম- সঙ্ঘাতের বিস্মৃতিপ্রবণ ভিত্তি। অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের স্থায়ী সঙ্ঘাত চলাটা ধরে নেয়া অযৌক্তিক। এ কারণেই 'ইসলামবিহীন বিশ্ব' হলেও আমাদের সামনে প্রচুর বিভেদরেখা থাকবে, ফলে সম্প্রদায়গুলো সঙ্ঘাতে লিপ্ত থাকতে পারে, সঙ্ঘাতে লিপ্ত হয় এবং

সঙ্ঘাত চালাতে থাকবে। মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসে গোষ্ঠীগত বিষয়টি এ ধরনের তালিকার শীর্ষেই থাকবে, অবশ্য আমরা ‘গোষ্ঠীগত’কে সংজ্ঞায়িত করছি, এটাও সচেতনভাবে নির্মিত পরিচিতি।

পাশ্চাত্যবাদবিরোধিতা নিয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য?

ইসলাম মৌলিকভাবেই পাশ্চাত্যবিরোধী বলে মন্ত্র জপতে থাকার বিষয়টি যাচাই করার জন্যও অন্যান্য সমাজে মুসলিমদের পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ। সত্য হলো, দুনিয়ার বেশির ভাগেরই পাশ্চাত্যকে প্রশংসা ও ঘৃণা করার যুক্তি রয়েছে। পাশ্চাত্যের প্রতি ক্রোধ মুসলমানদের একচেটিয়া বিষয় নয়, যদিও ২১ শতকের প্রথম দশকটি 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধের' সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি মুসলমানদের মধ্যে আমেরিকানবাদ-বিরোধিতার বিশেষ সময় হিসেবে আবির্ভূত হয়। এটা শেষ পর্যন্ত চলে যাবে। কিন্তু আমেরিকানবাদ-বিরোধিতা বা পাশ্চাত্যবাদবিরোধিতা আবারো জ্বলে উঠতে পারে, ঠিক যেমন তা চীন বা ল্যাতিন আমেরিকান বা অন্য সংস্কৃতিতে ঘটেছিল।

হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে পাশ্চাত্যবিরোধী চিন্তাধারাসম্পর্কিত বিষয় নিয়ে- অনিবার্যভাবেই জানতে চাওয়া হয়েছে 'তারা কেন আমাদের ঘৃণা করে?'- এবং গতানুগতিকভাবে সহজ জবাবও দেয়া হচ্ছে। বিতর্কটি যে জটিল, তা সত্য : পাশ্চাত্য যা করেছে, সে জন্যই কি 'তারা' আমাদের ঘৃণা করে? নাকি তাদের নিজেদের সংশয়, ঈর্ষা, এবং উপলব্ধি শক্তির অভাবটাই আমাদের প্রতি ঘৃণায় প্রতিফলিত হয়? আমাদের পছন্দ না করার জন্য আমরা কাদের দোষ দেবো, নিজেদের না তাদের?

প্রশ্নটি অকাট্য, জবাব দেয়া যায় না। আরো নিখুঁতভাবে বললে বলা যায়, এর জন্য দরকার অনেক জবাবের। এসব প্রশ্ন এই বইটিরও কেন্দ্রে রয়েছে। এক দিকে, 'তারা'- মুসলমান এবং অন্যরা- হামলা, উপনিবেশ, সাম্রাজ্য-বিনির্মাণ, যুদ্ধ, অভ্যুত্থান, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রাধান্য বিস্তার, প্রাকৃতিক সম্পদ দখল, শোষণ, ঔদ্ধত্য, উদাসীন থাকা, অ-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও বুঝতে না পারার যে কাজগুলো আমরা তাদের প্রতি করেছি, সে জন্য কি তারা আমাদের ঘৃণা করে? আমরা এসব যুক্তি আগেও শুনেছি, এতে অনেক সত্য রয়েছে।

যেসব আমেরিকান অবশিষ্ট বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান বিধ্বংসী ও ক্ষতিকর কার্যক্রমের দায়দায়িত্ব কোনো ধরনের স্বীকারোক্তি করতে অস্বস্তিতে থাকেন, তারা এই উত্তর দিতে প্রলুব্ধ হন : 'ঠিক আছে,

আমেরিকাকে দোষ দাও।' আমরা তখন নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর এবং স্বস্তিদায়ক জবাব অনুসন্ধান করে বলি : তারা 'আমাদের স্বাধীনতাকে ঘৃণা করে,' তারা আমাদের সম্পদ, আমাদের জীবনযাত্রাকে ঈর্ষা করে, তারা নিজেদের প্রতি কঠোর বাস্তববাদী না হয়ে, নিজেদের দুর্বলতা না দেখে পাশ্চাত্যকে দোষী দিতে আগ্রহী থাকে। আর এসব যুক্তিও বৈধতা পেয়ে যায়। কিন্তু এগুলো কাহিনীর বেশির ভাগ প্রকাশ করে না।

পাশ্চাত্যবাদ-বিরোধী শিকড়গুলো যা-ই হোক না কেন, বৈশিষ্ট্যগুলো পাশ্চাত্য ও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটা সমস্যা হিসেবেই বিরাজ করছে। এগুলো কিভাবে বিশ্ব সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে খাপ খাবে?

আধুনিক পাশ্চাত্য এবং বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি উন্নয়নশীল দেশগুলোর বেশির ভাগের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রশংসা, শ্রদ্ধা, ভীতি ও ক্রোধের মিশ্রণ ফুটে ওঠে। ১৬ শতকের শুরু থেকে পাশ্চাত্যের দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সশ্রদ্ধ প্রশংসিত হয়। তবে অন্যান্য সভ্যতার আবাসভূমিতে পাশ্চাত্য অনুপ্রবেশের জন্য দায়ী পাশ্চাত্যের প্রযুক্তি ও সামরিক অগ্রগতির বিষয়টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাহলে পাশ্চাত্যবিরোধী অনুভূতির উপাদানগুলো কতটা ব্যাপকভাবে ভাগাভাগি করে নেয়া যায়? পাশ্চাত্যবাদ-বিরোধী ব্যাপকভিত্তিক ফ্রন্ট কি কখনো যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থপূর্ণ কোনো মাত্রায় গড়ে উঠেছে? আমরা কি এমন কোনো বিশ্বের দিকে যাচ্ছি যেটাকে 'পাশ্চাত্য এবং অবশিষ্ট বিশ্ব' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে? এগুলোও পুরোপুরি বিমূর্ত বিষয়। পাশ্চাত্যবিরোধী অনেক কিছুই রয়েছে, তবে ইতিহাসের বেশির ভাগ সময় তারা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে নয়, নিজেদের মধ্যে যুদ্ধও করেছে। একইভাবে প্রাচ্যের অনেকে, ইসলামের অনেক এবং নিশ্চিতভাবে 'অবশিষ্ট বিশ্বের'ও অনেকে আছে। এ ধরনের পরিভাষা আসলেই কার্যকর নয়, যতক্ষণ না সেগুলো কোনো ধরনের সুস্পষ্ট, অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি গড়ে ওঠে, যারা যখন তখন গুরুত্বপূর্ণ কোনো পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম।

বর্তমান সময়েও 'পাশ্চাত্যের' কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'অবশিষ্ট' অস্থায়ী জোটের কিছু কিছু প্রমাণ এর মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। বুশ প্রশাসনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধের কারণে বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব উদ্বেলিত, চরমভাবাপন্ন, অস্থির, চঞ্চল, ও উদ্বিগ্ন। এ কারণে ইতিহাসে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে স্ব-সচেতনামূলক 'সংহতি' অনেক বেশি মাত্রায় উপস্থাপন করছে। সম্ভবত এ ধরনের আবেগগত সংহতি কোনো একক রাষ্ট্র সরাসরি নিজ স্বার্থে কাজে লাগাতে না পারলেও তা বিশৃঙ্খলা, ঘন ঘন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মার্কিন লক্ষ্য বাস্তবায়নে মন্থরতা সৃষ্টি করতে পারে। বুশ প্রশাসনের রাজকীয় সংস্করণ (স্পষ্টতই নব্য-রক্ষণশীল কৌশলবিদদের প্রস্তাবনা, যা ক্লিনটনের আমলে নমনীয়

আকারে থাকে) বাকি বিশ্বের বেশির ভাগ এলাকায় (মুসলিম বিশ্ব, রাশিয়া, চীন ও ল্যাতিন আমেরিকা) আরো বেশি মার্কিনবিরোধী অনুভূতির সৃষ্টি করে। আর এসব শক্তি কখনো যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সামরিক জোট গড়ে না-ও তোলে, তবুও তারা খুব সহজেই আমেরিকান বৈশ্বিক কৌশল বানচাল করে দেয়ার দিকে নজর দিতে পারে; বস্তুত তারা ইতোমধ্যে তা করেছেও। কেবল তাদের পরোক্ষ আগ্রাসন মনোভাবই বুশ প্রশাসনের প্রভাব হ্রাস করে দিয়েছিল, কাজ করার সামর্থ্য রুখে দিয়েছিল।

তাই আমরা যত 'ইসলামের রক্তাক্ত সীমান্তগুলো' নিয়ে চিন্তা করব, তত আমরা দেখতে পাবো, আমরা বহিরাগত আক্রমণের কারণে সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের রক্ষা, আগ্রাসী পাশ্চাত্য পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অভিন্ন ক্ষোভ এবং রাষ্ট্রগুলোর তাদের জনসাধারণকে একমুখী করার মতো জটিল বৈশিষ্ট্য ও ঘটনাবলি নিয়ে কথা বলছি। ইসলামকে সামাজিক সঙ্ঘাতে সক্রিয় কোনো উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করার অর্থ হবে ইতিহাসের এই পর্যায়ে বিশ্ব সঙ্ঘাতের কিছু বিশেষ ঘটনার ব্যাপারে একে অত্যন্ত পরিকল্পিত মাইক্রোস্কোপে পরিণত করা। ইসলাম না থাকলে পাশ্চাত্যবাদ-বিরোধী আবেগ থাকবে না ভাবাটা আসলে হাস্যকর সারল্য। আমরা এখানে যে চারটি সভ্যতা বিবেচনা করব তিনটিরই (রাশিয়া, চীন ও ভারত) নিজস্ব হিসাবেই পাশ্চাত্যবিরোধী গভীর শেকড় রয়েছে। মুসলমানরা কোনো না কোনোভাবে এসব পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

প্রথমে আমরা মোটামুটি বিস্তারিতভাবে আমাদের কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ দেশ রাশিয়ার দিকে নজর দেবো। এই তিনটি দেশের যেকোনোটির চেয়ে সম্ভবত রাশিয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ রাশিয়া সরাসরি পাশ্চাত্য সম্পর্কে বায়জান্টাইন বৈরী বিশ্বদৃষ্টির ঐতিহ্যের অধিকারী এবং সেটা আরো তীব্র করেছে। তার নিজস্ব সীমান্তের ভেতরে বিপুলসংখ্যক মুসলিম রয়েছে এবং কয়েক শ' বছর ধরে রাজকীয়, কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্ট-পরবর্তী সরকারের অধীনে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। পরিশেষে বলছি, রাশিয়া এখনো মধ্যপ্রাচ্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যে অঞ্চলটি পাশ্চাত্য পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধারণ করে আছে।

অধ্যায় সাত

‘তৃতীয় রোম’ এবং রাশিয়া : অর্থোডক্স ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী রাশিয়া

১৫০০ শতক কাছাকাছি হওয়ার প্রেক্ষাপটে দেয়ালের লেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল : বায়জান্টাইন মারা যাচ্ছিল, সাম্রাজ্যের নিভু নিভু শিখাটিও অল্প সময়ের মধ্যে নিভে যাবে ১৪৫৩ সালে উসমানিয়া বিজয়ের ফলে। তবে অর্থোডক্স চার্চের ধারণাটি (গ্রেট মাদার চার্চ) দৃঢ়ভাবে অঞ্চলজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; সেটা কখনো মরবে না। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব কিভাবে বায়জান্টাইন মশাল নিয়তির অমোঘ নির্দেশেই যেন রাশিয়ার হাতে চলে গেল, যেখানে পাশ্চাত্যের প্রতি ক্ষোভ ও সংশয়ের আগুন ৫০০ বছর ধরে পরিপুষ্ট ও নতুন চরিত্র ধারণ করে বর্তমান সময়ে পৌঁছেছে। কনস্টানটিনোপলের রাজকীয় আলখেল্লাটি ইসলাম নিয়ে নিলেও অর্থোডক্স চার্চের পাশ্চাত্যবাদবিরোধিতা অব্যাহত রয়ে গেছে।

ইসলাম এখন সাবেক বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের পুরোটাজুড়েই তার প্রাধান্য ঘোষণা সম্পূর্ণ করেছে, উসমানিয়া সাম্রাজ্য বায়জান্টাইনের মতোই হয়েছিল, কেবল পোশাকটাই ছিল মুসলিম। উসমানিয়ারা বহুধর্মীয় ও বহুজাতিক সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় বায়জান্টাইন শাসন পরিচালনাগত প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে এবং সেগুলোর স্থায়িত্ব দান করে। ইস্টার্ন খ্রিষ্টধর্মের ওপর মনোস্তাত্ত্বিক আঘাত এবং ক্ষমতা হারানোর ক্ষতিটা বিপুল হলেও এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, ইসলাম কিন্তু বিশ্বের এই পূর্বপ্রান্তে খ্রিষ্টধর্মের শাশ্বত প্রাণঘাতী শত্রু হয়নি। তারা বরং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে একত্রে বাস করতে থাকে। বর্তমানে প্রজায় পরিণত হওয়া খ্রিষ্টানরা বিষয়টা বুঝতেন, ঘনিষ্ঠ সহাবস্থান ছাড়া উভয় পক্ষের কাছেই বিকল্প ছিল সামান্যই। এখানে সেখানে নানা ধরনের অসন্তোষ তো ছিলই, মাঝে মধ্যেই স্থানীয় আন্দোলন ও বিদ্রোহ ঘটত, বিশেষ করে উসমানিয়া সাম্রাজ্য নিজেই ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছিল, ইউরোপের উৎসাহে বিচ্ছিন্নতাকামী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠছিল। কোনো কোনো বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করা হতো। তবে এর আগেও স্থানীয় খ্রিষ্টানরা প্রায়ই বায়জান্টাইন শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন। আবার এই দীর্ঘ সময়কালে উসমানিয়া শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম জনগোষ্ঠীও স্থানীয় বিদ্রোহ ঘটাতেন।

বিশাল সাম্রাজ্যগুলো মাঝে মধ্যেই কোনো-না-কোনো সহিংস ক্ষোভ থেকে কখনোই মুক্ত থাকে না। এক দিকে রোম ও পাশ্চাত্যের প্রতি অর্থোডক্সের হাজার বছরের অবিশ্বাস এবং অন্য দিকে ইসলামের সাথে অর্থোডক্সের সহাবস্থানমূলক নতুন নির্দেশিকা বিবেচনা করা হলে মনে হতে পারে অঞ্চলটিজুড়ে ইসলামের চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে সামান্যই। বস্তুত, কনস্টানটিনোপল পতনেরও প্রায় ৬০০ বছর আগে থেকে আরব অঞ্চলে খ্রিষ্টানদের বিপুল সম্প্রদায়গুলো বাস করছিল। ১৪৫৩ সালটিকে একটি প্রতীকী মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করা গেলেও এটা অঞ্চলটির ক্ষমতার ধারাবাহিকতারই ছদ্মবেশ। আনাতোলিয়া, লেভ্যান্টাইন এবং বলকান অঞ্চলগুলো যার অধিকারেই থাকুক না কেন, তারাই পাশ্চাত্যের সাথে উত্তরাধিকার সূত্রেই ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার অধিকারী হয়ে পড়ে। আর রাশিয়ায় আমরা দেখব, এই উত্তরাধিকার পূর্ব স০্যাভিক বিশ্বে পাড়ি দিয়ে মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে নতুন জটিল সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

প্রাচীন রুশ ঐতিহাসিক ভাষ্য অনুযায়ী, ক্যাথলিক ও অর্থোডক্স উভয় মিশনারি এক হাজার বছর আগে প্রাথমিক পৌত্তলিক রুশ রাষ্ট্রের সূতিকাগার কিয়েভে পৌঁছেছিল। আগেকার শতকে রোমের বিরুদ্ধে কনস্টানটিনোপলের বিজয়ের মাধ্যমে বুলগেরিয়ান এবং আরো কয়েকটি স্লাভিক জাতিগোষ্ঠী ল্যাটিন খ্রিষ্টধর্মের বদলে অর্থোডক্সিকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে প্রিন্স ভ্লাদিমির কিয়েভের দি গ্রেট, রাশিয়ার জন্য কোন ধর্মটি গ্রহণ যুৎসই হবে তা যাচাই করার জন্য প্রতিটি মহান ধর্মের কেন্দ্রে দূত পাঠিয়ে ছিলেন। দূতেরা ফিরে যে প্রতিবেদন দাখিল করেছিলেন, তাতে তাদের প্রতিক্রিয়ার সমৃদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় :

ভলগার মুসলিম বুলগেরিয়ানদের সম্পর্কে দূতরা বলেন, তাদের মধ্যে কোনো আনন্দ নেই; আছে কেবল বেদনা আর মহা দুর্গন্ধ, অ্যালকোলিক পানীয় ও শূকর নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তাদের ধর্ম অনাকাঙ্ক্ষিত, সম্ভবত ভ্লাদিমির ওই ঘটনাটি লক্ষ করেছিলেন : 'পান মানেই আনন্দ-যাত্রা।'

ভ্লাদিমির ইহুদিদের কাছেও দূত পাঠিয়েছিলেন, 'তাদেরকে তাদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু সবশেষে সেটা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই বলে যে, তাদের জেরুসালেম হারানো এটাই প্রমাণ করে, ঈশ্বর তাদের ত্যাগ করেছেন।' সবশেষে ক্যাথলিক ধর্ম ও অর্থোডক্সির কোনো একটা থাকে। 'জার্মানির ক্ষীণালোকিত চার্চগুলোতে তার দূতেরা কোনো সৌন্দর্য দেখেননি; তবে হ্যাগিয়া সোফিয়ায় অনুষ্ঠিত বায়জান্টাইন চার্চের [কনস্টানটিনোপলে] শাস্ত্রাচারের প্রাণবন্ততা তাদের মুগ্ধ করেছিল। তারা এখানেই তাদের আদর্শ খুঁজে পেয়েছিল : 'আমরা আর বুঝতে পারছিলাম না, আমরা দুনিয়া না স্বর্গে কোথায় আছি,' তারা বললেন, 'এ ধরনের সৌন্দর্য এবং কিভাবে এর বর্ণনা দেবো জানি না।' এই ভাগ্যনির্ধারণী পছন্দের ভবিষ্যৎ বিপুল সভ্যতা-সংক্রান্ত পরিণাম ছিল, যদিও আমরা হয়তো নিশ্চিত হতে পারি, কনস্টানটিনোপলের সাথে জোট গড়ার মাধ্যমে ভ্লাদিমির কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং একই সাথে ধর্মতাত্ত্বিক ফায়দা তুলেছেন।

রাশিয়ার ধর্মান্তর অর্থোডক্সির জন্য ছিল বিশাল ভূ-রাজনৈতিক পুরস্কার :

বর্তমানে রাশিয়া বিশ্বের একক বৃহত্তম অর্থোডস্ক কমিউন হিসেবে বিরাজ করছে। রাশিয়াই একমাত্র দেশ, যাদের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে অর্থোডক্স চার্চ প্রধান কোনো শক্তির সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছে। একই সাথে, সম্প্রসারণশীল রুশ সাম্রাজ্যের অধীনে ক্রমাগত বেশি মুসলমান অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, রাশিয়াকে একই সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশেও রূপান্তরিত করছে।

বায়জান্টাইন থেকে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতি বৈশিষ্ট্যে কী বিপুল সম্পদ পাচ্ছে, সে ব্যাপারে উসমানিয়াদের মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না। বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাগুলো ধীরে ধীরে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে থাকার প্রেক্ষাপটে তারা অনেক আগে থেকেই বায়জান্টাইন শাসন ও প্রশাসনিকব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিল। সুলতান মোহাম্মদ দ্রুততার সাথে কনস্টানটিনোপলকে আন্তর্জাতিক ও বহুসংস্কৃতির রাজধানী হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। পালিয়ে যাওয়া সব খ্রিষ্টানকে তিনি ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানান, নগরীর সাবেক চরিত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কনস্টানটিনোপলের প্যাট্রিয়াককে তার সাম্রাজ্যে অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের সব কিছু তদারকির কর্তৃত্ব মঞ্জুর করা হয়। বস্তুত উসমানিয়া তুর্কিদের অধীনে প্যাট্রিয়াক ও তার প্রশাসকদের নতুন ক্ষমতা প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোনো কোনো অর্থোডক্স সম্প্রদায় তাদের সাবেক স্বায়াত্তশাসন কর্তৃত্বের লঙ্ঘন বিবেচনা করে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু অর্থোডক্স চার্চ এখন দীর্ঘ ৪০০ বছর ধরে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের সাথে মানিয়ে নিতে থাকে, যা উভয়কেই বদলে দিয়েছে।

একই সময়, চার্চ উচ্চ সাংস্কৃতিক মূল্য দিয়েছে। উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অধীনে চার্চ ব্যাপক ধর্মীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারলেও এর রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থডোক্স রাষ্ট্রের সমর্থন প্রবলভাবে হারিয়ে ফেলে। সাম্রাজ্যের মধ্যে চার্চ ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হতে থাকে, পাশ্চাত্যের সাথে তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে যোগাযোগ কমতে থাকে। চার্চ বেশি বেশি অন্তর্মুখী হতে থাকে, অর্থোডক্স চার্চের প্রধান বৈশিষ্ট্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও 'যুক্তি' অনুসন্ধানের কাজ (ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনে বিশ্বাস ও ধর্মীয় রহস্যের গুরুত্ব) থেকে সরে আসে। চার্চ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য খ্রিষ্টধর্মের মধ্যকার দ্বিমুখী গভীরতর অনুভূতি গড়ে তুলেছিল : অর্থোডক্স দৃষ্টিতে ক্ষমতার প্রতি পোপ ও চার্চের সম্পৃক্ততার কারণে ল্যাটিন ক্যাথলিক ধর্ম ও পাশ্চাত্য

বস্তুবাদ, যুক্তিবাদ (বিশ্বাস ও আত্মার ওপর মন), ব্যক্তিবাদ ও দুর্নীতি অনুপ্রাণিত হয়ে আধ্যাত্মিক শূন্যতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অর্থোডক্স চার্চ তার নিজের চেতনাটি খোদ যিশুর প্রচারিত আদি শিক্ষা থেকে সরাসরি প্রাপ্ত, যা ল্যাটিন চার্চ ও পোপের রাজনীতিতে কলুষিত হয়নি। অর্থোডক্স আধ্যাত্মিকতা এবং পারলৌকিকতা এমন কিছু প্রতিফলিত করে বলে ধারণা করা হয়, যা থেকে আধ্যাত্মিকতার অনুপস্থিতিতে পাশ্চাত্যবঞ্চিত। এসব ধারণা অর্থোডক্স মনে গভীরভাবে বসে ছিল, বর্তমানের বাগাড়ম্বরতায় এখনো তা বিরাজ করছে।

রাশিয়া এবং তৃতীয় রোম

ইস্টার্ন রোমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটল, কিন্তু অর্থোডক্স বিশ্বাসের রাজকীয় ঐতিহ্য কনস্টানটিনোপলের সাথে সাথে বিলীন হতে দেয়া হলো না। অবিলম্বে তা গ্রহণ করলেন রাশিয়ার জার তৃতীয় ইভান। তিনি রোমান ও কনস্টানটিনোপল ক্ষমতা-কেন্দ্রের উত্তরসূরি হিসেবে মস্কোকে 'তৃতীয় রোম' বলে ঘোষণা করলেন। এই দাবি জোরদার করার জন্য তিনি বায়জান্টিয়ামের শেষ সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্রী সোফিয়া প্যালেলোগকে তার বিয়ে করার মাধ্যমে কনস্টানটিনোপলের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বংশীয় সংযোগের কথা জোরালোভাবে বলেন। তৃতীয় ইভান তার নিজস্ব বায়জান্টাইন পরিচিতি ফলক (কোট অব আর্মস) দুই মাথাযুক্ত ঈগল ব্যবহার করা শুরু করেন। ওই প্রতীকটি এখনো রুশ কোট অব আর্মস হিসেবে রয়ে গেছে।

'তৃতীয় রোম' পদবিটি গ্রহণের অর্থ মস্কোর কাছে কেবল দাম্ভিকতা প্রকাশই নয়, আরো বড় কিছু বোঝাচ্ছিল : এটা নতুন সভ্যতাগত ও আধ্যাত্মিক ভূমিকার ঐশ্বরিক ভিশনের প্রতিনিধিত্ব করছিল। অর্থাৎ এ দিয়ে ধর্মভ্রষ্টতা এবং রোমান ক্যাথলিকবাদ ও ইসলাম উভয়ের বজ্জাতির বিরুদ্ধে খ্রিষ্টধর্মের সত্যিকারের বিশ্বাস রক্ষার দায়িত্ব এখন রাশিয়ার কাঁধে বর্তিয়েছে বোঝানো হচ্ছিল। এই নতুন রুশ মিশনের ঐশ্বরিক ফ্লেভার জার তৃতীয় বাসিলকে দেয়া সন্ন্যাসী ফিলোথেয়াস সকভের চিঠিতে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে :

ওল্ড রোমের চার্চটির পতন হয়েছিল এর ধর্মভ্রষ্টতার জন্য, দ্বিতীয় রোমের গেটগুলো কুঠার দিয়ে টুকরা টুকরা করেছে অবিশ্বাসী তুর্কিরা; কিন্তু মস্কোর চার্চ, নিউ রোমের চার্চটি পুরো মহাবিশ্বের সূর্যের চেয়েও বেশি উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করছে। তুমি, বাসিল, খ্রিষ্টান জগতের মধ্যে সর্বজনীন সার্বভৌমত্বের সৌন্দর্য; তোমার উচিত ঈশ্বরের সম্ভ্রমোদ্দীপের লাগাম ধরে রাখো; তাঁকে ভয় করো, যিনি এগুলো তোমাকে দিয়েছেন। দুই রোমের পতন ঘটেছে, কিন্তু তৃতীয়টি দ্রুত দাঁড়িয়েছে; চতুর্থটির কখনো আগমন ঘটবে না। তোমার রাজ্য অন্য কাউকে দেয়া হবে না।

ইসলাম থাকুক বা না থাকুক, ধারাবাহিকতা কোনোভাবেই বন্ধ হচ্ছিল না 'তৃতীয় রোমের' ধারণাটি উসমানিয়ারাও খুইয়ে ফেলেনি। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার মুসলিম ও খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক ভিশনের

মুগ্ধতাকারী মিশ্রণে সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ কনস্টান্টিনোপল জয়ের পর নিজেকে বায়জান্টাইন রাজকীয় ঐতিহ্যের উত্তরসূরি হিসেবে নিজেকে উপাস্থাপন করে কায়সার-ই-রুম (রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট) পদবি গ্রহণ করেন। তিনি তার নিজের সাম্রাজ্যে বায়জান্টাইন রাজসভা ও প্রশাসনিক রীতিনীতি প্রচলন করেন, বহুজাতিক ও বহুধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখেন। একই থিমের বিস্ময়কর সম্প্রসারণের বিষয়টি তুর্কি ইতিহাসবিদ ইলবার ওরতাই অভিমত প্রকাশ করে বলেন, মোহাম্মদ এখন উসমানিয়া কনস্টান্টিনোপলকেই ইস্তাম্বুলে 'তৃতীয় রোম'কে (ইতালির পৌত্তলিক রোম এবং কনস্টান্টিনোপলের ইস্টার্ন অর্থোডক্স 'রোম'-এর উত্তরসূরি) 'ইসলামি রোম' হিসেবে বিবেচনা করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, ইসলাম ইস্টার্ন খ্রিষ্টধর্মকে প্রত্যাখ্যানের প্রতিনিধিত্ব করে না; বরং শক্তিশালী ধারাবাহিকতায় সে খ্রিষ্টধর্ম থেকে প্রাচ্যের রাজকীয় ঐতিহ্য গ্রহণ করে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়ে যে সাম্রাজ্যটি গঠন করে সেটা হয়ে দাঁড়ায় বিশ্বের বৃহত্তম ও সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য। এই মহান ক্রান্তিকালে বিশ্বাসের চেয়েও সাম্রাজ্য বড় মনে হয়।

উসমানিয়া এবং পাশ্চাত্যবিষয়ক সাম্প্রতিক একটি গ্রন্থের পর্যালোচনাকারী মন্তব্য করেছেন :

... হ্যাপসবার্গ ও উসমানিয়াদের মধ্যে [ভিয়েনা গেটে] সৃষ্ট সঙ্ঘাত ও ঝটিকা লড়াই এবং তাদের উভয় পক্ষে থাকা অসংখ্য জায়গিরদার আসলে ছিল সাম্রাজ্য দু'টির বিরোধ, সেটা তেমনভাবে 'সভ্যতার সঙ্ঘাত' প্রতিফলিত করত না। এর সাথে যতই ধার্মিক স্লোগানদাতা থাকুক না কেন, সংগ্রামটা স্রেফ ঘটনাক্রমে হতো ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে। ভূখণ্ড ছিল তাদের লক্ষ্য, সেই সাথে ছিল রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরসূরি দাবি করার অধিকার নিয়ে অনেক কম বাস্তবতাপূর্ণ, তবে সমানভাবে জবরদস্তিমূলক বিষয়টি। বিজয়ী মোহাম্মদ কি ২০০ বছর আগে বায়জান্টাইনদের হারিয়ে কনস্টান্টিনোপল জয় করেননি? বায়জান্টাইন অতীতকে ঘষে মুছে না ফেলে বরং উসমানিয়ারা এটাকে তাদের নিজেদের ধারণকারী মনে করত।

রুশ অর্থোডক্সের পাশ্চাত্যবিষয়ক সংশয়

পৌত্তলিক রুশরা সেই যে ক্যাথলিক ধর্ম বাদ দিয়ে ইস্টার্ন অর্থোডক্স বিশ্বাসের সাথে তাদের ভাগ্য জুড়ে দিয়েছিল, তখন থেকেই অর্থোডক্স চার্চ তার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি জোরালোভাবে রাশিয়ার মধ্যে ছাপ দিয়ে ফেলেছে; 'সত্য ধর্মের' প্রচারের মাধ্যমে পুরো মানবজাতির মোক্ষলাভের জন্য নতুন রুশ মিশন শুরু তখনই। এসব থিম রুশ মরমিবাদের গভীর ভাণ্ডার, ভাবাবেশ বিশ্বাসের ঐতিহ্য, মুসাফির সাধু ব্যক্তিবর্গ, রুশ কৃষকদের খ্রিষ্টসদৃশ সরলতায় বিশ্বাস এবং রুশ আত্মার বিশুদ্ধতা, রুশ সমাজে সম্বলহীন ফকিরদের স্থান (বরিস গডুনভ অপেরায় শক্তিশালী দৃশ্যে অম্লানভাবে চিত্রিত) এবং রাশিয়ার সভ্যকরণ মিশন-বিষয়ক রুশ সংস্কৃতিকে ছেয়ে ফেলে। এগুলোর সবই আগ্রাসী, সম্প্রসারণবাদী, বস্তুবাদী, সম্পূর্ণ আবেগহীন, ব্যক্তিবাদ ও দুর্নীতিগ্রস্ত এবং সেই সাথে ক্ষমতা ও অসার দম্ভের আকাঙ্ক্ষী পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে নিজেদের ধর্ম ও চার্চের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে অর্থোডক্স বিশ্বাসের গভীর প্রত্যয় জোরদার করেছে। রুশ লোকবিশ্বাসের এসব থিম ১৯ শতকে রুশ চিন্তাধারার দার্শনিক-ব্যবস্থায় উন্নীত হয়ে অর্থোডক্সি ও প্যান-স্লাভবাদের বিশ্ব দর্শনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে থাকে।

বর্তমানে পাশ্চাত্যের প্রতি রাশিয়া সিজোফ্রেনিক (মানসি বিকৃতি) রয়েই গেছে, এর আংশিক কারণ পরিচিতির জন্য সংগ্রাম। পাশ্চাত্যপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি অনেক আগে থেকেই লোকজপন্থীর সাথে সঙ্ঘাতপূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল, পরে তা রুশ 'ওয়েস্টার্নাইজার' বনাম 'স্লাভোফিল' সংগ্রাম হিসেবে অভিহিত হয়। এক দিক থেকে স্ল্যালোফিল রুশ সংস্কৃতির রোমান্টিক ভিশনের প্রতিনিধিত্ব করে এবং এর অনন্য আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য যুক্তিবাদী ও আগ্রাসী পাশ্চাত্যকে রুখে দাঁড়ায়। ভয়টা অমূলক ছিল না : চৌদ্দ শতকে রাশিয়ায় মঙ্গোল-তাতার হুমকি দূর হওয়ার পর মস্কো অব্যাহতভাবে যেসব বিপদের মুখে পড়ে, তা আসতে থাকে পাশ্চাত্য থেকে, সেটা হয় রোমান ক্যাথলিক পোল্যান্ড, টেউটোনিক নাইট, নেপোলিয়নের ফ্রান্স, প্রটেস্ট্যান্ট জার্মান রাষ্ট্রগুলো ও সুইডেন কিংবা হিটলারের কাছ থেকে।

একইভাবে রুশরা পাশ্চাত্যের কারিগরি ব্যাপক সাফল্য, শক্তিশালী জাতি-রাষ্ট্র এবং এর অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির কারণে এর প্রতি হীনম্মন্যতাবোধে আক্রান্ত হয়। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গ্রন্থ ওসিডেন্টালিজম-এ ইয়ান বুরুমা ও এভিশাই মার্গালিত উল্লেখ করেন, পাশ্চাত্যবিরোধী স্ল্যালোফিল দর্শনের বেশির ভাগই

জার্মান রোমান্টিক দর্শন থেকে ধার করা, যা ছিল ১৮ ও ১৯ শতকের কর্তৃত্বপূর্ণ ফরাসি অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। ফরাসি বিপ্লবের ফলে ফ্রান্স ধর্ম ও অন্তর্জ্ঞানের বিপরীতে যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকসম্পাত-চালিত বিপুল অগ্রগতিকে প্রতীকীভাবে উপস্থাপন করার উদ্যোগ নেয়। এই একই যুক্তিতে পরিচালিত ফ্রান্স নেপোলিয়নের অধীনে পাশ্চাত্যের মূর্ত প্রকাশ হিসেবে আবির্ভূত হয়ে রাশিয়ার ওপর সর্বাত্মক হামলা চালায়, মস্কোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। অবশ্য তারপর রাশিয়ার যেনতেনভাবে গড়া সেনাবাহিনী এবং জেনারেল উইন্টার (শীত)-এর কাছে লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হয়। অর্থাৎ প্রকৃতির আদি শক্তি হলি মাদার রাশিয়াকে রক্ষা করতে একযোগে এগিয়ে আসে।

রাশিয়ার চিন্তাবিদেরা এই সম্প্রসারণশীল ও ক্রুসেডিং পাশ্চাত্য রাষ্ট্র ফ্রান্সের প্রেরণাদায়ক মতাদর্শকে রাশিয়া এবং এর মূল্যবোধের জন্য হুমকি হিসেবে দেখবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। শিল্পায়নের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে আবেগ, অন্তর্জ্ঞান, লোককলা এবং প্রকৃতির ভূমিকার প্রশংসাসংবলিত জার্মান রোমান্টিকবাদ সø্যাভোফিল রুশ চিন্তাধারার সাথে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। রাশিয়ার লোকজ মূল্যবোধের শাশ্বত বৈশিষ্ট্য মহান সাহিত্য প্রতিভা লিও টলস্টয়, ফাইয়োদর দস্তোয়েভস্কির মতো লোকদের উপন্যাসে উচ্ছ্বসিত প্রশংসিত হয়েছে। আর ১৯ শতকে রাশিয়া বস্তুবাদী, এমনকি পাশ্চাত্য দর্শনের নৈরাশ্যবাদী চিন্তাধারার নিন্দা করে দার্শনিক চিন্তাধারার বিশাল গ্র“প তৈরি করেছিল। (দেশটি পাশ্চাত্যদেশীয়দের সাথে সম্পর্কিত রুশ দার্শনিকদের জবাব দিতেও একটি দারুণ সংস্থা তৈরি করেছিল।)

এ ধরনের রুশ চিন্তাধারার একটি আকর্ষণীয় চিন্তাধারার উদাহরণ পাওয়া যায় ১৯ শতকের রক্ষণশীল দার্শনিক, রাজতন্ত্রী-অভিজাততান্ত্রিক কনস্টানটিন লিয়নটিয়েভের লেখালেখিতে। তার প্রচারিত 'বায়জান্টাইনবাদ' ধারণায় বলা হয়, রাশিয়ার সত্যিকারের মূল নিহিত রয়েছে বায়জান্টিয়ান, রাজতন্ত্র, অর্থোডক্স চার্চের মধ্যে এবং রাশিয়াকে অবশ্যই 'পাশ্চাত্যের বিপর্যয়কর সমতাবাদ, উপযোগবাদ ও বিপ্লবী ধারার বিরোধিতা করতেই হবে এবং সেই সাথে রাশিয়াকে সাংস্কৃতিক ও ভূখণ্ডগত সম্প্রসারণ ভারত, তিব্বত ও চীনের দিকে প্রাচ্যমুখী চালিত করতে হবে। লিওনটিয়েভের লেখালেখিতে বিশ শতক শুরুর আগেই পাশ্চাত্যে সম্ভাব্য কিছু ঘটনা নিয়ে অসাধারণ দূরদর্শী অন্তর্দৃষ্টি ছিল। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জার্মানি শিগগিরই ইউরোপে একটি বা দু'টি যুদ্ধের কারণ হবে, রাশিয়ায় এমন রক্তাক্ত বিপ্লব হবে যা হবে 'খ্রিষ্টবিরোধী' এবং সমাজবাদী, স্বৈরাচারী প্রকৃতির; এবং এর শাসকেরা জারবাদী পূর্বসূরিদের চেয়ে বেশি ক্ষমতা ধারণ করবে। তিনি এই মুগ্ধতা সৃষ্টিকারী ভবিষ্যদ্বাণীও করেন, 'সমাজতন্ত্র হবে ভবিষ্যতের সামন্ততন্ত্র।'

পাশ্চাত্যের অনেকে যুক্তিভিত্তিক কারণ ছাড়াই পাশ্চাত্যবিরোধিতাবাদকে বিকারতত্ত্ব হিসেবে অভিহিত করে প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, 'কিভাবে কেউ কোনো বিচারবিবেচনা ছাড়াই পাশ্চাত্যবাদবিরোধী হতে পারে?' কিন্তু পাশ্চাত্যবাদবিরোধিতায় বিকারতত্ত্বের উপাদান যদি থেকে থাকে এবং পাশ্চাত্য শক্তির বৈশিষ্ট্য ও কর্মকাণ্ডও একই মানের; পাশ্চাত্যের জয় ও আধিপত্য বিস্তারের ইচ্ছা এবং এর চরম বৈষম্য তার নিজস্ব বিকারতত্ত্বকে ধারণ করে। পাশ্চাত্য হয়তো এসব গুণ প্রদর্শনে অনন্য নয়, কিন্তু আধুনিক দুনিয়ায় বৈশ্বিক নীতিতে এ ধরনের গুণাবলি অন্য যেকোনো শক্তির চেয়ে অনেক বেশি ছড়িয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বে এসব নেতিবাচক মূল্যবোধ সর্বোচ্চভাবে প্রয়োগভাবে প্রয়োগকারী হিসেবে পাশ্চাত্যই বৈরিতা উসকে দিয়েছে। অনেকে হয়তো এগুলোকে 'সভ্যতার সঙ্ঘাত' হিসেবে অভিহিত করতে পারেন, কিন্তু এটা খুবই পরিষ্কার, সঙ্ঘাতের সভ্যতাসংক্রান্ত মূল্যবোধ করার ছিল সামান্যই, তবে ৫০০ বছর ধরে প্রাচ্যের সাথে শক্তিশালী ও আগ্রাসী পাশ্চাত্যের মোকাবেলার নির্দিষ্ট বাস্তবতায় সব কিছুই করতে পারে।

আমেরিকানদের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিক্ষত শোনালেও বায়জান্টাইন বিশেষজ্ঞ আরফার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যাসিলিয়স ম্যাকরিডেস যুক্তি দেন, 'পাশ্চাত্যবিরোধিতা চরম পর্যায়ে উপনীত হয় যুক্তরাষ্ট্রে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকানবিরোধী সহিংস হামলার মাধ্যমে। আধুনিক সময়ে বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের পিছু পিছু থাকা পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে এ ধরনের পাশ্চাত্যবাদ-বিরোধিতা অনেকটাই প্রত্যক্ষ অনুসিদ্ধান্ত।'

ওই সময়ে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় অসম রেখা অর্থোডক্স ও মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্যবিরোধী নির্দিষ্ট জোট দেখতে পাওয়াটা বিশেষভাবে আগ্রহী সৃষ্টিকারী বিষয়।... অর্থোডক্স ও উসমানিয়া পাশ্চাত্যবাদবিরোধিতার বিষয়টি কোনোভাবেই একই রকম ছিল না। তবে তাদের মধ্যকার চূড়ান্ত পর্যায়ের 'সহযোগিতা' সাধারণ কোনো বিষয় ছিল না।... মুসলিম ও পাশ্চাত্য খ্রিষ্টানের প্রতি একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ১৩ শতকে অর্থোডক্স রাশিয়ায় দেখা যায়। জার আলেকজান্ডার নেভস্কি মুসলিমবিরোধী জোট এবং রোমের সাথে মৈত্রী গড়ার (১২৪৮ সালে পোপ ৪র্থ ইনোসেন্ট তাকে এই প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন) বদলে তাতার ও মঙ্গোলদের সাথে জোট গড়াকে অগ্রাধিকার দেন।

আধুনিক শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থোডক্স বিশ্ব (রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, বলকান ও মধ্যপ্রাচ্যের অংশবিশেষ) প্রশ্নাতীতভাবে পশ্চিম ইউরোপ থেকে পিছিয়ে থাকায় তাদের মধ্যে পাশ্চাত্যের প্রতিও এক ধরনের হীনম্মন্যতাবোধের সৃষ্টি করে। আর পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের যুগে চীনসহ অবশিষ্ট বিশ্বের বেশির ভাগ অংশে তার ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে এই হীনম্মন্যতাবোধ আরো বাড়িয়ে তুলেছে। এই পাশ্চাত্যবিরোধিতার বেশির ভাগ উদ্ভূত মুসলিম বিশ্বের বাইরে, বিশেষ করে ১৯ শতকে চীনে। অবশ্য মুসলিমরাও একই অনুভূতি পোষণ করায় তা পাশ্চাত্যবিরোধী চিন্তাবিদদের মধ্যে এক ধরনের সংহতি বাড়াতে সহায়ক হয়।

বিপরীতে পাশ্চাত্য অনেক সময় অর্থোডক্স বিশ্বের প্রতি সাধারণভাবে ব্যবধানবিশিষ্ট, অবজ্ঞাপূর্ণ এবং অনেক সময় বৈরী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে। ১০৫৪ সালের 'মহা বিভক্তি'র পর ইস্টার্ন চার্চ রোমের কট্টর শত্র"তে পরিণত না হলেও স্পষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়েছিল। পূর্ব ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ও অর্থোডক্সির মধ্যকার সীমান্তভূমি এবং বলকান এখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ রয়ে গেছে, ইউক্রেনে অর্থোডক্সি ও ক্যাথলিক ধর্মের মধ্যে উত্তেজনা ও বিভাজন বহাল রেখেছে এবং অর্থোডক্স রাশিয়া ও ক্যাথলিক পোল্যান্ডের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভাজন ও ঘৃণাকে স্থায়িত্ব দিয়েছে, যা ভূ-রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করেছে।

গত শতকগুলোতে ইউরোপিয়ানরা বাস্তবে 'ইউরোপ' বলতে বোঝাতো পশ্চিম ইউরোপকে। তারা এমনকি পূর্ব ইউরোপকে ভিন্ন জগত (সাম্প্রতিক ঘটনাবলির সাথে সম্পর্কহীন স্থান) বিবেচনা করত, বাকি ইউরোপের সাথে খুব কমই একীভূত করত। কেবল চেক, পোল ও হাঙ্গেরিয়ানদের ক্যাথলিক বা প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কৃতিই সভ্য ইউরোপের সীমানার মধ্যে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতো। পূর্ব ইউরোপ, ক্যাথলিক ও অর্থোডক্স উভয়েই, যখন সোভিয়েত সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, দুই বিশ্বের মধ্যকার সাংস্কৃতিক ব্যবধান আরো বেড়ে যায়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ক্যাথলিক বা প্রটেস্ট্যান্ট বিশ্বাসের দেশগুলোর চেয়ে পূর্ব ইউরোপের অর্থোডক্স দেশগুলোকে একীভূত করার চেষ্টায় অনেক বড় সমস্যায় পড়ে। অর্থাৎ চেক প্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরিকে হজম করা ইউরোপের জন্য ছিল অনেক সহজ; অর্থোডক্স রোমানিয়া, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া এবং অবশ্যই ইউক্রেন ও রাশিয়া হলো অনেক বেশি অনিশ্চিত সংখ্যারাশি চরিত্র।

চার্চ শাস্ত্রাচার ও শিল্পকলাতেও সাংস্কৃতিক পার্থক্য ফুটে ওঠে। ইস্টার্ন শাস্ত্রাচারের কঠোর জর্জিয়ান সঙ্গতিবিহীন ভজন বাদ দিয়ে ওয়েস্টার্ন চার্চ শাস্ত্রাচারে মিউজিক্যাল সরঞ্জাম অনুমোদন করেছে পাশ্চাত্য। স্থাপত্যে, অর্থোডক্স চার্চের ঐতিহ্যবাহী গম্বুজবিশিষ্ট চার্চ ডিজাইন (মসজিদের অনেক ডিজাইন আত্মস্থ করে নিয়েছিল) পরিত্যাগ করে অর্থোডক্সের দৃষ্টিতে গথিক স্থাপত্যকৌশলের দৃশ্যত 'পেলবতাবর্জিত ও সূচালো ডগাযুক্ত' রীতি গ্রহণ করেছে। ধর্মীয় শিল্পকলায় প্রাচ্য বায়জান্টাইন বিশ্বের বাস্তবের সম্পর্কমুক্ত ও জাঁকজমকপূর্ণ অবয়বের পেইন্টিং অনুসরণ করছে, যা পাশ্চাত্য ধর্মীয় পেইন্টিংয়ের সাথে অনেক ব্যবধানের। সেখানে ধর্মীয় পেইন্টিংসে বাস্তববাদ ও আক্ষরিকতায় তাদের অনেক সাহসী (ব্লাসফেমিমূলক?) প্রতিকৃতি অঙ্কনে, এমনকি ঈশ্বর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচরে আসে।

নতুন রাশিয়া

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর ছাই থেকে আবির্ভূত নতুন রুশ রাষ্ট্র তার ঐতিহ্যবাহী পরিচিতি এবং রুশ অর্থোডক্স চার্চের স্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সোভিয়েত আমলে চার্চ ভয়াবহ বিপর্যয়ে পড়লেও এবং রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতাপূর্ণ বিপুলভাবে রাজনীতিকৃত ধর্মানুষ্ঠানে ভারাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির মতোই পাশ্চাত্যের প্রতি সনাতন ভয় ও বিদ্বেষ পোষণ করত। চার্চ ভয় করত ক্যাথলিক ধর্মকে, আর মার্কসবাদ-লেনিনবাদভিত্তিক কমিউনিস্ট পার্টি পাশ্চাত্যকে বিবেচনা করত পুঁজিবাদের দুর্গ। উভয়ই রুশ রাষ্ট্রকে উৎখাত করার লক্ষ্যে পাশ্চাত্য থেকে একের পর আক্রমণের ইতিহাস সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই সচেতন ছিল।

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি টিকে থাকে। আমরা আবারো যখন নতুন রুশ ফেডারেশনের মধ্যে নবশক্তিলব্ধ অর্থোডক্স চার্চের মতো করেই পাশ্চাত্যের প্রতি ওই একই ধরনের ভীতি, সন্দেহ ও বিদ্বেষের পুনর্জীবন দেখতে পাই, তখন তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকে না। সোভিয়েত-পরবর্তী রুশ রাষ্ট্র খুব দ্রুত রুশ জাতীয়তাবাদের প্রতীক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অর্থোডক্স চার্চকে গ্রহণ করে নিয়েছে। চার্চটি এখনো ধর্ম, মোক্ষ, গোত্রীয়তা ও জাতীয়তাবাদের প্রাচীন মিশেলে জাতীয়তাবাদী অনুভূতি চাঙ্গা করার জন্য চৌম্বকীয় শক্তিসম্পন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে থাকে।

পাশ্চাত্যের প্রতি অর্থোডক্স চার্চের হালের ভীতি ভিত্তিহীন নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর সোভিয়েত-পরবর্তী আধ্যাত্মিক শূন্যতা পূরণের জন্য ওয়েস্টার্ন রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারিগুলো অর্থোডক্স বিশ্বাসীদের ক্যাথলিক বা প্রটেস্ট্যান্টে ধর্মান্তরিত করার জন্য দ্রুত ছুটে গেলে আবেগ তীব্র হয়ে উঠেছিল। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক দুর্ভোগ মারাত্মক হয়ে পড়ার সময় অর্থোডক্স বিশ্বাসীদের ধর্মান্তকরণ সহজ করার জন্য বিপুল পরিমাণ পাশ্চাত্য তহবিল ঢালা হয়েছিল। অর্থের বিনিময়ে ধর্মান্তর করা এবং ক্যাথলিক ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থোডক্স বিশ্বে প্রবেশের কয়েক শ’ বছরের পুরনো লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা চালানোর জন্য রোমকে অভিযুক্ত করেন রুশ প্যাট্রিয়াক। রাশিয়ার এক পাশ্চাত্য পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেছিলেন :

এখানে এই রাজধানীতে এবং সেইসাথে সেন্ট পিটার্সবার্গ এবং অন্যান্য বড় রুশ নগরীতে যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ, কোরিয়া ও ভারত থেকে আসা ধর্মপ্রচারক, ধর্মান্তরিত ব্যক্তি, চার্চ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং মুসাফির গুরুদের মিছিল না দেখে থাকতে পারাটা কঠিন ব্যাপার। তাদের সাবওয়ে স্টেশনে বাণীভর্তি ওয়ালপেপার, মেইনবাক্সে লাইন, রেডিও ও টিভি সম্প্রচারের বৃষ্টি এবং ক্যাম্পাস ক্রুসেডে কৌতূহল আকৃষ্ট করা...। অনেক রুশই যে বিদেশী 'ঈশ্বর বাহকদের' জন্য অরক্ষিত ও অপ্রস্তুত হওয়াটা অনুভব করেছিল, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অনেকেই ধর্মীয় বন্যা পুরোপুরি বন্ধ না করতে পারলেও কমাতে চেয়েছিল। সম্প্রতি রুশ পার্লামেন্টে ধর্মীয় স্বাধীনতা আইনে যে দুটি সংশোধনী আনা হয়েছে, সেটা এসব অনুভূতিকেই প্রতিফলিত করেছে।

২০০১ সালে ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব রুশিয়ান পিপলসে অনেক বক্তাই রাশিয়ায় অপরিচিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতবাদ বিস্তারের কথা উল্লেখ করেছেন। রুশ পার্লামেন্টে রাশিয়ায় বিদেশী ধর্মান্তরের স্বাধীনতা সীমিত করার যে আইন পাস হয়েছে, সেটার লক্ষ্য ওয়েস্টার্ন খ্রিষ্টধর্ম, ইসলাম নয়। বেশির ভাগ রুশ বহিরাগত শক্তিগুলোর (যাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সন্দেহজনক) বিরুদ্ধে স্থানীয় বিশ্বাসকে রক্ষা করার এই ব্যবস্থাকে প্রবলভাবে সমর্থন করে। ফলে ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট এবং বিশেষ করে ইভানজেলিক্যাল চার্চগুলোকে রাশিয়ায় ধর্মান্তকরণ, চার্চ খোলা বা সংগঠিত করার কাজটি কঠিন করে দিয়েছে অর্থোডক্স চার্চ। আবারো বলছি, সনাতন জাতীয় ধর্ম পরিণত হয়েছে সাংস্কৃতিক গর্ব ও জাতীয়তাবাদের প্রধান বাহনে; মুসলিম বিশ্বের মধ্যেই ঠিক একই ধরনের গর্বকারী ভূমিকা দেখা যায়, যখন ধনী ও শক্তিশালী পাশ্চাত্যের মুখোমুখি হয় মুসলিম সম্প্রদায়। তারাও মনে করে পাশ্চাত্য ইসলামকে দুর্বল করার জন্য কাজ করছে। এটা আসলে ধর্মের ব্যাপার নয়, বরং পরিচিতি, ঐতিহ্যের বিষয় :

গর্বভরে, [অর্থোডক্স চার্চ] বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, মিউজিক, সন্ন্যাসী ও মূর্তিতত্ত্বের ১,০০৫ বছরের পুরনো ঐতিহ্যের কথা বলে। অর্থোডক্স চার্চকে রাষ্ট্রীয় চার্চে পরিণত করেনি, তবে অর্থোডক্সির অনেকে নিজেদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম বিবেচনা করে। তাদের যুক্তি হলো, রাশিয়া কেবল অর্থোডক্সই হতে পারে এবং ঐতিহাসিকভাবে এটা একটা রাষ্ট্রীয় চার্চ। রুশ রাষ্ট্র তা-ই রুশ অর্থোডক্স চার্চের চমকপ্রদ সাংস্কৃতিক বাহনের মাধ্যমে তার জাতীয়তাবাদ, জাতীয় ঐতিহ্য এবং বিশেষ করে গৌবরগাথা পুনরুজ্জীবিত করছে।

খ্রিষ্টান থিমগুলো এখন এক সময়ের নাস্তিক সোভিয়েত রাজনৈতিক দৃশ্যপটে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; সোভিয়েত-পরবর্তী আমলে খুব কম রাজনীতিবিদই ধর্মীয় মূল্যবোধের গুরুত্ব এড়িয়ে যেতে পেরেছেন। রাজনৈতিক আন্দোলন ইয়াবলোকোর প্রধান গ্রিগোরি ইয়ালিনস্কি মন্তব্য করেছেন যে, 'বিশ্বাসের ঘাটতি হলো দুর্নীতি ও আমলাতন্ত্রের মুখবন্ধ, যা সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করে।... যে জাতি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না, সেখানে অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পূর্ণ অসম্ভব।'

রুশিয়ান ইউনিয়ন অব রাইটার্সের চেয়ারম্যান লেখক ভ্যালেরি গ্যানিচেভ ‘রাশিয়া পাশ্চাত্য সংস্কৃতি থেকে আত্মস্থ করা অমরত্বের কোষগুলো ক্লোন করছে’ বলে জানিয়ে তার ভীতির কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি ‘জাতিকে কলুষতার হাত থেকে রক্ষায় সহায়তা করার জন্য’ সরকারের প্রতি গণদাবির কথাও জানান। তথাকথিত তিক্ত ‘ইউনিয়েট’ বিতর্কের মধ্যে এসব উত্তেজনা আরো জোরালো হয়েছে, ইউক্রেন ও বেলোরুশিয়ার নেস্টোরিয়ান ও মনোফাইসিট চার্চগুলোর নিয়ন্ত্রণ কে নেবে তা নিয়ে ক্যাথলিক ও অর্থোডক্সির মধ্যে দ্বন্দ্বও চলছে। এই ইস্যুটি এখন রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার ভূ-রাজনৈতিক সংগ্রামের অনিবার্য কাঁটা হিসেবে বিরাজ করছে।

অর্থোডক্সির ঘুরে দাঁড়ানো

ধর্মান্তর দু'মুখো সড়ক হতে পারে এবং এবং অর্থোডক্স চার্চ বিশ্বজুড়ে অর্থোডক্সির প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এবং অন্যান্য খ্রিষ্ট উপদল থেকে তার নিজস্ব 'শুদ্ধতর' ধর্মীয় বাণীতে বেশি বেশি হারে ধর্মান্তরে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। সে ঘোষণা করছে, ধর্ম হলো আধ্যাত্মিকতার ব্যাপার, ঈশ্বরের রহস্যময়তা, যা কারো জীবনে ঈশ্বরপ্রেম দিয়ে পূর্ণ করতে উদ্দীপনা জোগায়, এমনকি ব্যক্তিগত জীবনে তাকে ঈশ্বরে পরিণত হওয়ার (ঈশ্বরের সাথে লীন হওয়া) সংগ্রামে পর্যন্ত উদ্দীপ্ত করে। মোক্ষ এই জীবনেও আসতে পারে এবং পরকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করার প্রয়োজন না-ও হতে পারে, পবিত্রাত্মা যদি ব্যক্তিকে পাপ থেকে মুক্ত করে আত্মাকে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করতে পারে। গির্জার প্রার্থনা অনুষ্ঠান তা-ই ঈশ্বরের রহস্যময়তায় হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করে; ধূপ, ভজন, চমকপ্রদ মূর্তিতত্ত্ব, ধর্মীয় পোশাকের বৈভব, ভাবাবিষ্ট উল্লাস বিকাশের মাধ্যমে রোমাঞ্চ ও উদ্দীপনা প্রাপ্তি ঘটে; ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরকে ধারণ, বিশ্বাসের গভীরতায় রহস্য অবলোকন সমৃদ্ধ করা, পরকালের জন্য অপেক্ষার বদলে এই দুনিয়ায় ঈশ্বরের ঐশ্বরিক শক্তিকে জানা ও ধারণ করার অনুভূতি- সব কিছুই ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় আত্মাকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রণীত। অর্থোডক্স বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে, চার্চের এসব আধ্যাত্মিক গুণাবলি উষ্ণমাত্রার সেকুলার পরিবেশে (পাশ্চাত্যে যেখানে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট চাচগুলো কাজ করে) অনেক সময় হাল ফ্যাশনের অনুসারী হয়ে 'সামাজিক' উদ্বেগ এবং রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নেয়ায় ম্লান হয়ে যায়। আমেরিকান স্কলার নিকোলাই পেত্রো অভিমত ব্যক্ত করেছেন, '২১ শতকের ইউরোপ কোনো ধরনের ধর্মীয় রূপ সৃষ্টি করলে সেটা হবে সর্বাধিক শক্তিমান ইস্টার্ন অর্থোডক্সি।' তিনি মূলত এর মধ্যে থাকা আধ্যাত্মিক গুরুত্বের কথাটি উল্লেখ করেছেন।

অর্থাৎ সঠিক অর্থে অর্থোডক্স ও ল্যাতিন খ্রিষ্টান বিশ্বের মধ্যকার বিভাজন অনেক প্রাচীন এবং তা অনেকভাবেই ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের মধ্যকার ব্যবধানের চেয়েও বেশি। উভয়েই শক্তির ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রভাবিত হয়েছে এবং ধর্মতত্ত্বকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতীক বা বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছে। ধর্মতাত্ত্বিক পার্থক্য অবশ্যই অস্তিত্বশীল রয়েছে, তবে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি-রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদের শক্তিগুলোর সম্পর্কের মাধ্যমে নতুন বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছে।

এসব আবেগের আরো অবাক করা প্রতিধ্বনি পাওয়া যেতে পারে বর্তমান লেবাননের ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর (সুন্নি, শিয়া, ম্যারোনাইট ক্যাথলিক, রোমান ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট, ইস্টার্ন অর্থোডক্স, দ্রুজ এবং অন্যরা) ঘিঞ্জি ধর্মীয় বর্ণচ্ছটায়। এদের মধ্যে বিশেষ করে ইস্টার্ন অর্থোডক্স খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনীতির প্রতি সর্বোত্তম সহজাত অনুভূতি ধারণ করে। লেবাননের পররাষ্ট্রমন্ত্রিত্বটা সব সময় অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত থাকাটা কাকতালীয় কোনো ব্যাপার নয়। ইস্টার্ন অর্থোডক্স লেবাননিরা সহজাতভাবেই খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলামের মধ্যকার ভারসাম্য এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সক্রিয় সূক্ষ্ম পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করতে পারে। অন্য যেকোনো খ্রিষ্টান উপদলের চেয়ে তারাই মুসলমানদের আস্থা বেশি উপভোগ করে। এই অর্থোডক্স স্পর্শকাতরতার উদ্ভব ঘটেছে পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রতি কিছুটা উদ্বিগ্নতা এবং মুসলিম ও অর্থোডক্সের মধ্যকার সম্পর্ক যখন পুরোপুরি হৃদ্যতাপূর্ণ থাকে না, তখনো সুনির্দিষ্ট ঘনিষ্ট অতীত এবং অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতনতা থেকে। প্রাচ্যের মনোভাব স্রেফ ইসলামের সীমাকে ছাড়িয়ে যায়।

অধ্যায় আট

রাশিয়া ও ইসলাম : বায়জান্টিয়াম জীবনযাত্রা!

রাশিয়া নিজে প্রায় এক হাজার বছর ধরে ঘনিষ্ঠভাবে ইসলামের সাথে বসবাস করছে; পাশ্চাত্যের যেকোনো দেশের চেয়ে তাদের মুসলিম জনসংখ্যা বেশি, প্রায় দুই কোটি। অর্থাৎ দেশটির মোট জনসংখ্যার ১২ থেকে ১৫ শতাংশ মুসলমান। অধিকন্তু, এসব মুসলমান পশ্চিম ইউরোপের মুসলমানদের মতো অভিবাসী নয়, বরং তারা আদিবাসী জনগোষ্ঠী, রুশ বিজয়ের ফলে তারা রুশ সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়েছে। নতুন রুশ ফেডারেশনে মুসলমানরা বৃহত্তম ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছে, এবং অর্থোডক্সির পর রাশিয়ায় দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হিসেবে বিরাজ করছে। পুরো পাশ্চাত্যের যেকোনো নগরীর চেয়ে মস্কোতে সবচেয়ে বেশি মুসলমান বাস করে। বৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যার ওপর ভর করেই রাশিয়া এখন মক্কাভিত্তিক প্যান-ইসলামি ইসলামিক কনফারেন্স অরগাইজেশনের পর্যবেক্ষক হতে চায়।

সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বাস্তবতা হলো রাশিয়ায় বলতে গেলে সব মুসলমানই জাতিগতভাবে অ-রুশ, অর্থাৎ তারা অন্য জাতিগোষ্ঠীর, মূলত তুর্কি গ্রুপের। এই একই তুর্কো-তাতার-মঙ্গোল জনগোষ্ঠীর লোকজনের অনেকে ১৩ শ' শতকে রাশিয়া আক্রমণ করেছিল, কয়েক শ' বছর মুস্কোভি শাসন করার সময় তাদের কঠোর শাসনের কথা এখনো স্মরণে রয়েছে। অর্থাৎ রাশিয়ায় ধর্মীয় পার্থক্য নিশ্চিতভাবেই জাতিগোষ্ঠীগত পার্থক্যও বোঝায়, যা পৃথক অবস্থান জোরদার করার একটি শক্তিশালী উপাদান। অর্থাৎ তারা যে মুসলমান, এই তত্ত্বের চেয়ে তারা যে তুর্কি জাতিগোষ্ঠীর সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আর মুসলিম তুর্কি ও আরবদের বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটানোর কারণে যৌক্তিকভাবেই এটা ধরে নিয়ে রুশরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর বৈরী হবে। কিন্তু তারা কনস্টানটিনোপল পতনের জন্য ইসলামকে দায়ী বলতে গেলে করেই না। আমরা কি সত্যিই বিশ্বাস করতে পারি, যদি উসমানিয়া তুর্কিরা মুসলিম না হতো, তারা আক্রমণ চালাত না, গ্রিক বায়জান্টিয়াম জয় করত না (ধনী ও দুর্বল বায়জান্টিয়াম যে ধর্মেরই অনুশীলন করত না কেন)?

সোভিয়েত আমলের কঠোর নাস্তিক্য নীতি ছিল সোভিয়েত মাটির সব ধর্মকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রণীত। কিন্তু সোভিয়েতরা ইসলামের অনুশীলন ভয়াবহভাবে দুর্বল করে দিতে পারলেও সেটাকে ধ্বংস করতে পারেনি। এবং সম্ভাবনা অনুযায়ীই, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরপরই ইসলামের নতুন অভ্যুদয় মস্কোর জন্য একটি প্রধান ইস্যু হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। ছয়টি মুসলিম প্রজাতন্ত্র রুশ রাষ্ট্রের সাথে থাকতে না চেয়ে তাদের স্বাধীনতা অর্জন করে। এগুলো হচ্ছে মধ্য এশিয়ান 'স্থান'-ওয়ালারা ও আজারবাইজান। রাশিয়া তার নিজের মুসলিম জনসংখ্যাকে পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রথমে শত্র", তারপর জার রাষ্ট্রের স্তম্ভ, বা রুশ সাম্রাজ্যের অনুগত সদস্য হিসেবে, কিংবা প্রাচ্যে কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্ভাব্য নেতা হিসেবে কিংবা অবিশ্বস্ত জাতীয়তাবাদী, বিপজ্জনক বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সন্ত্রাসী হিসেবে, কিংবা আবারো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য মিত্র বিবেচনা করেছে। রুশ উদাহরণটি আরো দেখাচ্ছে, বিভিন্ন দিক থেকে মুসলমানরা কিভাবে খ্রিস্টান দেশের সহিংসভাবে পরিবর্তনশীল রুশ বাস্তবতার মধ্যে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। তারা হয়তো এখনো কিছু কিছু ভূ-রাজনৈতিক অভিন্নতা আবিষ্কার করে চলেছে।

সমাজতন্ত্র পতনের পর নাস্তিকতা প্রচারণা বন্ধ হলে এবং বৃহত্তর স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক স্বায়াত্তশাসনের ফলে রুশ ফেডারেশনে ইসলাম বেশ শক্তি নিয়েই ওঠে দাঁড়ায়। সাবেক ইউএসএসআরের বাইরে থেকে মুসলিম অ্যাক্টিভিস্টরা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামি ধারণা প্রচারের জন্য রাশিয়ায় প্রবেশ করে। তাদের বেশির ভাগ অহিংস হলেও কেউ কেউ অতিমাত্রায় সহিংস। রুশ মুসলিম জনগোষ্ঠীর এ ধরনের ধর্মীয় মিশনের খুবই দরকার ছিল। কারণ সোভিয়েত নির্যাতনে তিন প্রজন্ম ধরে তাদের বেশির ভাগেরই ধর্মীয় রীতি-নীতি, সেগুলোর অর্থ এবং এমনকি মৌলিক ইবাদতগুলো কিভাবে পালন করতে হয়, তা-ও ভুলে গিয়েছিল। পুরো রাশিয়াজুড়ে বিশাল আধ্যাত্মিক শূন্যতা দেখা দেয়, সবাই নতুন আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু এবং তাদের জীবনের অর্থ জানতে প্রবলভাবে আগ্রহী ছিল।

বাহিরাগত ইসলামপন্থীদের সাথে যোগাযোগের ফলে রুশ মুসলিমদের তাদের ধর্ম সম্পর্কে সচেতনতা তীব্র হওয়ার পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের সাথে তাদের ঐতিহাসিক বন্ধনও তারা জানতে পারে। মুসলমানরা এখন আবার মক্কায় হজ করতে যাওয়া শুরু করে, এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তারা প্রেক্ষাপটজুড়ে থাকা সমসাময়িক ইসলামি চিন্তাধারার সাথে নিজেদের আবার পরিচিত করে, মুসলিম বিশ্বের সাথে নিজেদের আবার আত্তীকরণ করে, যা এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে রাশিয়ার মুসলমানদের অনেক বেশি রাজনীতিপ্রবণ করে ফেলেছে। এসব নতুন ইসলামি ধারার কোনো কোনোটি চরমপন্থী হলেও বেশির ভাগই অহিংস। তবে উত্তর ককেসাস এখনো বড় ধরনের ব্যতিক্রম রয়ে গেছে। সেখানে চেচেনসহ নানা ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠী রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ১৫০ বছর স্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রাম আবার শুরু করেছে, আবারো ইসলাম কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ১৯৯০-এর দশকে রুশ সৈন্যদের হাতে তাদের নৃশংস পরিণতি বিচ্ছিন্নতাকামী অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষায় পরিণত হয়। রুশ সৈন্যদের হাতে চেচেন রাজধানী গ্রোজনি এবং অন্যান্য নগরী ধ্বংস হয়, লাখ লাখ লোক নিহত

হয়। সাথে সাথেই নগরী আবার নির্মিত হয় এবং মস্কো বিজ্ঞতার সাথে রাশিয়ার মধ্যে রেখেই চেচনিয়াকে বেশ বড় ধরনের স্বায়াত্তশাসন দেয়। কিন্তু তারপরও চেচেনদের বিপুল রক্তক্ষরণ ঘটায় হতাশ ও ক্ষুব্ধ চেচেন যোদ্ধাদের অনেকে আল-কায়েদাসহ আরো বেশি চরমপন্থী ইসলামকে গ্রহণ করে।

আর এতে মনে হতে পারে, স্বাধীনতার জন্য চেচেনদের দীর্ঘ সংগ্রাম সম্ভবত কখনো শেষ হবে না। এই সংগ্রাম সম্ভবত রাশিয়ার অন্য সব মুসলমানদের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বশীল নয়। তবে এবার সশস্ত্র সংগ্রামের বৈশিষ্ট্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। অতীতে সুফি ভ্রাতৃত্ব ছিল স্বাধীনতা প্রয়াসের সামনের সারিতে। মরমি আন্দোলনগুলো তাদের সংস্কৃতি বাইরের শক্তির কারণে হুমকির মুখে পড়লে প্রয়োজন অনুযায়ী সশস্ত্র প্রতিরোধের আশ্রয় নেয়। এবার অনেক আন্তর্জাতিক মুসলিম জিহাদি, বিশেষ করে বসনিয়া, কাশ্মির বা আফগানিস্তানের যুদ্ধে অভিজ্ঞরা চেচনিয়ায় গিয়ে তাদের সমর্থন দিচ্ছে এবং আরো চরমপন্থী জিহাদি মতাদর্শ প্রচার করছে।

অনেক সময় অধিকতর ঐতিহ্যবাহী সুফি যোদ্ধা এবং নতুন ইসলামপন্থী গ্র"পগুলোর (তাদেরকে নির্বিচারে 'ওয়াহাবি' হিসেবে অভিহিত করা হয়) মধ্যে সঙ্ঘাত ছড়িয়ে পড়ে। চেচনিয়ায় রুশ নৃশংসতার প্রতিশোধ নিয়ে মাঝে মধ্যে সন্ত্রাসীরা রাশিয়ার প্রাণকেন্দ্রে আঘাত হানে। রুশদের বিরুদ্ধে চেচেন সন্ত্রাস সম্ভবত রাশিয়ায় বর্তমান ইসলামফোবিয়ার (ইসলামাতঙ্ক) বৃহত্তম উৎস।

৯/১১ এবং ওয়াশিংটনের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধ' ঘোষণার পর মস্কো ও বেইজিং তাতে সুর মিলিয়ে তাদের নিজস্ব স্থানীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ইসলামপন্থীদের সন্ত্রাসী ঘোষণা করে; 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' এমন কঠোর নীতি বাস্তবায়নের বৈধতা দিয়ে দেয়, যা ভিন্ন পরিস্থিতিতে হলে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হতো। উজবেকিস্তান ২০০৫ সালের মে মাসে উজবেক সরকার ইসলামপন্থী বিক্ষোভকারীদের সমাবেশে উচ্ছৃঙ্খল লোকদের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে কয়েক শ' মানুষকে হত্যা করে। তাদের সবাইকে 'ওয়াহাবি' হিসেবে অভিহিত করা হয়। উজবেক রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে তাদের সাথে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের যোগসাজস আছে বলে বলা হয়। কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল, তারা মূলত দেশীয় ইসলামপন্থী ভিন্নামতালম্বী, উজবেক সরকারের কঠোর স্বৈরতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিবাদ তারা করছে।

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সাবেক ইউএসএসআর এবং বর্তমান রাশিয়া মুসলমানেরা এখন বৈশ্বিক মুসলিম চিন্তাধারার প্রবাহের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মিশে গেছে। ইসলামি পরিচিতি বাড়ছে, যদিও রুশ ফেডারেশন এবং এর বহু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আবদ্ধ। নিপীড়নমূলক পরিবেশের মধ্যে ইসলাম অভিন্ন পরিচিতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের ব্যবস্থা করে, যা বৈচিত্র্যময় রুশ মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা

করে। কিন্তু এটা ধরে নেয়া ভুল হবে, ইসলাম মুসলমানদের মধ্যকার সব জাতিগত ও ভাষাগত ব্যবধানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। এমনকি জাতিগত তুর্কি জনগোষ্ঠীগুলো পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত, তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রবল তুর্কি রাজনৈতিক সংহতি দেখা যায়নি, ইসলামি সংহতি তো অনেক দূরের কথা। ফলে ইসলাম কেবল সাময়িক ঐক্যবদ্ধকরণ উপাদান। এটা কতটা জোরালো হবে তা নির্ভর করে রাশিয়ার নীতির ওপর। তবে এটাও যথেষ্ট পরিষ্কার, রাশিয়ার তুর্কি জনগোষ্ঠী যদি মুসলমান না হতো, তবুও তারা শক্তিশালী স্বাধীন পরিচিতি বজায় রাখত, জাতীয়তাবাদ ও রুশ অপশাসনের যুগে সম্ভবত বিচ্ছিন্নতাবাদে উদ্দীপ্ত হতো।

ইসলাম কিভাবে রুশ শাসনের অধীনস্থ হলো? এমনকি খ্রিষ্টধর্মেরও আগে ইসলাম রাশিয়ার কোনো কোনো অংশে পৌঁছে গিয়েছিল। ইসলামের সাথে রাশিয়ার প্রাথমিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যুদ্ধক্ষেত্রে, রুশ সাম্রাজ্য মুসলিম তুর্কি রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে জয় ও আত্মস্থ করার লক্ষ্যে অপ্রতিরোধ্যভাবে দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত হতে শুরু করলে। অন্যতম নাটকীয় ঘটনা ছিল ইভান দ্য টেরিবলের ১৫৫২ সালে তাতার খানেত রাজধানী কাজান দখল। (মুসোরগস্কির অপেরা বরিস গডুনভের মদ্যপ সন্ন্যাসী ভারলাম একক কণ্ঠসঙ্গীতে অবরোধের প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন।)

আসলে অর্থোডক্স চার্চ মিলিট্যান্টই (পৃথিবীতে অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত গির্জা) সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম কাজান খানেতে খ্রিষ্টধর্ম প্রসারের লক্ষ্যে প্রাচ্য জয় করার জন্য রুশ অভিযানকে উদ্দীপ্ত করেছিল। জয়ের পরপরই চার্চ তাতার অঞ্চলগুলোতে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা এবং সেখানকার মুসলিম জনগোষ্ঠীকে শক্তিপ্রয়োগে অর্থোডক্স খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার পরিকল্পনা করে। রাশিয়ার কাজান বিজয় ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ 'সভ্যতাগত ঘটনা', নতুন অঞ্চল ও নতুন জনসংখ্যার ওপর রুশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং মস্কোর শাসককে জারে (বা সিজার) রূপান্তরিত করার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অর্থোডক্স বিশ্বাস প্রচারে জারের ভূমিকা থেকেই তার বৈধতা ও ক্ষমতা উদ্ভূত বলে বিবেচনা করা হয়। চার্চের মেট্রোপলিটান (রাজধানীর চার্চের আর্চবিশপ) ম্যাকারি এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

ম্যাকারির প্রভাবে খানেতের বিরুদ্ধে যুদ্ধটি লড়া হয় চার্চ মিলিট্যান্টের ধর্মীয় যুদ্ধ হিসেবে। সামরিক বাহিনীর কৌশলী অভিযান শুরু হওয়ামাত্র তিনি কাজানের কাছে মস্কোভাইট ফ্রন্টে সভিয়াজস্কে মোতায়েন ইভানের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে আরো বেশি ধর্মীয় আচরণ প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে তাদের পবিত্র কাজের জন্য ঈশ্বরের আর্শীবাদের প্রতিশ্র"তি দেন, কারণ কাজানের তাতাররা 'ঈশ্বরের বাণীর কলঙ্ক' এবং বিশ্বাসের 'অবমাননা'। ম্যাকারি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, মুসলমানদের অধার্মিকতার কারণে তাদের ওপর 'ঈশ্বরের ক্রুদ্ধ অভিশাপ' অবতীর্ণ হবে, যা [রুশ] সেনাবাহিনীর জয় এনে দেবে, অর্থোডক্সের পবিত্র রক্ষাকারী হিসেবে তাদের নতুন ভূমিকা বাস্তবায়ন করবে।

উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, ক্রুসেডারদের মতোই, প্রাথমিক রুশরাও মুসলমানদের অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী ভাবেনি, বরং তাদেরকে খ্রিষ্টধর্ম থেকে বিচ্যুত বিবেচনা করেছে।সদ্য জয় করার অঞ্চলে চার্চ, মঠ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও মুসলিম ভূমিতে খ্রিষ্টধর্ম চাপিয়ে দেয়ার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।মুসলিম তাতারদের জয় ও ধর্মান্তরিত করাকে চার্চ একটি পবিত্র মিশন বিবেচনা করলেও মস্কোভাইট সেটা করেনি। সামরিক অভিযান ছিল পুরোপুরি রাষ্ট্রশক্তির সম্প্রসারণ। এসব তাতার এলাকা মুসলিম না হলেও মস্কো তখন তাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকত। তা-ই মস্কোর কাছে ধর্মান্তর ছিল আসলে সাম্রাজ্যিক সম্প্রসারণের একটা অজুহাত মাত্র। তবে মস্কোর জাররা এ ধরনের একটি বিশাল ও প্রতিষ্ঠিত জনসংখ্যাকে, বিশেষ করে ধর্মান্তর প্রতিরোধে ইসলামের সামর্থ্যের কারণে ধর্মান্তর প্রয়াসের জটিলতা শিগগিরই উপলব্ধি করতে পারলেন। ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনাও ছবিতে ঢুকে পড়ল : খানেতের মুসলমানদের ওপর ধর্মীয় দায়দায়িত্ব প্রয়োগ করায় উসমানিয়া সালতানাত তাদের কল্যাণের ব্যাপারে তার উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। জার তাকে আশ্বস্ত করে জানালেন, তিনি তাদেরকে ইসলাম ধর্ম অনুশীলন অব্যাহত রাখতে দেবেন। অর্থোডক্স ধর্মীয় উত্তেজনার ওপরে স্থান পেল মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা।এমনকি বিজয়ী খ্রিষ্টান ও বিজিত মুসলমানদের মধ্যে সহাবস্থানমূলক একধরনের নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠল। ১৮ শতকের শেষ দিকে সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন দি গ্রেট সত্যি বলতে কী, ইসলাম হটিয়ে দিয়ে সব মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করার চার্চের ইচ্ছাকে ধমকিয়ে ক্ষান্ত করেন। চার্চের সে ইচ্ছা বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হলে নিশ্চিতভাবেই সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমাহীন বৈরিতা ও বিদ্রোহ সৃষ্টি করত। এর বদলে রুশ সাম্রাজ্যিক বহু-সংস্কৃতিবাদের গতিশীল নতুন পরীক্ষায় মস্কোভি বরং সাম্রাজ্যের কাঠামোতে ধর্মটিকে তালিকাভুক্ত করে ইসলামকে জাতীয় সংহতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতায় অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ক্যাথেরিন এমন এক উদার মানসিকতা ও সহিষ্ণু নীতি গ্রহণ করেন, যাতে বৃহত্তর সাম্রাজ্যিক নীতিতে বিরাজমান ইসলামের ধর্মীয় ও সেক্যুলার কাঠামোগুলো স্থান পায়। এক ঈশ্বর এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার আলোকিত ধারণা অভিন্নভাবে গ্রহণ করার ভিত্তিতে ধর্ম হবে সাম্রাজ্যিক রাজনীতি ও সামাজিক সংস্থা। মস্কো প্রতিটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষকে সাম্রাজ্যিক শাসনের হাতিয়ারে রূপান্তরিত' করতে চেয়েছিল। অর্থাৎ রুশ সাম্রাজ্যিক পরিকল্পনাটি ছিল জাতিগত গ্র"পের বদলে সাম্রাজ্যের মৌলিক

সামাজিক-রাজনৈতিক ইউনিট হিসেবে ধর্মীয় সম্প্রদায় সৃষ্টিকে বিকশিত করা। (এই নীতির ব্যাপারে উসমানিয়া রাষ্ট্র ছিল পথিকৃৎ। তাদের লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আলোকে নিজের সাম্রাজ্য সংগঠন।) রুশ সাম্রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক-ব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত নেতাদের তদারকিতে প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় আনুগত্য রক্ষার মাধ্যমে সর্বোত্তমভাবে সুরক্ষিত। যেকোনো ধর্মের যেকোনো ধরনের ধর্মীয় বা মতাদর্শগত ভিন্নমত একই ধরনের রাজনৈতিক ভিন্নতায় পরিণত হয়-বায়জান্টাইন ইতিহাস থেকে এটা ছিল বিখ্যাত ধারণা। প্রতিটি সম্প্রদায়ের সঙ্ঘবদ্ধতা নির্ভর করত সম্প্রদায়ের পরিচিতির প্রধান বিষয় চ্যালেঞ্জহীন ধর্মীয় বিশ্বাসের অভিন্ন সংস্থা সুরক্ষিত রাখার ওপর। এর বিনিময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে রুশ রাষ্ট্রীয় শক্তির পুলিশি ক্ষমতা ব্যবহার করতেন, ধর্মীয় নিয়মনিষ্ঠতা এবং এর মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন।

কিন্তু ইসলামি দৃষ্টিকোণে মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব নিয়োগে মস্কোর বৈধতা ছিল কতটুকু? খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের হয়ে কর্মরত এবং রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন প্রদানের সাথে সাথেই আলেমদের চূড়ান্ত বৈধতা পুরোপুরি শেষ হয়ে যেত। তারা তাদের স্বাধীনতা হারাতেন, 'পুতুল' হিসেবে অভিযুক্ত হতেন। বস্তুত, রুশ বিপ্লবের সময় মুসলমানদের অন্যতম রাজনৈতিক দাবি ছিল নিজস্ব গ্র্যান্ড মুফতি নিযুক্ত করার অধিকার।

রোমানভ রাজবংশের ৩০০ বছরের শাসনকালে রুশ রাষ্ট্র অব্যাহতভাবে তার শাসনক্ষমতা 'ধর্মীয় ভিত্তিতে' বলে দাবি করত। রোমানভ রাষ্ট্র 'স্রষ্টা-চালিত অভিন্ন ধর্মীয়-ব্যবস্থা'বিষয়ক ধারণা প্রচার করত। এসব নীতি অনেকাংশেই সফল হয়েছে। ইসলামে সেকুলার শাসকেরা যেভাবে বৈধতা দাবি করার জন্য ইসলামি সমাজ ও আইনের নীতিমালা সমুন্নত রাখতেন, ঠিক সেভাবেই অমুসলিম রোমানভরাও নীতিগতভাবে মুসলমানদের শাসক হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতেন, যতক্ষণ তারা মুসলমানদেরকে তাদের ইসলামি জীবনযাত্রা অনুশীলন করতে এবং রুশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামি নীতিমালা সমুন্নত রাখতে দিতেন। মুসলিম প্রজাদেরকে এমনকি তাদের দুর্দশা ও বিরোধ ফয়সালার জন্য জারের কাছে নেয়ার জন্যও উৎসাহিত করা হতো।

আর এর মাধ্যমে জারের বৈধতা প্রদানের পাশাপাশি মুসলিম জনসংখ্যার ঐক্য, কল্যাণ ও সন্তুষ্টি বজায় রাখা হতো। সময়ের পরিক্রমায় প্রত্যাশা এমন ছিল যে, মুসলিম না হলেও রুশ রাজাকে 'বৈধ' বিবেচনা করা হতো, তার আনুগত্য প্রকাশ করত মুসলমানরা। রুশ রাষ্ট্র 'বিশ্বাসের রক্ষক' হিসেব ভূমিকা পালন করত কেবল অর্থোডক্সির জন্যই নয়, সেইসাথে ইসলাম, ইহুদি, বৌদ্ধ এবং পরে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক ধর্মেরও।

জাতিগত পার্থক্য এড়িয়ে ধর্মীয় পার্থক্য স্বীকার করার জারের সিদ্ধান্ত জাতিগত সম্পর্কের বিপরীতে রুশ মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সংহতির বন্ধন জোরদার করেছিল। তবে মুসলিম আনুগত্য পরীক্ষায় পড়ত যখন মস্কোর সামরিক সম্প্রসারণ বাইরের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে সরাসরি সঙ্ঘাতে জড়িয়ে পড়ত। ৩০০ বছরের পরিক্রমায় রাশিয়া ও উসমানিয়ারা অন্তত ৫০টি যুদ্ধে মুখোমুখি হয় এবং মুসলিম পারস্যের বিরুদ্ধে চারটি বড় যুদ্ধে লড়ে (এসব ক্ষেত্রে মস্কো-বিরোধী নীতির কারণে ব্রিটিশ ও ফরাসিরা পারস্যের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে) রাশিয়া। রুশ মুসলমানরা ব্যাপকভাবে তুর্কি ও প্রধানত সুন্নি হওয়ায় তারা পারস্যের চেয়ে উসমানিয়া তুর্কিদের প্রতিই বেশি সহানুভূতিশীল ছিল। কিন্তু তবুও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রুশ বিপ্লবের গোলযোগের আগে পর্যন্ত তাদের আনুগত্য মোটামুটিভাবে জারের প্রতিই ছিল।

রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যকার ইসলাম ও অর্থোডক্স খ্রিষ্টধর্মের এই সহাবস্থান ইসলামি জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা। সাম্রাজ্যের মুসলমানেরা এ কারণে রুশ রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করত যে, তাদেরকে আত্তীকরণ হতে কিংবা রুশ খ্রিষ্টান ধর্মমতের সামনে তাদের ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত পরিচিতি ত্যাগ করতে বাধ্য করা হতো না এবং অবশ্যই রুশ সাম্রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়গুলো কোনোভাবেই সমপ্রকৃতির ছিল না; প্রত্যেকেই তার নিজস্ব স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় বিবর্তিত হতো, ঠিক যেমন তাৎপর্যপূর্ণভাবে হয়েছিল প্রটেস্ট্যান্ট, রোমান ক্যাথলিক, ইহুদি ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়। তাদেরকেও মিশে যাওয়ার জন্য চাপ দেয়া হতো না।

রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্ম বনাম জাতি

অবশ্য তখন কাজ করে গেলেও ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার ধারণাটা সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের কাছে সেকেলে, ভিন্ন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধর্মীয় যুগের একটি পণ্য বিবেচিত হয়েছে। তার পরও প্রশ্ন থাকে, রাষ্ট্রের মধ্যে পরিচিতির ভিত্তি কী হওয়া উচিত? জাতি (ভাষা) না ধর্ম? এই দু'টি ধারণার একটি বা অন্যটি সহস্রাব্দে সবচেয়ে জটিল বহুসাংস্কৃতিক সমাজগুলোতে প্রধান সাংঘর্ষিক মূলনীতি গঠন করেছে। সমসাময়িক পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রের মধ্যে পরিচিতির চালু ধারণা হলো 'নাগরিকত্বের' মাধ্যমে সদস্যপদ দেয়া। এটা অনেকটা 'জিজ্ঞেস কোরো না, বোলো না' ধরনের পরিচিতি। এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তবে তাকে তার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে কিছু প্রকাশ করার দরকার হয় না।

প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলোর সাথে অনেক যুদ্ধ করা সত্ত্বেও রুশ সাম্রাজ্য উসমানিয়া রাষ্ট্র এবং ইরানের সাথে সক্রিয় কূটনৈতিক সম্পর্ক বহাল রেখেছে এবং একই সাথে উসমানিয়া নিয়ন্ত্রণাধীন ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে অর্থোডক্সির আনুষ্ঠানিক রক্ষাকর্তার দায়িত্বও পালন করেছে। বিদেশী মুসলমানদের রাশিয়ার প্রতি অভিমতটির ব্যাপারে রাশিয়া ব্যাপক গুরুত্ব দেয়। মস্কো যাতে খ্রিষ্টান শক্তির পাশাপাশি 'মুসলিম শক্তি' হিসেবেও কথা বলতে পারে সে জন্য মস্কো চায় রুশ মুসলিমরা যেন মধ্যপ্রাচ্যে রুশ পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইসলাম এসব কারণে রুশ রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের ভিশনকে বাধাগ্রস্ত করার চেয়ে বরং সত্যিকারভাবে একে সহায়তাই করে।

অবশ্য, এ ধরনের পরিস্থিতিতে রুশ অর্থোডক্স চার্চ খুশি নয়। তারা রুশ রাষ্ট্রের এমন কোনো সার্বজনীনবাদ অনুমোদন করে না, যা চার্চকে পুরো সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টান লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাধা দেয়। দস্তয়েভস্কির মতো রুশ জাতীয়তাবাদী লেখকেরা অর্থোডক্স চার্চকে রাশিয়ার 'আত্মার' প্রতিনিধি বিবেচনা করেন, তারা মুসলমানদের সাথে রুশ রাষ্ট্রের সমন্বয়সাধনের বিরোধী। দস্তয়েভস্কি 'একেশ্বরবাদের জন্য মুসলিমদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা' করার জন্য রাষ্ট্রের সমালোচনা করেন, যেটাকে তিনি 'তুর্কিদের বিপুলসংখ্যক

প্রেমিকের খেলনা ঘোড়া হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তার করা রাশিয়ার বিধিলিপি।

মুসলমানদের রুশ শাসন গ্রহণের মাত্রাটি নির্ভর করত সংশ্লিষ্ট সময়ে রুশ নীতির ওপর। ব্রেকিং পয়েন্টটি সম্ভবত ১৯১৭ সাল। ওই সময়টাতে মস্কো চূড়ান্তভাবে বলশেভিক বিপ্লবের কাছে নতি স্বীকার করে দীর্ঘ, অসুখী সোভিয়েত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পড়ে। অথচ এর আগের কয়েক শ' বছরে রুশ মুসলিমদের বড় কোনো ব্লক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন সৃষ্টি করেনি। এমনকি মুসলিম প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে রুশ অভিযানের সময়ও নয়। অনেক ক্ষেত্রে বর্তমানের মধ্যপ্রাচ্যের মতো করে মুসলিম যোদ্ধারা (বা জিহাদিরা) তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুশ বৈদেশিক যুদ্ধ ধর্মীয় কারণে সমর্থন করতে না পেরে অনেক রুশ মুসলমান রাশিয়া থেকে তুরস্কে অভিবাসন করে বিরুদ্ধ পক্ষের হয়েও যুদ্ধ করেছে।

আর বিশ্বজুড়ে প্রায় সব সাম্রাজ্যিক শক্তিই কোনো-না-কোনো পর্যায়ে উপনিবেশ শাসনকে সমর্থন করতে এবং স্থানীয় বিদ্রোহ থেকে রক্ষার জন্য স্থানীয় মুসলিম এলিটদের রিক্রুট করার চেষ্টা চালিয়েছে। সেই সূত্রেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে হাপসবার্গ সাম্রাজ্য বলকানের মুসলিম শাসকদের প্রভাবিত করতে চেয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান কাইজার ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে পুরো মুসলিম বিশ্বকে বিদ্রোহ করানোর চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ফ্রান্স (একই রকম ব্যর্থ) আলজেরিয়া জয় ও সম্প্রসারণ করার জন্য ইসলামি বৈধতা কামনা করেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ককেশাস আক্রমণের সময় জার্মানিও একই কাজ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং এর আগে জাপানিরা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম জনসংখ্যার সাথে মৈত্রী গড়ার চেষ্টা করেছিল সেখানকার পাশ্চাত্য সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্যে মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে আরব সমর্থন লাভের চেষ্টায় জেরুসালেমের মুফতির মিত্রতা লাভ করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র তার অজনপ্রিয় নীতি বাস্তবায়নে সহায়তা লাভের জন্য আরব বিশ্বের অনেক অজনপ্রিয় ও অনির্বাচিত শাসককে সমর্থন করে যাচ্ছে। কিন্তু ইউরোপের চেয়ে ইসলামের সাথে রুশ সম্পর্ক অনেক বেশি পুরনো, গভীর, ব্যাপক ও জটিল। এর একটি প্রধান কারণ হলো ইউরোপিয়ান যেসব সাম্রাজ্যবাদী মুসলমানদের মুখোমুখি হয়েছিল, তারা বিজয় সম্পন্ন করেছিল সমুদ্রপথে অনেক দূর থেকে অভিযান চালিয়ে, আর রুশ সাম্রাজ্য মুসলমানদের মোকাবেলা করেছে পূর্ব ও দক্ষিণে সীমান্তসংলগ্ন স্থলভাবে সম্প্রসারণ করতে গিয়ে। ইসলামের সাথে এক ধরনের রুশ সহাবস্থান বজায় আছে এবং সবসময় থাকবে স্রেফ এ কারণে যে, তারা একই স্থানে বাস করে। পাশ্চাত্যে রাশিয়া একমাত্র রাষ্ট্র যে বিপুলসংখ্যক ভূমিপুত্র মুসলিম সম্প্রদায়কে তার নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করেছে।

জাদিদবাদী আন্দোলন

রাশিয়ার মুসলমানরা সবসময়ই সর্বোচ্চ সাংস্কৃতিক স্বায়াত্তশাসন লাভের প্রয়াস চালিয়ে গেছে। তবে এমন এক রাশিয়ার ভেতরে বাস করেছে, যে নিজেই তীব্র বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছে। মুসলমানরাও তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো নিয়ে তীব্র বিতর্ক থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারেনি। রুশ মুসলমানদের মধ্যে ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময় প্রথম বড় ধরনের সংস্কার আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে। জাদিদবাদ (আরবি শব্দ জাদিদ মানে নতুন) নামের ওই আন্দোলনে মুসলিম সমাজের নবজাগরণ কামনা করা হয়। বস্তুত জাদিদবাদ ছিল মুসলিম বিশ্বের প্রথম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম সংস্কার আন্দোলন। এতে রুশ সমাজের বহু-সংস্কৃতির প্রেরণাই সম্ভবত প্রতিফলিত হয়েছিল।

জাদিদবাদীরা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল, কারিকুলামে গণিত ও বিজ্ঞানের মতো ব্যবহারিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রতি জোর দিয়েছিল। এ সময় একের পর এক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, স্থানীয় ভাষায় বইপত্র অনূদিত হয়। কিন্তু রুশ সাম্রাজ্যিক কর্তৃপক্ষ এই আন্দোলনটির উভয় দিক চিন্তা করে দ্বিধায় ভোগে। তার মনে সম্ভাব্য অন্তর্ঘাত, বিচ্ছিন্নতাবাদী বা প্যান-ইসলামি আদর্শবাদের আবির্ভাব ঘটার আশঙ্কা জাগে, যদিও তারা ছিল রুশ সমাজের উদারবাদী উপাদানের সাথে সম্পর্কিত। জাদিদবাদীদের বিরোধিতা আসে প্রাচীন মুসলিম এলিটদের কাছ থেকে। সামন্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গির এসব এলিটের আশঙ্কা ছিল আন্দোলনটি শিক্ষা প্রদান, প্রেরণা সৃষ্টি এবং নতুন এলিটদের ক্ষমতায়ন করে জমাটবাঁধা সামাজিক-ব্যবস্থা বদলে দিতে পারে। আর ঠিক সেটাই ছিল জাদিদবাদীদের লক্ষ্য, তবে সেটা বিপ্লব বা সহিংসতার আশ্রয় না নিয়ে। জাদিদবাদীদের এমনকি বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রচারমূলক কোনো এজেন্ডাও ছিল না। তারা কেবল বৃহত্তর রুশ রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে দৃশ্যত তাদের শক্তিশালী অবস্থান দেখতে চেয়েছিল।

শীর্ষস্থানীয় জাদিদবাদী, ক্রিমীয় তাতার ইসলাইল গাসপিরালি সংস্কার করা রুশ রাজনৈতিক-ব্যবস্থার মধ্যে মুসলিম কর্মপন্থার পথ প্রদর্শন করেছিলেন এবং এর বিনিময়ে রাশিয়াকে মুসলিম বিশ্বের সাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন :

...রাশিয়া যদি তুরস্ক ও পারস্যের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে, তবে দেশটি পুরো মুসলিম প্রাচ্যের সাথে বন্ধুত্ব করে ফেলবে, এবং সেটা তাকে নিশ্চিতভাবেই মুসলিম জাতি এবং তাদের সভ্যতার শীর্ষে পৌঁছে দেবে, যা করার জন্য ইংল্যান্ড অব্যাহতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, গাসপিরালি রাশিয়াকে একটি খ্রিস্টান দেশের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় একটি মহান মুসলিম জাতি হিসেবেও দেখেছিলেন। একই সময় এটা ছিল মুসলিম ও খ্রিস্টান সংস্কৃতির মধ্যে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অন্তর্ভুক্তিমূলক পরীক্ষা। এক্ষেত্রে বিশ্বে রাশিয়ার স্থান নিয়ে মহা পরিকল্পনায় ধর্ম দৃশ্যত বাধা না দিয়ে বরং সুবিধাই করে দিচ্ছিল। কিন্তু ধর্মীয় পার্থক্য না থাকলেও (ইসলামবিহীন), রাশিয়া সম্ভবত বিপুলসংখ্যক তুর্কি জনগোষ্ঠীকে আত্মস্থ করতে মারাত্মক সমস্যায় পড়ত।

রাশিয়ায় শিক্ষা, সংস্কার, এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জন্য মুসলিম আন্দোলনটি ১৯ শতক শেষ হতে থাকার প্রেক্ষাপটে গতিশীলতা লাভ করেছিল নাটকীয়ভাবে। জাতিগত বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া নতুন রাজনৈতিক যুগে এলিটরা পরিচিতি প্রশ্নে তীব্র বিতর্কে মেতে ওঠল। এমনকি রাশিয়া নিজেও বুঝতে পারছিল না, তারা 'পাশ্চাত্যের' নাকি দূরবর্তী অর্থোডক্স বিশ্বের নাকি কোনোভাবে এশিয়ার। মুসলমানরাও একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকল : তারা কি মূলত মুসলিম, না রুশ নাগরিক নাকি তুর্কি বা তাতার, এবং কোনটার গুরুত্ব বেশি? তারা কি রাশিয়ার 'অধিবাসী'?

রাশিয়ায় ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর জার দ্বিতীয় নিকোলাই উদারিকরণের পথে ব্যাপক রাজনৈতিক ছাড় দিতে বাধ্য হন। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পার্লামেন্ট বা দুমা প্রবর্তন। রুশ মুসলিমরা কৌশল নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯০৫ সালে ইউনিয়ন অব রুশিয়ান মুসলিমের প্রথম কংগ্রেসে আহ্বান করার সময় আদর্শগত অবস্থান এড়িয়ে ধর্মের ভিত্তিতে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করে। তাদের প্রধান দুটি লক্ষ্য ছিল বৃহত্তর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বায়াত্তশাসন এবং রুশ জনসংখ্যার মধ্যে সমান মর্যাদা। আমাদের মনে রাখতে হবে, রুশ মুসলমানদের (প্রধানত তুর্কি জাতিগোষ্ঠীর) ইসলামকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছিল এ কারণে যে, জাতিগত অবস্থান নয়, ধর্ম ছিল রুশ সাম্রাজ্যের সাংগঠিক মূলনীতি।

এই আন্দোলনটির নীতিগুলো ছিল উদার ও মধ্যপন্থী। তারা যেসব অভিন্ন লক্ষ্য হাসিলের জন্য সব রুশ মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিল সেগুলোর মধ্যে ছিল ভূমির সুষম বন্টন; মুসলিম ভূমির রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ বন্ধ করা; সংবাদপত্র, সমাবেশ করা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা; এবং সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। দলটি যে রুশবিরোধী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী ছিল না এবং তারা যে জারের প্রতি অনুগত সেটা তুলে ধরতে দলটির নেতারা রুশ রাজনৈতিক দৃশ্যপটে একটি স্থান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদটি দেয়ার প্রতিশ্র"তি

চেয়েছিল। কয়েকটি নির্বাচনে ইউনিয়নটি দুমায় ৩০ থেকে ৪০টি আসনে জয়ী হওয়ার সাফল্য পেয়েছিল। মজার ব্যাপার হলো, ধর্মীয় দিক থেকে ইউনিয়নটি আলেমদের ক্রমপরম্পরায় আমূল সংস্কার এবং জনসাধারণের সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে গ্র্যান্ড মুফতি নিয়োগ (যেকোনো মুসলিম দেশে এটা ছিল নাটকীয় প্রথম ঘটনা) করার আহ্বান জানিয়েছিল। এসব পদক্ষেপ আলেমদের সনাতনী ও রক্ষণশীল শ্রেণীর প্রভাব নস্যাৎ করে দিয়েছিল। অবশ্য কয়েক বছরের মধ্যে মুসলিম ইউনিয়নে ভাঙন দেখা দেয়, কিছুটা জাতিগত ও আঞ্চলিক বিভেদে এবং কিছু প্রতিনিধি রুশিয়ান সোস্যালিস্টদের সাথে বামপন্থী অবস্থান গ্রহণ করার অভিমত ব্যক্ত করায় কিছুটা আদর্শগত কারণে। সংক্ষেপে বলা যায়, ইসলাম আর সামাজিক সংযোগকারী হিসেবে তেমনভাবে সক্রিয় ছিল না, এবং রাশিয়ার মুসলমানরা জাতিগত, আঞ্চলিক, শ্রেণী ও মতাদর্শগত পার্থক্য ধরে আচরণ করতে লাগল। যে ইসলামি পরিচিতি ধরে মুসলমানরা বৃহত্তর রাজনৈতিক দৃশ্যপটে অবাধে কাজ করতে পারত, বর্তমান পরিবেশে সেটা আর বিরাজমান ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ১০ লাখের বেশি রুশ মুসলিম রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, তাদের অনেকে দক্ষিণ রণাঙ্গনে উসামানিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। খ্রিস্টান আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের প্রতি সমর্থন দেয়া সব মুসলমানের জন্য সময়ের দাবি বলে দেয়া উসমানিয়াদের ফতোয়া উপেক্ষা করে তারা এমনটা করেছে।

অর্থাৎ এই জারবাদী সাম্রাজ্যিক আমলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে একটি খ্রিস্টান সাম্রাজ্য মুসলমানদের আত্মস্থ করতে তুলনামূলকভাবে সফল হয়েছিল, রাজনৈতিক সংস্থায় জাতিগত বা ধর্মীয় ভিত্তির মধ্যে মুসলিম দোদুল্যমনতা ছিল এবং রুশ রাজনৈতিক-ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রাসঙ্গিক উপলব্ধি ছিল। তাদের রাজনীতি ছিল তুলনামূলক মূলধারার, পরে 'বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী' হিসেবে অভিহিত হয়, গুটিকতেক বামপন্থী বা কঠোর ধর্মীয় দলও ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হলো, 'রক্তাক্ত সীমান্ত' বলতে কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে এখানে মুসলমানদেরকে যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক-ব্যবস্থার মধ্যে সংখ্যালঘু হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছিল এবং মুসলমানরা তা গ্রহণ করেছিল। তারা পরে এমনকি বৃহত্তর রাজনৈতিক দলগুলোকে (এবং কেবল মুসলিম ব্লক বলেই নয়) পর্যন্ত সমর্থন করেছিল, যেগুলো রাজনৈতিক/আদর্শগত ছিল না। কিন্তু তারা তাদের সম্প্রদায়গত পরিচিতিকে প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে তাদের ধর্মীয় পরিচিতিকে সাধারণভাবে ব্যবহার করেনি। সোভিয়েত আমলে এগুলোকেই চূড়ান্ত পরীক্ষায় তথা ব্রেকিং পয়েন্টে ফেলে দেয়।

রুশ বিপ্লব ও বলশেভিকবাদ

সোভিয়েত আমলটি রুশ মুসলিম সম্প্রদায়ের জটিল বিবর্তনে একটি নতুন ও সহিংস অধ্যায়ের প্রকাশ ঘটায়। নতুন কমিউনিস্ট (বলশেভিক) শাসকেরা শুরুতে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না, তারা ইসলামকে তাদের পক্ষে টানবেন, নাকি একে গুঁড়িয়ে দেবেন নাকি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক কাঠামোকে বাদ দিয়ে জাতিগত কাঠামো গঠনের মাধ্যমে ধ্বংস করে ফেলবেন। শেষ পর্যন্ত তারা একটি জাতিগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন, এতে তারা কিছুটা সাফল্যও পান। এদিকে রুশ বিপ্লবের এক বছর আগেই মধ্য এশিয়ায় একটি মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী তুর্কি বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছিল। সামরিক বাহিনীতে মুসলিমদের বাধ্যতামূলক নিয়োগের নতুন জারবাদী নীতি এবং যুদ্ধ অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দুর্দশার তীব্র প্রতিক্রিয়ায় এই বিদ্রোহ ঘটে যায়। এই তথাকথিত 'বাসমাচিত বিদ্রোহ' আরো ১০ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানত উজবেক ও তাজিক এলাকাগুলোতে ধিকি ধিকি করে এবং মাঝে মধ্যে প্রবল আকারে ছড়িয়ে পড়ত। আন্দোলনটির চালিকাশক্তি ছিল অনেক মুসলিম মধ্য এশিয়ানের মধ্যে বিরাজমান স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা। তারা সোভিয়েত একনায়কতন্ত্র এবং এর উগ্র নাস্তিকতার প্রতি প্রবল বৈরী হয়ে পড়েছিল। রেড আর্মি শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহটিকে গুঁড়িয়ে দিতে পারলেও তাতে রুশ মুসলিমদের মধ্যে গভীর যন্ত্রণাদায়ক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। দলত্যাগী অনেক তুর্কি সাবেক সামরিক কর্মকর্তা এবং ব্রিটিশ গোয়েন্দারা বিদ্রোহটিতে সমর্থন দিয়েছিল। এতে করে মুসলিমদের সাথে প্রশ্নবোধ আনুগত্য এবং সেইসাথে বিদেশী শক্তির সম্পৃক্ততার কালি লেপে যায়। 'বাসমাচিত বিদ্রোহ' মস্কোকে এই পরিষ্কার বার্তা দেয়, তাকে তার মুসলিম জনসংখ্যার সাথে জাতিগত ও ধর্মীয় উভয় ব্যাপারেই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে।

বস্তুত, সোভিয়েত শাসনের প্রাথমিক দিনগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টি ইসলামকে তার নিজ স্বার্থে ব্যবহারে বিস্ময়কর চেষ্টায় তার নিজের মুসলিম নাগরিকদের সমর্থন লাভ করেছিল বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্ট বিপ্লবের এজেন্ডা প্রচার করতে এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকায় পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শাসন উৎখাতের কাজে। সোভিয়েতদের অন্যতম টার্গেট ছিল ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ। রাশিয়ার দুয়ারে থাকা এই অঞ্চলটিতে আরো আগে ব্রিটিশবিরোধী মুসিলম বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল।

এ লক্ষ্যে প্রাচ্যের জনগণের জন্য বাকু কংগ্রেস নামে ১৯২১ সালে বিশাল ও বর্ণাঢ্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পাশ্চাত্যের উপনিবেশিক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে বিপ্লবী তৎপরতার পরিকল্পনা করতে সারা বিশ্বের বিভিন্ন উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশ থেকে প্রায় দুই হাজার প্রতিনিধিকে নিয়ে আসে সোভিয়েতরা। মস্কোর বলভেশিক নেতৃত্ব অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিচালনা করলেও সম্মেলনটি উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামে শক্তিশালী প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। এসব বিপ্লবী প্রতিদ্বন্দ্বিতার একেবারে পুরোভাগে মুসলিম দেশগুলোর থাকার সম্ভাবনা রয়েছে– এমনটা বুঝতে পেরে মস্কো পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির স্বার্থ আরো এগিয়ে নিতে তাদেরকে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হন।

বাকু সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে সরাসরি ইসলামের কথা উল্লেখ করা হয়নি; উপনিবেশবিরোধী হাতিয়ার হিসেবে মস্কো সমাজতন্ত্রের সাথে মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের জোটবদ্ধ হতে বেশি আগ্রহী ছিল। কিন্তু আমরা উল্লেখ করেছি, অমুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে নিয়োজিত হলে ইসলাম সব সময় জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণার সাথে মিশে যায়। ফলে সোভিয়েত কৌশলবিদেরা, বিশেষ করে লেনিন ও জিনোভিয়েভ, ইসলামি সমাজের রক্ষণশীল উপাদানগুলো এড়িয়ে এবং তাদের মধ্যে থাকা বিপ্লবী শক্তিকে চাঙ্গা করার পথ খুঁজতে চেয়েছেন। এমনকি জিহাদ পরিভাষাটি ব্যবহার তাদের জন্য যথাযথ বলে তারা মনে করেছে, তবে এবার আরো সেক্যুলার অর্থে। অনেক বক্তা এটাকে ‘সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ’ হিসেবে অভিহিত করেন। আবার অনেকে (ঈশ্বর অবমাননা অর্থেই) বিশ্ব বিপ্লবের নতুন কেন্দ্র মস্কোতে (প্রাচ্যের নির্যাতিত সব মানুষের মুক্তির ব্যবস্থাকারী) নতুন ধরনের ‘তীর্থযাত্রার’ কথাও বলেন। অবশ্য, তার পরও মস্কো ভালো মতোই অবগত ছিল, ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ স্থায়ীভাবে দুইধারী তরবারির প্রতিনিধিত্ব করে, যা একইভাবে সাম্রাজ্যের মুসলিম এলাকাগুলোতে সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধেও সমানভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, এবং সেটা বাসমাচিত আন্দোলনে ইতোমধ্যে ব্যবহৃতও হয়েছে।

মির্জা সুলতান-গালিব : কমিউনিস্ট-মুসলিম-জাতীয়তাবাদী

মুসলিম সমাজগুলোর সাথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাক্ষাৎ সম্ভবত সবচেয়ে প্রাণবন্তভাবে ফুটে উঠেছিল মির্জা সুলতান-গালিবের ব্যক্তিত্বে। ভলগা অঞ্চলের তাতার মুসলিম সুলতান-গালিব ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের সময় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বলশেভিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। সুলতান-গালিব এই যুক্তিতে একটি 'নিখিল মুসলিম কমিউনিস্ট পার্টি' (অনেকটা সোনার পাথরের বাটির মতো) গঠনের যুক্তি দেন এই বলে, রুশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থাকা বিভিন্ন মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের মধ্যকার জাতিগত ভিন্নতা তাদের অভিন্ন ইসলামি সংস্কৃতির মাধ্যমে কাটিয়ে উঠতে পারবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইসলামি চেহারা দেয়া গেলে মার্কসবাদ মুসলিম জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে পারে। তিনি তাই একটি শক্তিশালী মুসলিম কমিউনিস্ট পার্টির স্বপ্ন দেখিছিলেন, যেটি মুসলিম বিশ্বজুড়ে ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিকাশ ঘটাতে পারে। ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীত্ব এখানে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে যায়।

সুলতান-গালিব নিজে ছিলেন নাস্তিক। তবে তিনি পবিত্র কুরআন ও শরিয়াহ অধ্যায়ন করেছিলেন। তিনি মুসলিম জীবনে ইসলামি সংস্কৃতির শক্তি ও গভীরতা সম্পর্কে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। সোভিয়েত-ব্যবস্থায় তার দ্রুত উত্থান ঘটে, শেষ পর্যন্ত তিনি পিপলস কমিসারিয়েট ফর ন্যাশনালিটিজের সভাপতি হন, যোশেফ স্ট্যালিনের নির্দেশনায় জাতিগত নীতির অন্যতম কণ্ঠে পরিণত হন।

কমিউনিস্ট পার্টিতে সুলতান-গালিবের প্রাথমিক বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল প্রায় পুরোপুরিভাবে তার নিজস্ব আবেগময় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আশাবাদ। এর মাধ্যমেই তিনি শুরুতে বলশেভিকদের একমাত্র ত্রাতা বিবেচনা করেছিলেন :

আমি এখন বলশেভিকদের সাথে আমার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।... আমি যাতা, কারণ আমি বলশেভিক উদ্দেশ্যের বস্তুনিষ্ঠতায় বিশ্বাস করি। আমি এটা জানি; এটা আমার দৃঢ়বিশ্বাস। অর্থাৎ কোনো কিছুই আমার আত্মা থেকে এটাকে দূর করতে পারবে না। আমি উপলব্ধি করছি, বিপ্লবের শুরুতে যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, বলশেভিকরা তার মাত্র কিছু অংশ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম

হবে। [কিন্তু] একমাত্র তারাই [প্রথম বিশ্বযুদ্ধ] বন্ধ করেছে। একমাত্র তারাই জাতিগুলোর ভাগ্য তাদের নিজেদের হাতে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সংগ্রাম করছে। একমাত্র তারাই বিশ্বযুদ্ধের কারণ প্রকাশ করেছে। তারা ভারতবর্ষ, মিসর, আফগানিস্তান, পারস্য ও আরব নির্যাতনকারী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারাই মরক্কো, আলজিয়ার্স এবং আফ্রিকার অন্যান্য আরব দেশকে শৃঙ্খলায় আবদ্ধকারী ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছে। আমি কিভাবে তাদের সাথে না যেয়ে থাকতে পারি? তারা যে বাণী ঘোষণা করেছে, তা পৃথিবী সৃষ্টির পর, রুশ রাষ্ট্রের ইতিহাস থেকে কেউ বলেনি। রাশিয়া ও প্রাচ্যের সব মুসলমানের কাছে আবেদন জানিয়ে তারা ঘোষণা করেছে, ইস্তাম্বুল অবশ্যই মুসলমানদের হাতে থাকতে হবে। তারা এমন কাজ করছে যখন ইংরেজ সৈন্যরা জেরুসালেম দখল করে ইহুদিদের কাছে এই আবেদন করছে এমন কথায় : 'শিগগিরই ফিলিস্তিনে সমবেত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের জন্য সেখানে একটি ইউরোপিয়ান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করব।'

কিন্তু স্ট্যালিন ও সোভিয়েত নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত এই যুক্তিতে নিখিল মুসলিম কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার আইডিয়া প্রত্যাখ্যান করে, এটা হবে মুসলিম সম্প্রদায়ের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শক্তির সাথে অগ্রহণযোগ্য ও বিপজ্জনক আপস। মস্কো জোর দিয়ে বলে, 'বিত্তহীন শ্রমিকদের' ঐক্যভিত্তিক পার্টিই কেবল এ ধরনের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে পারে, যদিও কৃষি ও বণিক তাতারদের মধ্যেও গোপনে একটি 'বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণী'র অস্তিত্ব ছিল। এই পর্যায়ে সুলতান-গালিব দেয়াল-লিখন দেখতে পেলেন, বুঝতে পারলেন, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি কখনোই তার ভিশনের সাথে একমত হবে না। তার মধ্যে উপলব্ধির সৃষ্টি হলো যে, মুসলমানরা জারবাদী নির্যাতনের বদলে কেবল তথাকথিত রুশ প্রলেতারিয়েতের নতুন ধরনের নির্যাতনের মুখে পড়েছে। তিনি এই বিশ্বাসে উপনীত হলেন, তাতার স্বার্থ রুশ সাম্রাজ্যিক স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এবং সাম্রাজ্যবাদ থেকে কোনো ধরনের স্বাধীনতা দিচ্ছে না সমাজতন্ত্র, এটা কেবল নতুন অবয়বের ব্যাপার। স্ট্যালিন শেষ পর্যন্ত সুলতান-গালিবকে গ্রেফতার করেন; ১৯৪০ সালে আরো হাজার হাজার মুসলিম-তুর্কি জাতীয়তাবাদীর সাথে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

সুলতান-গালিব ছিলেন প্রখ্যাত কমিউনিস্ট অ্যাক্টিভিস্ট, ধর্মতাত্ত্বিক এবং মুসলিম বামধারার গুরুত্বপূর্ণ মুখপাত্রের চমৎকার উদাহরণ। যেসব ঘটনা তার দোষারোপ, কারাদণ্ড, নির্বাসন, প্রান্তিকীকরণ এবং পরে মৃত্যুদণ্ডের কারণ হলো সেগুলো আসলে ইউরোপিয়ান (এমনকি সোভিয়েতও) সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি হলে ইসলামি সংস্কৃতির 'জাতীয়তাবাদী' বৈশিষ্ট্য কী হতে পারে তার নাটকীয় প্রমাণ উপস্থাপন করে। বস্তুত, সুলতান-গালিবের স্ট্যালিনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং এর পরপরই তার মুসলিম জাতীয়তাবাদী স্বার্থকে গ্রহণ করার ঘটনাটি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে 'সুলতান-গালিববাদ' শিরোনামে রাশিয়ার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান সুপ্ত জাতীয়তাবাদ নিয়ে সার্বক্ষণিক কমিউনিস্ট ভয়কে মনে করিয়ে দিত। 'জাতীয়তাবাদকে যখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদী আদর্শকে স্থানচ্যুত করার সুযোগ দেয়া হয়, তখন কী ঘটে, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন,' এটি ছিল সবার মুখে উচ্চারিত সুর। আর ইসলামকে

একটি 'জাতিগোষ্ঠী'তে পরিণত করার জন্য সোভিয়েতরা নিজেদেরই অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রবল চাপ দিতে থাকে। 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধেও' মার্কিন নীতি ঠিক একই রকম কাজ করে যাচ্ছে।

এর মাধ্যমে প্রাচ্যের নির্যাতিত জাতিগুলোর কাছে কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বার্তা বহনে রুশ মুসলিম সম্প্রদায়ের বিপ্লবী সম্ভাবনার পরীক্ষাটি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। এর পর থেকে মুসলিমরা সবসময়ই সোভিয়েত নীতি এবং মুসলিম তুর্কি সংস্কৃতির প্রতি সোভিয়েত নিপীড়নের ব্যাপারে গভীরভাবে বৈরী থাকে। ১৯২৬ সাল নাগাদ মস্কো এই সিদ্ধান্তে আসে, ইসলাম আসলেই বলশেভিকবিরোধী শক্তি। তারা মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে নাস্তিকতার প্রচার বাড়াতে এবং ক্ষমতার অবস্থান থেকে সব বিশ্বাসীকে সরিয়ে দিতে 'ইউনিয়ন অব মিলিট্যান্ট অ্যাথেস্টস' গঠন করে। সোভিয়েত সরকারের নাস্তিক আদর্শবাদ ঘোষণা এবং সব ধর্মের দমন ছিল মুসলিমদের দৃষ্টিতে সোভিয়েত জান্তার করা সর্বোচ্চ পাপ। মুসলিমরা গোপনে তাদের ধর্মীয় শাস্ত্রাচার ও রীতিনীতি রক্ষা ও পালনের পথ অবলম্বন করে। সোভিয়েত শাসনের অন্ধকার বছরগুলোতে ইসলামি জ্ঞান কিছুটা হলেও বজায় রাখার কাজে সুফি নেটওয়ার্কগুলো ছিল হাতিয়ার।

জারবাদী রাশিয়া যেখানে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার ভিত্তি হিসেবে ধর্মকে এগিয়ে নিত, সেখানে বলশেভিক কমিউনিস্টরা এখন নাটকীয়ভাবে দিক পরিবর্তন ও বিভক্ত করে জয় করার প্রক্রিয়ায় সোভিয়েত সংস্থার ভিত্তি হিসেবে সংকীর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত গোষ্ঠীগত গ্র"পগুলোকে উৎসাহিত করতে চাইল। এ কারণে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বৃহত্তর তুর্কি জাতিগত বিষয় নিয়ে কাজ করার বদলে সোভিয়েতরা প্রতিটি তুর্কি ভাষার জন্য আলাদা রাজনৈতিক প্রজাতন্ত্র গঠন করে। এগুলো হচ্ছে উজবেক, তাতার, কাজাক, কিরগিজ, তুর্কমেন, আজেরি, ইত্যাদি ইত্যাদি। জাতিগত বিষয়টি এখন ইসলামি পরিচিতি এবং সম্ভাব্য প্যান-তুর্কি জাতীয়তাবাদী ধারণা ধ্বংস করার হাতিয়ারে পরিণত হয়।

আফগানিস্তানে নতুন কমিউনিস্ট সরকারের সমর্থনে ১৯৭৯ সালে সেখানে মস্কোর আক্রমণের ফলে ইসলামের সাথে সোভিয়েত সংগ্রাম তাদের পররাষ্ট্রনীতিতে সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা লাভ করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আফগানিস্তানজুড়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে, সোভিয়েত দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ইসলামের নামে পবিত্র যুদ্ধ শুরু হয়। পাশ্চাত্য, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েতবিরোধী জিহাদে গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন দেয়, যা আট বছর পর সোভিয়েতদের বিতাড়িত করতে সফল হয়। আফগানিস্তানে পাঠানো অনেক সোভিয়েত সৈন্য ছিল মুসলমান। তারা ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন গুঁড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রণীত সোভিয়েত নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বড় ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। পরে ব্যর্থতা নিয়ে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত প্রত্যাহারে আফগান ও বিদেশী জিহাদিরা ঘোষণা করে, 'ইসলাম একটি পরাশক্তিকে পরাজিত করেছে।' বার্তাটি অসন্তুষ্ট রুশ মুসলিমদের কাছে অগোচরে থাকেনি।

সোভিয়েত সাম্রাজ্যের মুসলমানদের জন্য ১৯৯১ সালের ইউএসএসআরের পতন ছিল একটি টার্নিং পয়েন্ট। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঁচটি মুসলিম রিপাবলিক (একটি বাদে সবই তুর্কি) নতুন 'জাতি' হিসেবে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে। তবে এবার ন্যূনতম জাতিগত ভিত্তিতে, যদিও আসলে তাদের সবাই ছিল নানা ধরনের তুর্কি। তারপরও নতুন এবং অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত রুশ সীমান্তের মধ্যে বাস করা অবশিষ্ট মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়, তবে আবারো কঠোর জাতিগত পরিচয়ে। এসব এলাকার অনেক স্থানে, বিশেষ করে চেচনিয়ায়, অস্থিরতা দেখা যায়। এটি চেচেনদের প্রায় ১৫০ বছর ধরে স্বাধীনতার সংগ্রামকে ফুটিয়ে তুলেছে। তারা নিয়মিতভাবে ইসলামের নামে যুদ্ধ করে, তাদের আগুন বলতে গেলে কখনোই নেভে না। রাশিয়ার বেশির ভাগ মুসলমান অবশ্য বুঝতে পেরেছে, রাশিয়া থেকে আলাদা হওয়াটা বাস্তবসম্মত নয়, তারা রুশ সাগরের মধ্যিখানে জাতিগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন বিপুল মুসলিম দ্বীপগুলোকে প্রকাশ করছে। তারা তাদের জাতীয় পরিচিতিতে ইসলামকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেও আলাদা জাতিসত্তার বিষয়টিও ভালোভাবে উদযাপন করে যাচ্ছে। এই বিভিন্ন ধরনের মুসলিম জাতিগত গ্র"প এমনকি অনেক ইসলামপন্থী এ ব্যাপারে প্রয়াস চালানো সত্ত্বেও বস্তুত ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় না।

আর পরিচিতির স্তর নিয়ে স্থায়ী প্রশ্নটি রয়েই গেছে : এসব লোকজন প্রথমে কি মুসলমান নাকি তারা আগে তাতার, উজবেক, কাজাক, তাজিক ইত্যাদি ইত্যাদি? নাকি তারা বৃহত্তর প্যান-তুর্কি গ্র"পের অংশবিশেষ? নাকি রাশিয়ার নাগরিক? বাস্তবতা হলো তারা যেকোনোটা হতে পারে এবং সবকিছুই পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। এগুলো পারস্পরিক বর্জনশীল নয়। কখন কোন পরিচিতি প্রাধান্য বিস্তার করবে, সেটা নির্ভর করে ওই সময়ের পরিস্থিতির ওপর।

বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা সাধারণভাবে জানে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভয়াবহভাবে ইসলামের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছিল। একই সময় তারা পাশ্চাত্যের উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ভূকৌশলগত ভারসাম্য ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে ইউএসএসআরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও স্বীকার করে। ইউএসএসআরের স্রেফ উপস্থিতি এবং দুই মেরুর বিশ্ব ছোট ছোট রাষ্ট্রকে কৌশল খাটানোর সুযোগ দিত সাবেক পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোকে তাদের ওপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার সম্প্রসারণে বাধা দিতে। ইউএসএসআরের পতন মুসলিম বিশ্ব এবং বেশির ভাগ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে হতাশ করে। তারা সমাজতন্ত্রকে ইতিবাচক ভাবত, এমন কোনো কারণে নয়, বরং এর মানে হলো দুই মেরুযুক্ত বিশ্বের অবসান এবং ছোট ছোট রাষ্ট্রকে একমাত্র বৈশ্বিক পরাশক্তির ইচ্ছার কাছে আরো বেশি অরক্ষিত করে ফেলেছে।

ইউরেশিয়ানবাদ

আমরা এই অধ্যায় শেষ করছি ইউরেশিয়ানবাদের মতাদর্শের ওপর চোখ বুলিয়ে। বুশ-পরবর্তী পরিবর্তিত কৌশলগত পরিবেশে রাশিয়া, চীন ও মুসলিমদের অভিন্ন পাশ্চাত্যবিরোধিতা, আমেরিকান কেন্দ্রবিন্দুবিরোধিতার ওপর ভর করে ইউরেশিয়ানবাদকে ঘিরে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে নতুন ও অদ্ভুত জোট হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে, এই আমেরিকান-বিরোধিতাবাদের ভূ-রাজনীতি নিয়ে সবকিছুই করার আছে, কিন্তু ধর্ম নিয়ে আছে অতি সামান্যই। নব্য-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে পাশ্চাত্যের প্রতি অভিন্ন সন্দেহ থেকে রুশ মুসলমানদের কিছু চরমপন্থী উপাদান এবং কোনো কোনো রুশ জাতিগত জাতীয়তাবাদীর মধ্যে নতুন ঐক্যের সুপ্ত সম্ভাবনার ইঙ্গিতও রয়েছে। এটা কোনো মূলধারার আন্দোলন নয়, তবে ভবিষ্যতে নতুন দিকে চলতে চাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

ইউরেশিয়ানবাদের ধারণাটি এই বইয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিকে তুলে ধরে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পাশ্চাত্য-বিরোধিতার অস্তিত্বের গভীরভাবে বদ্ধমূল ধারাটি কেবল মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক ভূ-রাজনীতিতে সীমিত নয়, বরং তা সাধারণভাবে পুরো এশিয়াজুড়ে বিস্তৃত। রাশিয়া, চীনা ও মুসলিম সংস্কৃতিগুলোর মধ্যকার বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক সম্পর্কে যেমন ব্যাপক মিল আছে, তেমনি বিশাল অমিলও আছে, কিন্তু আমেরিকান-বিরোধিতা, কর্তৃত্ব-বিরোধিতামূলক অভিন্ন থিম তাদেরকে একত্রিত করতে পারে।

পূর্বেকার স্ল্যাভোফিল ধারণার রেশ ধরে ১৯২০-এর দশকে ইউরেশিয়ানবাদের সূচনা ঘটে। স্কলার দিমিত্রি সলাপেটোখ ইউরেশিয়ানবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে : 'রাশিয়া হলো স্ল্যাভিক/অর্থোডক্স ও মুসলিমের (যাদের বেশির ভাগ তুর্ক জাতিগোষ্ঠীর) অনন্য মিশ্রণ। রুশ মুসলমানরা রাশিয়ার সহজাত মিত্র, তারা বহিরাগত রাশিয়ার স্ল্যাভ নয়।' ইউরেশিয়ানবাদীরা মনে করে, রাশিয়া ইউরোপের অংশ নয়, বরং ইউরেশিয়ান মহাদেশের অংশ, যেখানকার দু'টি প্রধান জাতিগত উপাদান হলো রুশ ও তুর্কি। রুশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কাঠামোতে আমরা রুশ অর্থোডক্সি ও ইসলামের মধ্যে যে পুরনো সক্রিয় সহাবস্থান দেখেছি, এই নতুন ভিশনে সেটা টিকে থাকে। তারপরও সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, এসব পক্ষের মধ্যে নানা সন্দেহের রেশ এখনো রয়ে গেছে এবং কেউই অন্য পক্ষের প্রাধান্য মেনে নিতে

রাজি নয়। সাধারণ মানুষের পর্যায়ে রুশ সমাজে মুসলিমবিরোধী গভীর টানাপড়েন এমনকি বর্ণবাদও রয়েছে। কিন্তু তারপরও গত দশকে তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে নতুন রাজনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক চমকপ্রদ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা এই চিন্তাধারার কার্যকারিতা ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্যের প্রতি প্রাচীন ভূ-রাজনৈতিক সন্দেহ একই শিকড়ে থাকা বায়জান্টাইন অর্থোডক্স, রুশ অর্থোডক্স ও ইসলাম- এই তিনটি সংস্কৃতিতে বারবার আবির্ভূত হয়েছে। ইসলামবিহীন বিশ্ব এমনকি আজো পাশ্চাত্যের প্রতি কেমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করত তা নিরূপণে এগুলো হলো নিশ্চিত সূচক।

অর্থোডক্সির মধ্যে শিকড় থাকার অনন্য ঐতিহাসিক চরিত্রটি হারানোর ইচ্ছা রাশিয়া কখনো করবে না। পাশ্চাত্য কখনোই রাশিয়াকে পাশ্চাত্যের অংশ হিসেবে সত্যিকারভাবে মেনে নেবে না। রাশিয়ার কৌশলগত বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক আকর্ষণ কখনোই তাকে পাশ্চাত্যের মধ্যে রাখেনি, সে অব্যাহতভাবে নিজেকে শক্তিশালী করতে প্রাচ্য সংস্কৃতির অংশীদার হয়ে ইউরেশিয়ান ও অর্থোডক্স চরিত্র অনুসরণ করতে চাইবে। চীন-রাশিয়ার প্রাধান্যপূর্ণ সাংহাই সহযোগিতা সংস্থায় রাশিয়ার ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হওয়াটা আবারো এই ভূ-রাজনৈতিক প্রাচ্যমুখীকরণ প্রদর্শন করছে। এই জোটে মধ্য এশিয়ার অনেক দেশ রয়েছে এবং আফগানিস্তান, ইরান, পাকিস্তান ও তুরস্কের প্রবল স্বার্থ প্রকাশ রয়েছে। ধর্মকে (এ ক্ষেত্রে ইসলাম) ছাপিয়ে যাওয়া ভূ-রাজনীতি আরো বড় ভূ-রাজনৈতিক অংশকেই বলিষ্ঠ করছে, যা ইতিহাসের গভীর মূলে থাকা পাশ্চাত্য শক্তি ও ইচ্ছার ব্যাপারে সন্দেহ ও ভীতি থেকে চালিত।

ইউরেশিয়ান মতাবাদ প্রকাশ্যে বলে বা না-বলে রাশিয়া এখনো মধ্যপ্রাচ্যে গভীরভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। সে এর মাধ্যমে এশিয়ায় আমেরিকান প্রাধান্য সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে সমর্থন সংগ্রহের জন্য মুসলিম বিশ্বের সামনে নিজেকে বন্ধু হিসেবে জাহির করার পাশাপাশি এই কাজে নিজের মুসলমানদের কাজে লাগাচ্ছে এবং তাদেরকে রুশ ফেডারেশনের মধ্যে শান্ত রাখছে।

এ ব্যাপারে ইরানের সাথে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত, ঠিক যেভাবে গত দশকে তুরস্কের সাথে রুশ সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। বিরাজমান পরিস্থিতিতে সৃষ্ট রাজনীতিই তাৎক্ষণিকভাবে পারসিক ও সেমিটিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে গ্রিসের আলেক্সান্ডার দি গ্রেটের কিংবা রোমান সাম্রাজ্যের ইউরেশিয়ায় প্রবল অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যকে রক্ষার উপলব্ধি সৃষ্টি করে। ইসলাম স্রেফ এই খেলায় যোগ দিয়েছে মাত্র। রাশিয়া ও ইসলামের মধ্যে যে জটিল সম্পর্কই থাকুক না কেন, এটাকে কোনোভাবেই ‘ইসলামের রক্তাক্ত সীমান্ত’ বলা যায় না।

অধ্যায় নয়

পাশ্চাত্যে মুসলমান : অনুগত নাগরিক নাকি পঞ্চম বাহিনী?

৯/১১-এর ঘটনাবলির নাটকীয় শক্তি পাশ্চাত্যের মুসলমানদের ওপর এমনভাবে নজর পড়ে, যেমনটা আগে কখনো হয়নি। ৯/১১-এর ষড়যন্ত্রকারীরা জার্মানিতে হামলার কয়েকটি পরিকল্পনা করায় এবং পাশ্চাত্যে অনেক সময় ব্যয় করায় ইউরোপে সমস্যায় থাকা মুসলিম পরিচিতি নজিরবিহীন অবস্থায় পড়ে যায়। পাশ্চাত্যের মুসলমানরা কি ঘরের শত্রু বিভীষণ? নাকি হামলার জন্য ইঙ্গিত পাওয়ার অপেক্ষায় থাকা পঞ্চম বাহিনীর সদস্য? ইউরোপিয়ান ও আমেরিকানদের মধ্যে সুপ্ত এবং ভেতরে ভেতরে থাকা ধিকিধিকি করে জ্বলা ভীতিটা নতুন নিরাপত্তা-চালিত পরিবেশে মুসলিমবিরোধী ভাবাবেগ এখন উগড়ে দেয়াটা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অধিকন্তু, সহিংসতা সত্যি সত্যিই খোদ ইউরোপে চলে এসেছে। ২০০৪ সালের মার্চে মাদ্রিদের কয়েকটি কমিউটার ট্রেনে কয়েক দফা বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ১৯১ জন নিহত এবং এক হাজার ৮০০ লোক আহত হয়। তদন্তে শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, ষড়যন্ত্রকারীরা উত্তর আফ্রিকার মুসলমান, তাদের সাথে আলকায়েদার সম্পর্ক থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া না গেলেও ওই সংগঠন থেকেই তারা পেয়েছিল অনুপ্রেরণা। ২০০৪ সালের নভেম্বরে প্রকাশ্য দিবালোকে ডাচ লেখক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা থিও ভ্যান গফকে নির্মমভাবে ছুরিকাঘাতে হত্যা করলে হল্যান্ড শোকে মুষড়ে পড়ে। তার খুনি ছিলেন মরক্কো-বংশোদ্ভূত ডাচ নাগরিক, ইরাক যুদ্ধের কারণে তিনি চরমপন্থী হয়ে পড়েছিলেন। সবার জন্য সমান সুযোগ দেয়ার মতাদর্শে বিশ্বাসী গোঁড়া ভ্যান গফ-এর আগে ইহুদিদের বিদ্রুপ করেছিলেন। তিনি খোলামেলাভাবে ইসলামবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি একটি শর্ট ফ্লিম তৈরি করেছিলেন, যেখানে ‘নারীদের বিরুদ্ধে ইসলামের বৈষম্যের’ প্রতিবাদ জানাতে নগ্ন এক নারীকে পবিত্র কুরআনের আয়াত বিঁধে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। খুনটি বোধগম্যভাবেই উদার ইউরোপিয়ান মহলে পর্যন্ত বিদেশী একটি সম্প্রদায়ের (যাদের কেউ কেউ ধর্মের কারণে খুনও করতে পারে) উপস্থিতি নিয়ে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়।

তারপর ২০০৫ সালের জুলাইয়ে কয়েকজন ব্রিটিশ মুসলিম লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ডে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে ৫২ জনকে নিহত এবং প্রায় ৭০০ জনকে আহত করে। হামলাকারীরা ইরাক যুদ্ধে ব্রিটিশ সম্পৃক্ততায় প্রভাবিত ছিল বলে জানা যায়। এরপর ২০০৭ সালের জুনে ইরাকি উৎসের এক ব্রিটিশ-

বংশোদ্ভূত চিকিৎসকসহ দুই মুসলিম প্রপেন গ্যাস ক্যানিস্টর ভর্তি একটি ট্রাক চালিয়ে দেন গ্লাসগো বিমানবন্দরের প্রবেশপথে। এতে কেউ নিহত না হলেও অনেকে আহত হন। ইরাক যুদ্ধের সাথে এই ঘটনাটিরও সম্পর্ক ছিল বলে ধারণা করা হয়।

২০০৭ সালের নভেম্বরে কয়েক দিন ধরে আফ্রিকান ও আরব অভিবাসীদের দাঙ্গা আছড়ে পড়ে প্যারিসে। ফরাসি সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে তাদেরকে একীভূত করার একটি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ক্রোধে এই দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছিল। বিপুল সম্পত্তি ধ্বংস হয়। তবে এতে কোনো সন্ত্রাসী কৌশল প্রয়োগ করা হয়নি।

এসব ঘটনা ইউরোপে মুসলমানদের উপস্থিতিকে সামনে ও কেন্দ্রে নিয়ে আসে, তাদের আনুগত্য এবং একীভূত হতে তাদের আগ্রহ ও সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি করে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে : মুসলমানদের ব্যাপারে কি 'ভিন্ন' কিছু আছে, যা মুসলিম অভিবাসীদের অন্য অভিবাসীদের থেকে বিশেষ শ্রেণীতে ফেলে? না কি আমরা প্রশ্নটিকে ঘুরিয়ে বলতে পারি : তারা মুসলমান না হলে সমস্যা ও ইস্যুগুলো কি মৌলিকভাবে ভিন্ন হতো? এই প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত হবে শর্তসাপেক্ষ, না।

ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব তারিক রামাদান তার ভাষায় 'ইসলামিকরণ' সমস্যার সহজ ফাঁদ' সৃষ্টির বিরুদ্ধে তথা মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলোকে কোনো না কোনোভাবে ইসলামের সাথে গুলিয়ে ফেলার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের সামাজিক সমস্যা আছে, আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা আছে, এবং আমাদের নাগরিক সমস্যা আছে। এগুলোর সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো সমাধান করতে হয় সামাজিক নীতির মাধ্যমে।... কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদদের যখন সামাজিক জবাব না থাকে, তবে এসব সমস্যাকে এই দাবি করে অনিবার্যকরণের দাবি করার প্রবণতা প্রদর্শন করেন যে, এসব সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটার কারণ হলো এসব লোক মুসলিম বা আরব।' সংক্ষেপে বলা যায়, ইসলাম যদি না-ও থাকে, তবুও বিশ্বায়নের এই যুগে উন্নয়নশীল বিশ্বের অভিবাসীদের নিয়ে ইউরোপ অবশ্যই বড় ধরনের সমস্যায় পড়বে (আসলে সমস্যার মধ্যেই আছে)।

রাশিয়া, ভারত বা চীনের চেয়ে মুসলমানদের নিয়ে ইউরোপ সম্পূর্ণ ভিন্ন 'সীমান্ত' সমস্যায় পড়ছে। ইউরোপের মুসলমানরা ভূমিপুত্র নয়। তারা আধুনিক অভিবাসী। কাজের আশায় এবং পরিবার চালাতে তারা ব্যক্তিগতভাবে ও স্বেচ্ছায় তাদের আবাসভূমি ছেড়ে অমুসলিম দেশগুলোতে অভিবাসন করেছে। অনেকে ইউরোপের চাকরিটা আর্থিক কারণে সামরিক পদক্ষেপ বিবেচনা করলেও ক্রমবর্ধমান বেশি হারে স্থায়ী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে : তারা নাগরিকত্ব চাচ্ছে এবং সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের মর্যাদা গ্রহণ করেছে।

সমসাময়িক বহু সংস্কৃতির ইউরোপের জীবনযাত্রা নিশ্চিতভাবেই বিশ্বের অন্য বেশির ভাগ অংশের জীবনযাত্রা থেকে ব্যাপকভাবে ভিন্ন। এতে নতুন ও জটিল পরিচিতিবিষয়ক ইস্যুর সৃষ্টি করে। ব্যাপক অভিবাসন শুরু হওয়ার আগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাথে ইউরোপের প্রথম যোগাযোগটি ঘটেছে গোষ্ঠী-পরবর্তী ও ধর্মীয়-পরবর্তী এমন ইউরোপিয়ান সমাজে, যেখানে গোষ্ঠীগত বিষয় ও ধর্ম দৃশ্যত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আর বহাল ছিল না। আর মুসলিম অভিবাসীদের সাথে ইউরোপের অভিজ্ঞতা ছিল বেশ নতুন, উন্নয়নশীল বিশ্বের অবশিষ্ট অংশের ব্যাপারেও বিষয়টা এমনই।

উত্তর আমেরিকার বিপরীতে, ইউরোপ কিন্তু সহজাতভাবেই অভিবাসী সমাজ নয়। এটা প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য ইউরোপিয়ান সম্প্রদায় ও সংস্কৃতি, সাধারণভাবে রক্ষণশীল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। নিশ্চিতভাবেই ইউরোপ অনেক আগে থেকেই মুসলিম 'অন্য'কে ঐতিহাসিক শত্রু (তবে সাধারণত দূরের শত্রু") বিবেচনা করত। ৭৩২ সালে পোইটিয়ার্সে মুসলিম স্পেন থেকে আরব বাহিনীকে বিতাড়িত করে ইউরোপ মনে করেছিল, মুসলিম আক্রমণ এবং ইউরোপে যেকোনো ধরনের সম্ভাব্য ইসলামিকরণের সম্ভাবনা চির দিনের জন্য শেষ করে দিয়েছে। ক্রুসেডের যুদ্ধভূমিতে ইউরোপ মোকাবিলা করেছিল মুসলমানদের সাথে। রাজা ফার্ডিন্যান্দ ও রানি ইসাবেলা ১৪৯২ সালে মোটামুটিভাবে বহুজাতিক (স্পেনের মুসলিম-ইহুদি-খ্রিষ্টান বহু-সাংস্কৃতিক সমাজে) দেশটির প্রায় সাত শ' বছরের শাসন কঠোরভাবে অবসান ঘটিয়েছিলেন, মুসলিম ও ইহুদিদের দূর করতে আধুনিক ইউরোপের প্রথম জাতি নির্মূল অভিযান চালিয়েছিলেন। পোলিশ বাহিনী ১৬৮৩ সালে ভিয়েনা অবরোধকালে উসমানিয়া সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিয়েছিল, যা ছিল পূর্ব ইউরোপে উসমানিয়া অগ্রযাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তারপর ইউরোপ নিজেই আক্রমণ চালাতে শুরু করে এবং কার্যত বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম দেশে আধিপত্য বিস্তার করে। তারপর মুসলিম জনসংখ্যার উপনিবেশবিরোধী প্রতিরোধ থামাতে ইউরোপ হিমশিম খেতে থাকলেও মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে তেল অনুসন্ধান ও উৎপাদনে ইউরোপ তার প্রাধান্য বজায় রাখে। পরে অবশ্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলো এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। আলজেরিয়ায় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ফরাসি চেষ্টাটি মারাত্মক রক্তপাতপূর্ণ ঘটনায় পরিণত হয়, ফ্রান্সে আলজেরিয়ানরা ঘৃণার বস্তু হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ইসলামের সাথে ইউরোপিয়ান মিথস্ক্রিয়ার ঐতিহাসিক স্মৃতি ইতিবাচক নয়। কিন্তু এখন, এই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, অভিবাসী হিসেবে বিপুল মুসলমান আসতে থাকলে মুসলমানদের সাথে সম্পূর্ণ নতুন ও অপ্রত্যাশিত সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে।

ইউরোপের মুসলমানেরা কারা

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫ শতাংশ মুসলমান। ফ্রান্সে আছে সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৪৫ লাখ, এরপর জার্মানিতে ৩০ লাখ, যুক্তরাজ্যে ১৬ লাখ এবং ইতালি ও নেদারল্যান্ডসে পাঁচ লাখের বেশি করে। অস্ট্রিয়া, সুইডেন ও বেলজিয়ামে পাঁচ লাখের কম করে রয়েছে। এসব মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক বিদেশে জন্মগ্রহণকারী।

ইউরোপে বড় ধরনের প্রথম মুসলিম অভিবাসন ঘটে ১৯৬০-এর দশকে। ওই সময়ে ইউরোপিয়ানরা পরিশ্রম করতে চাইত না বলে ইউরোপের কায়িক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এর ফলে 'অতিথি শ্রমিক' যুগের সূচনা হয়। উভয় পক্ষ যেটাকে শুরুতে সাময়িক ব্যবস্থা বিবেচনা করেছিল, সেটা অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে পড়ে আধা স্থায়ী। ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলো শ্রমিকদের পরিবার নিয়ে আসার অনুমতি দিলে তাদের সংখ্যা বেড়ে যায়। ইউরোপের একটি প্রধান সমস্যা নিহিত রয়েছে অভিবাসীদের আর্থসামাজিক পটভূমিতে : তাদের একটি বড় অংশই অদক্ষ ও অত্যন্ত স্বল্পশিক্ষিত, তারা ইউরোপের সামাজিক ব্যবস্থায় খুব কমই খাপ খাওয়াতে সক্ষম; তারা গোষ্ঠীগত ঘেঁটোগুলোতে এসে জমতে থাকে। ইউরোপিয়ান মুসলমানদের বড় সংখ্যাটি শ্রমজীবী শ্রেণীর থাকলেও উত্তর আমেরিকার মুসলিম অভিবাসীরা ছিল অনেক বেশি পেশাগত পটভূমির।

এসব লোকজন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশ থেকে এসেছিল : ফ্রান্সে বেশির ভাগ এসেছিল উত্তর আফ্রিকা থেকে; যুক্তরাজ্যে বেশির ভাগ এসেছে দক্ষিণ এশিয়া থেকে; জার্মানিতে বেশির ভাগ তুরস্ক থেকে এবং পরে বসনিয়া ও কসোভো থেকে। জাতি হিসেবে মোট ইউরোপিয়ান মুসলিমদের ৪৫ শতাংশ আরব, এরপর রয়েছে তুর্কি ও দক্ষিণ এশিয়ান। অন্যান্য মুসলিম গ্র"প অনেক কম সংখ্যায় রয়েছে। স্পষ্টভাবেই বলা যায়, মুসলিম জনসংখ্যা আঞ্চলিক ও ভাষাগত উভয় দিক থেকেই নানামাত্রিক, তাদের একভাষী বলা যায় না।

সরবোন রাজনীতিবিজ্ঞানী জসেলিন সিজারি বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : ‘ইউরোপিয়ান মুসলমানদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বেশ নাজুক,’ বেকারত্বের হারে তা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। অমুসলিমদের তুলনায় মুসলিমদের মধ্যে বেকারত্বের হার অনেক বেশি।

নেদারল্যান্ডসে ৩১ ভাগ মরোক্কান এবং ২৪ ভাগ তুর্কি বেকার। আরো খারাপ ব্যাপার হলো, ১৯৯৫ সালের একই পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণকারী অ-অভিবাসীদের ক্ষেত্রে মুসলিম তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার ছিল দ্বিগুণ বেশি। যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী, পাকিস্তানি অভিবাসীদের মধ্যে বেকারত্বের হার অ-অভিবাসীদের চেয়ে তিনগুণ। আর ঘিঞ্জি নগরীগুলোতে বাংলাদেশীদের প্রায় অর্ধেকই বেকার। আরো খারাপ ব্যাপার হলো, ‘এই প্রান্তিকতা গ্রেট ব্রিটেনে জন্মগ্রহণকারী ও শিক্ষাগ্রহণকারীদের প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।’

সমস্যাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে জোরদার হয়ে থাকে। কারণ শ্রমজীবী শ্রেণী ও স্বল্পভাবে শিক্ষিত মুসলমানেরা সহজে ইউরোপিয়ান সংস্কৃতির সাথে একীভূত কিংবা এমনকি নিয়োজিতও থাকতে পারে না বলে তারা প্রান্তিকতা অনুভব করে, নিজেদের বহিরাগত মনে করে, অনেক সময় বিচ্ছিন্নভাবে, নিজেদের সাংস্কৃতিক খোলসে পিছু হটে। আর সব মিলে একীভূত হতে মুসলিম প্রতিরোধের গথবাঁধা ধারণাটি আরো পোক্ত হয়। ক্ষোভ বাড়ে, ভিন্ন ধরনের পোশাক, খাবার ও ভাষা উভয় পক্ষের মধ্যে আরো বেশি আবেগ সৃষ্টি করে। এই সমস্যার ব্যাপারে নেদারল্যান্ডস অন্যতম মারাত্মক উদাহরণ বিবেচিত হতে পারে। ২০০৪ সালে এক ডাচ পার্লামেন্টারি রিপোর্টে বলা হয়, ‘বহুজাতিক সমাজ একটি মারাত্মক ব্যর্থতা, বিপুলসংখ্যক জাতিগত ঘেঁটো এবং উপসংস্কৃতি দেশকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে, মেরুকরণের ঝুঁকি মোকাবেলা করা যায় কেবল মুসলমানদের কার্যকরভাবে ডাচে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে।’ এটা একটা হতাশাব্যঞ্জক সিদ্ধান্ত, কারণ প্রস্তাবিত সমাধান ‘মুসলমানদের... ডাচে পরিণত হওয়া’ একটা বাজে সংজ্ঞা। ‘ডাচ’ হওয়া বলতে কী বোঝায়? দৃশ্যমান শারীরিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া ঐতিহ্যবাহী ডাচ নাগরিক থেকে আর কোনো পার্থক্য না থাকা, নাকি তাদের মূল দেশীয় ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো পুরোপুরি ঝেড়ে-মুছে ফেলতে হবে? নাকি ন্যূনতম কোনো ‘ডাচ’ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলো পূরণ করতে হবে? যেকোনো দেশের প্যাটার্ন বিচার করলে দেখা যাবে, এমনকি প্রবল একীভূতকরণ-প্রক্রিয়া চালানো হলেও একীভূতকরণ-প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে কয়েক প্রজন্ম লেগে যায়। সত্যিকারের একীভূতকরণ না হয় বাদই দেয়া হলো।

কিন্তু তবুও সমস্যাটির সাথে ইসলাম কোনোভাবেই সরাসরি সম্পর্কিত নয়। কারণ, উন্নয়নশীল যেকোনো দেশের অশিক্ষিত শ্রমিক গ্র“প একীভূত হওয়ার একই ধরনের সমস্যায় পড়ে। অবশ্য, তার পরও বর্তমানে তাদের মধ্যে আবির্ভূত হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপাদানের কারণে আমরা ইসলামি ফ্যাক্টরকে পুরোপুরি বাদ দিতে পারি না। সেটা হলো : ইউরোপিয়ান মুসলিম হিসেবে একটি নতুন পরিচিতির আত্মপ্রকাশ। মূল দেশের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত আলজেরিয়ান, তুর্কি বা পাকিস্তানি

অভিবাসীরা ইউরোপে প্রথম প্রজন্মে সম্পূর্ণ নতুন 'মুসলিম পরিচিতি'কে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, যা মূল জাতীয়তা ভিত্তিক পরিচয়ের চেয়ে বেশ ভিন্ন। এই মুসলিম পরিচিতি আসছে তাদের মাতৃভূমির সাথে তাদের সম্পর্ক শিথিল হতে থাকার সরাসরি প্রতিক্রিয়া থেকে, তাদের কাছে তাদের মা-বাবার সংস্কৃতি এখন সম্পর্কহীন ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। মুসলিম পরিচিতি জাতিগত পরিচয়জুড়ে একটি অভিন্ন যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেয়, যেখানে ইউরোপে নতুন সংখ্যালঘু হিসেবে বৈষম্যসহ অভিন্ন সামাজিক অভিজ্ঞতাও থাকে। ইউরোপে জন্মগ্রহণকারী এই তরুণ প্রজন্ম স্থানীয় অধিবাসীদের মতোই সাবলীলভাবে ইউরোপিয়ান ভাষায় কথা বলে, ইউরোপিয়ান স্কুলে পড়াশোনা করে। কিন্তু তবুও আর্থসামাজিক কারণে তাদের দূরে ও প্রান্তিক পর্যায়ে ঠেলে দেয়ায় তারা এখন তাদের জন্য উপযোগী অন্য কোনো কিছুর অনুপস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিগত পরিচিতি হিসেবে 'ইসলামের' দিকে মুখ ফিরিয়েছে। আবার ইসলামি পরিচিতির দিকে তাদের ফেরায় ধর্মীয়-পরবর্তী ইউরোপে নতুন সংশয়ের সৃষ্টি করেছে।

সঙ্কটটি দ্বিমুখী চলাচলের রাস্তা। অভিবাসন-বিষয়ক উভয় সঙ্কটের ফলে ইউরোপ এখন তার নিজের জটিলতার মধ্যে রয়েছে, বেদনার সাথে বিশ্বায়ন এবং প্রকৃত বহু-সংস্কৃতিবাদের পুরো প্রক্রিয়া নতুন করে মূল্যায়ন করছে। বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যের সহিংসতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইউরোপের মুসলিম জনসংখ্যার সাথে সম্পর্কিত নয়, তবে তার জের ধরে ইউরোপে ইউরো-মুসলিম সম্পৃক্ততায় মুষ্টিমেয় কিছু সহিংসতা ঘটে এবং সেই সূত্রে ইসলাম সম্পর্কে ইউরোপিয়ান ভীতি আরো গভীর হয়, সেটা আবার অভিবাসী মুসলিম পরিচিতি জোরদার করে। এটা একটা ভয়ঙ্কর চক্রে পরিণত হতে পারে। নতুন অ-জাতিগত 'মুসলিম' পরিচিতি গ্রহণ কি বৃহত্তর একীভূত হওয়ার দিকে এক ধাপ অগ্রগতি? কিংবা চূড়ান্তভাবে একীভূত হওয়াকে আরো কঠিন করে তোলার আশঙ্কাযুক্ত নতুন সামাজিক সংহতির দিকে আরেকটি জোরালো পদক্ষেপ?

একীভূত হওয়া নিয়ে ইউরোপের উদ্বেগ ভিত্তিহীন নয়। মুসলমানেরা হয়তো এখন সত্যিই আরো কঠিন সাংস্কৃতিক গ্রুপে যেটাকে পুরোপুরি আত্মস্থ করা বলতে গেলে যায় না, মূলত ওই সংস্কৃতিতে দীর্ঘ দিন জোরালোভাবে সম্পৃক্ত থাকায়, একে নিয়ে গর্ব এবং ঐতিহাসিক আত্মসচেতনতার কারণে এবং ইসলামি সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়কে রক্ষায় এর দৃঢ় সঙ্কল্পের জন্য। এ ছাড়াও ইসলাম প্রথম প্রজন্মের এসব অভিবাসীর নির্দিষ্ট সামাজিক শক্তির ব্যবস্থা করে দেবে বলে মনে করা হয়ে থাকে, যা একীভূতকরণ প্রক্রিয়ার দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দিকে সক্ষম।

বর্তমানে জাতিগত বা এমনকি ভাষাগত পরিচয়ের চেয়ে 'মুসলিম' পরিচিতি ধরে রাখার প্রশ্নই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। কেউ হয়তো খুশিমনেই ডাচ শিখতে পারে, ডাচ সমাজে কাজও করতে পারে, কিন্তু মুসলিম পরিচয়টি ত্যাগ করতে চাইবে না। সম্পূর্ণভাবে মিশে যাওয়া বলতে যদি বোঝায় মূল সংস্কৃতি পুরোপুরি খুইয়ে ডাচদের সাথে সাংস্কৃতিকভাবে পার্থক্যহীন হয়ে যাওয়া, তবে বেশির ভাগ অপাশ্চাত্য সংখ্যালঘুর কাছে তা গ্রহণযোগ্য ধারণা বলে বিবেচিত হচ্ছে না। ডাচ ও মুসলিম উভয়টি হওয়া

নিশ্চিতভাবেই অসম্ভব কোনো কাজ নয়। এটা দিয়ে যদি বোঝায় ডাচ নাগরিক মূল্যবোধ গ্রহণ, সৎ নাগরিক হওয়া, ডাচ সমাজে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং হল্যান্ডের জীবনযাত্রায় অবদান রাখা, তবে ডাচ হওয়া খুবই সম্ভব। এবং কয়েক প্রজন্মের মধ্যে ইস্যুটি তার তীব্রতা হারিয়ে ফেলবে।

আমেরিকান সমাজে মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে এর আগে ইহুদি সম্প্রদায় যে সমস্যায় ভুগছিল, এর সাথে বর্তমানেরটির অদ্ভুত মিল রয়েছে। আমেরিকান স্কলার এরিক গোল্ডস্টেইন বিষয়টি বলেছিলেন এভাবে :

উনিশ শতকের শেষ দশকটি মধ্য ইউরোপ থেকে আসা ইহুদি অভিবাসীদের জন্য সামাজিক একীভূত হওয়ার নজিরবিহীন সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। এসব সুযোগ ইহুদিদের উচ্ছ্বসিত করলেও তারা তাদের এবং বাকি সমাজের মধ্যে কোন ধরনের সীমান্ত থাকবে তা নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেছিল। এসব উদ্বেগের বেশির ভাগ সৃষ্টি হয়েছিল একীভূত হতে ইহুদি প্রেরণা এবং ইহুদি পরিচিতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় তাদের ইচ্ছার মধ্যকার উত্তেজনা থেকে। নির্যাতন ও সামাজিক বহিষ্কারের ইহুদি ইতিহাস তাদের দৃঢ় সংখ্যালঘু সামাজিক সচেতনতায় অনুপ্রাণিত করেছে, যা সহজে সমর্পণযোগ্য নয় এবং সেটা তাদের জোটবদ্ধভাবে টিকে থাকার ওপর অনেক গুরুত্ব দেয়ার উপলব্ধি সৃষ্টি করেছে। সামাজিক সম্পর্ককে সুরক্ষাদায়ক শক্তি বিবেচনা করা হয়েছিল। অতীতে এটা ইহুদিদের টিকে থাকা নিশ্চিত করায় বেশির ভাগ ইহুদি এসব বন্ধন ভেঙে দিতে অনাগ্রহী ছিল।

ইহুদি সম্প্রদায়ের এসব উদ্বেগ অকৃত্রিম। মার্জিত রুচির ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়টি সাধারণভাবে তাদের বিলীন করে দেয়, এমনভাবে একীভূত হতে অনাগ্রহী। দীর্ঘ সময়েও ইহুদিরা আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান সমাজে সামান্যই একীভূত হয়েছে, তারা ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হয়েছে, যা অনেকে জীবদ্দশাতেও মুখোমুখি হয়েছে। অধিকন্তু অনেক দশক ধরে ইহুদিরা চরমপন্থী আন্দোলন ও নৈরাজ্যবাদী সন্ত্রাসবাদে সম্পৃক্ত ছিল, যা ২০ শতকের প্রথম দিকে পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনায় আচ্ছন্ন ছিল, ঠিক এখন যেমন মুসলিম সন্ত্রাসবাদ নিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে।

বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা নিশ্চিতভাবেই অসংখ্য ব্যাপারেই ইহুদিদের চেয়ে অনেক ভিন্ন। নিরাপত্তাবিষয়ক যেকোনো ইস্যু প্রশ্নে এখনকার মুসলমানেরা গোপন ও প্রকাশ্য নানা ধরনের তীব্র সন্দেহের বস্তু, অনেক সময় তারা ন্যায়সঙ্গত অধিকারের ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হয়। পাশ্চাত্যের মুসলমানেরা এখনো গণরাজনৈতিক বিশুদ্ধতার সুবিধা পায়নি; তাদের বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি এখনো প্রকাশ্যে এমনসব প্রতারণা, ব্যঙ্গবিদ্রুপ, উপহাস ও ঘৃণার বস্তু হয়ে রয়েছে, যা আফ্রিকান-আমেরিকান, ইহুদি বা নেটিভ আমেরিকান কারো ক্ষেত্রে বরদাশত করা হয় না।

অর্থাৎ প্রধান বিতর্কটি মুসলিম বিশ্বেরই প্রবল ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার এক বিশেষ সময়ে বিপুলসংখ্যক অশ্বেতাঙ্গ লোকের অভিবাসনজনিত সমস্যাকে ঘিরে। এ ছাড়াও বেশির ভাগ অভিবাসী গ্র"পের চেয়ে ইসলাম অনেক বেশি দৃঢ় সামাজিক বন্ধন এবং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থান করতে পারে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে সামান্যই। তবে যুক্তরাষ্ট্র আগেও 'হজমে অযোগ্য' কিংবা 'একীভূত না হওয়া' সংখ্যালঘুদের দেখেছে। হাঙ্গেরিয়ান, ইতালিয়ান, আইরিশ, চীনা এবং অবশ্যই ইহুদিরা এক সময় নিয়মিতভাবে 'গোষ্ঠীবদ্ধ' হিসেবে অভিহিত করা হতো। একটি বিশেষ মাত্রার গোষ্ঠীপ্রীতি সামাজিক বিকল্পের অনুপস্থিতিকেই প্রতিফলিত করে।

বামধারা ও ইসলামের মধ্যে অপবিত্র জোট?

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নব্যরক্ষণশীল ও জায়নবাদীদের গ্রুপগুলোর মধ্যে নতুন আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে বলে বামধারা ও ইসলামের মধ্যে বিপজ্জনক ও অপবিত্র জোট গড়ে উঠছে : ইউরোপিয়ান-ভিত্তিক এই জোটের বামপন্থী দলগুলো বিপুলসংখ্যক ক্লায়েন্ট তথা ভোটার পাবে, বিনিময়ে তারা মুসলমানদের সুবিধা ও ভর্তুকি দেবে এবং সেই সাথে মুসলমানদের নতুন করে প্রবেশের জন্য সীমান্তগুলো কম-বেশি খোলা রাখবে।

দ্বিতীয় মিলটি হলো আমেরিকার প্রতি ঘৃণার উপলব্ধি, যে ব্যাপারে বামরা ইসলামপন্থীদের সাথে একমত বলে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ বামদের প্রতি আমেরিকানবিরোধী প্রবৃত্তি একই রকম রেখেই ইসলামপন্থীরা আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের বামপন্থীবিরোধীদের ঘাড়ে সওয়ার হচ্ছে। আমেরিকান বিশ্লেষক উইলিয়াম এস লিন্ড লিখেছেন : "লন্ডনে সাম্প্রতিক সময়ের [জুলাই ২০০৫] এবং ইউরোপ আমেরিকায় নিশ্চিতভাবেই হতে যাওয়া আরো কয়েকটি বোমা হামলা সম্ভব হয়েছে মার্কসবাদী-ইসলামিস্ট আঁতাতের ফলে। আবারো বলছি, দু'টি দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ শত্র", মার্কসবাদ (বিশেষভাবে, সাংস্কৃতিক মার্কসবাদ, যা সাধারণভাবে 'পলিটিক্যাল কারেক্টনেস' নামে পরিচিত) ও ইসলাম তাদের অভিন্ন শত্র" তথা খ্রিষ্টান পাশ্চাত্যের অবশিষ্ট অংশের বিরুদ্ধে একে অপরকে সমর্থনের জন্য একটি অশুভ মিত্রতা গড়ে তুলেছে।"

এসব যুক্তি যে কৌতূহলের সৃষ্টি করে তা হলো, নব্য-রক্ষণশীলেরা বস্তুত বাস্তবতার নিখুঁত তবে অতি ক্ষুদ্র একটি উপাদানে আবদ্ধ। পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যবাহী আধিপত্য ও মার্কিন প্রাধান্যের বিরোধিতাকারী বিশ্বের বিভিন্ন মাত্রার রাজনৈতিক গ্র"পগুলোর মধ্যে একটি সম্ভাবনাময় জোট সৃষ্টি এবং তাদের পাশ্চাত্য ও মার্কিন প্রভাব প্রতিরোধের জন্য তাদের মধ্যে সহযোগিতা নিয়ে সৃষ্ট ভয়। নব্যরক্ষণশীলেরা অবশ্য একক আমেরিকান আধিপত্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের মার্কিন প্রয়াসকে বর্ণনা করেন জুদিও-খ্রিষ্টান ঐতিহ্য সংরক্ষণ হিসেবে। জুদিও-খ্রিষ্টান ঐতিহ্য পশ্চিমা সংস্কৃতির একটি অংশমাত্র হলেও মার্কিন বৈশ্বিক আধিপত্য এরচেয়ে অনেক বড় বিষয় এবং তা কেবল ইসরাইল এবং জুদিও-খ্রিষ্টান ঐতিহ্য নয়, বরং আরো বড় কিছুর সাথে সম্পৃক্ত অন্য শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে আপত্তির মুখে পড়ে। মুসলিমবিরোধী ডানপন্থী একটি ওয়েবসাইটের পর্যবেক্ষণ এমন :

প্রবাসী ইরানি আমির তাহেরিও এই 'লাল-কালো' সহযোগিতা লক্ষ করেছেন। তার মতে, ইউরোপের কট্টর বামধারাটি মহাদেশে 'মুসলমানদের দেখে নতুন নিম্ন-শ্রেণী' হিসেবে : 'ইউরোপিয়ান মার্কসবাদী-ইসলামপন্থী জোট সঙ্গতিপূর্ণ কোনো রাজনৈতিক প্লাটফর্মের ব্যবস্থা করে না। এর আদর্শ তিনটি থিমের ওপর নির্মিত : যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ঘৃণা, মানচিত্র থেকে ইসরাইলকে মুছে দেয়া এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক-ব্যবস্থায় ধস সৃষ্টির আশা।'

অর্থাৎ যুদ্ধরেখা টানা হয়ে গেছে, ইউরোপিয়ান সমাজে মুসলিম একীভূতকরণ জটিল করা হচ্ছে এবং ইউরোপিয়ান মুসলমানদের কল্পমূর্তিতে বৈশ্বিক আদর্শগত সংগ্রাম ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে।

অমুসলিম সমাজে মুসলিম সম্পৃক্ততা

বিপুলসংখ্যক ব্রিটিশ বিশ্লেষক যুক্তরাজ্যের মুসলমানদের ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে অবস্থানকারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। অভিবাসনের একেবারে প্রথমদিককার প্রজন্মের জন্য তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে সত্যি ছিল, তখন তাদের নিজ দেশে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ছিল একটি বিপজ্জনক প্রক্রিয়া এবং এমনকি রাজনীতির জের ধরে নিরাপত্তার জন্য তাদের নিজ দেশ ছেড়ে বিদেশী সংস্কৃতিতে পালানোর প্রয়োজন হতো।

কিন্তু আমিন নাসের যুক্তি দিচ্ছেন, যুক্তরাজ্যের প্রথম প্রজন্মের মুসলিমরা আসলেই রাজনৈতিকভাবে সচেতন, তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন ও নাগরিক অধিকারের জন্য তারা সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করছে। ব্লেয়ার সরকারের আমলে মতপ্রকাশে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য দুর্ভোগ বয়ে আনা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের ব্যাপারে এটা বিশেষভাবে সত্য।

আর খাপ খাওয়ানোর বিস্ময়কর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ফ্রান্সের মোট মুসলিম ছাত্রের সম্ভবত ১০ ভাগ বর্তমানে প্রাইভেট ক্যাথলিক স্কুলে যায়। এর একটা কারণ হলো মুসলিম স্কুলের তুলনামূলক স্বল্পতা। কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো- মুসলিম মা-বাবা বিশ্বাস করে, ক্যাথলিক স্কুলগুলো জীবনে ধর্মের ভূমিকার ব্যাপারে অনেক সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং রাষ্ট্রীয় সেকুলার স্কুলের চেয়ে ইসলাম সম্পর্কে বেশি সহমত প্রদর্শন করে। মুসলিম মা-বাবা নৈতিক আচরণের ওপর গুরুত্ব দিতেও পছন্দ করে। তারা ক্যাথলিক ধর্মতাত্ত্বিক নির্দেশনার ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন নন। তা ছাড়া ক্যাথলিক স্কুলে শ্রেণিকক্ষে মেয়েদের হেডস্কার্ফ পরা নিষিদ্ধ নয়, যেমনটা রয়েছে ফরাসি ক্যাথলিক স্কুলে। অর্থাৎ ধর্মীয় পর্যায়ে এসব স্কুলে ভালো সহাবস্থান রয়েছে, যা পরবর্তী প্রজন্মকে বহুধর্মীয় উপলব্ধি বোঝানোর জন্য সুন্দর ভিত্তির ব্যবস্থা করতে পারে।

আর জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রশাসন মুসলিম বিশ্বে বিধ্বংসী নীতি অনুসরণ করে সঙ্কটটি আরো তিক্ত ও গভীর করে ফেললেও আমেরিকান সমাজ নিজে কিন্তু মুসলমানদের একীভূত করার ব্যাপারে ইউরোপিয়ান সমাজের চেয়েও অনেক বেশি সফল হয়েছে। প্রথমত আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, উত্তর আমেরিকায় অভিবাসন করা বেশির ভাগ মুসলিমই মোটামুটিভাবে তাদের ইউরোপিয়ান শ্রমশ্রেণীর ধর্মভাইদের চেয়ে

তুলনামূলক বেশি পেশাদার, তুলনামূলক বেশি শিক্ষিত এবং সাংস্কৃতিক পালাবদল তৈরিতে বেশি সক্ষম। অধিকন্তু উত্তর আমেরিকার সমাজগুলো অনেক বেশি অভিবাসী সমাজ হওয়ায় সেগুলো ইউরোপের চেয়ে অনেক বেশি বহুসাংস্কৃতিক। যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই শ্বেতাঙ্গ থাকতে হবে বলে মুষ্টিমেয় কিছু আমেরিকান উৎকট স্বাদেশিককে বাদ দিলে উত্তর-ইউরোপিয়ান প্রটেস্ট্যান্ট সমাজে বেশির ভাগ আমেরিকানই আসলে মনে করে না যে নতুন নতুন অভিবাসী আসা মানে সংস্কৃতি মৌলিকভাবে বদলে যাওয়া। স্ক্যান্ডিনেভিয়া, হল্যান্ড বা বেলজিয়ামের মতো ইউরোপিয়ান সমাজগুলো অবশ্য অনেক কম জনসংখ্যার হওয়ায় সেখানে বিপুলসংখ্যক অভিবাসীর আগমনের অর্থ তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সতর্কভাবে সংরক্ষিত প্রকৃতি বদলের সূচনা হতে পারে। এসব দেশ কখনো ব্যাপক কোনো পন্থায় বহুসংস্কৃতির প্রত্যাশা কখনো করেনি, সেই প্রক্রিয়াকে দুঃখজনক হিসেবেই বিবেচনা করে।

ইউরোপে ইসলামবিষয়ক শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ তারিক রামাদান জোর দিয়ে বলেছেন, একীভূত হওয়া দ্বিমুখী সড়ক। তার বিশ্বাস, মুসলমানদের অবশ্যই প্রথমে তাদের দায়দায়িত্ব পালন করতে হবে, কেবল তারপরই তারা নতুন সমাজে তাদের অধিকার দাবি করতে পারে। তার মতে, যেসব মুসলিম স্বাধীনভাবে ইউরোপে এসেছে, তাদের জন্য ইউরোপিয়ান সংস্কৃতি, এর ভাষা এবং ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে প্রাপ্ত এর মনস্তত্ত্ব কেবল গ্রহণ করলেই হবে না, সেটা তাকে মনেপ্রাণে উপলব্ধিও করতে হবে। মুসলমানদের ওই অভিজ্ঞতার বাইরে কিংবা সংস্কৃতিকে দূরে সরিয়ে রাখলে চলবে না, যদিও এর মানে এই নয় ইউরোপিয়ান জীবনযাত্রার সব বিষয়ই মুসলমানদের পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে। রামাদান ইউরোপিয়ান মুসলমানদের মধ্যে 'সমাজে সম্পৃক্ত হতে না চাওয়া আক্ষরিক অনুসারী আর ঐতিহ্যবাদীদের' অস্তিত্ব থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেন, এবং আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা মনে করে ইউরোপিয়ান সব কিছুই ইসলামি ঐতিহ্যের বিরোধী। কিন্তু [মুসলিম] মূলধারাটি তাদের নিয়ে গঠিত, যারা মনে করে, ইউরোপ তাদের আবাসভূমি, এটাই ইউরোপিয়ান বাস্তবতার বড় অংশ। আর ইউরোপিয়ান সমাজে মুসলমানদের নতুন নতুন প্রজন্মের জন্মগ্রহণ এবং বেড়ে উঠতে থাকায় এই বাস্তবতা অব্যাহত বিবর্তন ও একীভূত হওয়ার মধ্যে রয়েছে।

রামাদান উল্লেখ করেন, ইউরোপ ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী সব কিছু করার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে; এখানে কোনো মুসলমানকেই অন্যদের জীবনযাত্রা অনুসরণে বাধ্য করা হচ্ছে না। যদি তারা বিশ্বাস করে ইউরোপিয়ান জীবনযাত্রার ব্যাপারে পরিবর্তন আসা দরকার, তবে তাদের ব্যালটবাক্সের মাধ্যমেই ওই পরিবর্তন করতে হবে। আবার ইউরোপিয়ানদেরও অবশ্যই বুঝতে হবে, একীভূত হওয়া মানে মুসলমানদের স্রেফ ঐতিহ্যবাহী ডেন বা ডাচের মতো জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে বাধ্য করা নয়। ইউরোপিয়ানদের বুঝতে হবে, একীভূত হওয়ার প্রকৃতিতেও কত পরিবর্তন আসছে : ইউরোপ কোনো স্থির ও জমাট বাঁধা সংস্কৃতি নয়, যেখানে মুসলমান অভিবাসীরা হঠাৎ করে বৈসাদৃশ্য শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে। ইউরোপিয়ান সংস্কৃতি গঠিত হয়েছে দুই হাজার বছরের সংস্কৃতি, হানাদার, বর্বর, যুদ্ধ ও বহিরাগত প্রভাবের মহাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে। ইসলাম মধ্যযুগীয় ইউরোপিয়ান সংস্কৃতির বিকাশে

ব্যাপকভাবে অবদান রেখেছিল, গ্রিক দর্শন হস্তান্তর করেছিল। অর্থাৎ ইউরোপিয়ানদেরও পরিবর্তনের প্রত্যাশা করতে হবে, বিশ্বায়নের শক্তিগুলোর মুখোমুখি হওয়ার প্রেক্ষাপটে তাদের সংস্কৃতিগত বিবর্তনকে খুঁজে নিতে হবে।

রামাদান আমাদের সবারই বাস্তবতার উল্লেখ করে পরিচিতিগত সমস্যাটিরও সমাধান দিয়েছেন এই বলে যে, আমাদের সবারই নানা ধরনের পরিচিতি রয়েছে। এ কারণে মুসলমানদের এই প্রশ্ন করা ঠিক নয়, 'কোন পরিচিতি আগে, মুসলিম না জার্মান?' রামাদান নিজের পরিচয় দেন এভাবে– 'একজন সুইস, একজন শিক্ষাবিদ, একজন পুরুষ, একজন মুসলমান, একজন ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত, সংস্কৃতিতে ইউরোপিয়ান' ইত্যাদি। পরিস্থিতির আলোকে বিভিন্ন ধরনের পরিচয়ের উদ্ভব ঘটে।

এসব সমস্যা আমেরিকায়ও বেশ ভালোভাবে দেখা যায়। সেখানে সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলোও অনেক সময় বর্ণবাদী আকার লাভ করে যখন সেগুলোকে স্রেফ 'মেক্সিকান বা কৃষ্ণাঙ্গ' হিসেবে কিংবা আগেকার যুগে ইতালিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, আইরিশ, রোমান ক্যাথলিক, ইহুদি বা চীনা (ওই সময় মনে করা হতো এসব লোক 'একীভূত' হয়নি) হিসেবে অভিহিত করা হয়। আমেরিকা ও ইউরোপের সমাজগুলোতে মুসলমানদের একীভূত করা আসলেই সামাজিক ইস্যু, আর প্রায়ই প্রতিটি স্থান ও প্রতিটি গ্রুপে ভিন্ন চরিত্র লাভ করে। তবে একীভূতকরণ ও আপন করে নেয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সময়ের পরিক্রমায় এসব সমস্যা সহজাতভাবে অবশ্যই মিটে যাবে। আমেরিকায় বারাক ওবামার নির্বাচন একীভূত হওয়ার ব্যাপারে একটি বিরাট মাইলফলক রেখে গেছে, ঠিক যেমন হয়েছিল প্রথম আমেরিকান রোমান ক্যাথলিক প্রেসিডেন্ট হিসেবে জন এফ কেনেডির নির্বাচন।

পাশ্চাত্যের ইসলামবিরোধী মনোভাব

যারা ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মকে পরস্পরের বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রামে নিয়োজিত দেখেন (ধর্মান্ধ আলকায়েদার বিশ্ববীক্ষণের আয়নায় প্রতিফলিত ছবি) তাদের কাছে পাশ্চাত্যে অন্যদের উপস্থিতিতে পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। ওহাইয়োর বিশাল ওয়ার্ল্ড হারভেস্ট চার্চ অব কলম্বাসের পাদ্রি রড পার্সলের উদাহরণ নিন। ২০০৮ সালে তিনি রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জন ম্যাককেইনের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি লিখেছেন :

ইসলামের সত্যিকারের প্রকৃতি (অর্থাৎ আমরা যা দেখি তার বিপরীতে বাস্তব চিত্র) আমাদের বোঝা কত যে গুরুত্বপূর্ণ, তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। ...আমি বিশ্বাস করি না, ইসলামের সাথে আমাদের ঐতিহাসিক সঙ্ঘাত না বোঝা পর্যন্ত আমাদের দেশ এর ঐশী উদ্দেশ্য সত্যিকারভাবে পূরণ করতে পারবে। আমি জানি, এই বক্তব্য চরমপন্থী মনে হচ্ছে, তবে প্রকাশিত অর্থ কমাতে পারি না। বাস্তবতা হলো, আমেরিকা প্রতিষ্ঠার একটি উদ্দেশ্য ছিল এই মিথ্যা ধর্মটিকে ধ্বংস করা এবং আমি বিশ্বাস করি, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ ছিল সঙ্ঘাতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রজন্মগত আহ্বান, যা আমরা আর অগ্রাহ্য করতে পারি না।

১৪৯২ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের নতুন বিশ্বের দিকে সমুদ্রযাত্রার অনেক স্বপ্নের একটি ছিল ইসলামকে পরাজিত করা। কলম্বাস স্বপ্ন দেখেছিলেন, নতুন বিশ্বের সম্পদ পেয়ে ইউরোপের সেনাবাহিনী শক্তিশালী হয়ে ইসলামের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করবে। অংশত এই স্বপ্ন নিয়েই আমেরিকার সূচনা হয়েছিল।

বিখ্যাত ইভানজেলিস্ট ফ্রাঙ্কলিন গ্রাহাম ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর হামলার পর এনবিসি নিউজকে বলেছিলেন : 'আমরা ইসলামকে আক্রমণ করছি না, ইসলামই আমাদের আক্রমণ করেছে। ইসলামের ঈশ্বর আমাদের ঈশ্বর নয়। তিনি খ্রিষ্টানদের ঈশ্বরের সন্তান বা জুদিও-খ্রিষ্টান বিশ্বাসের নন। এটা ভিন্ন ঈশ্বর, আর আমি বিশ্বাস করি, এটা খুবই অশুভ ও পাপপূর্ণ ধর্ম।'

বিখ্যাত ইসলামবিষয়ক নব্য রক্ষণশীল স্কলার বার্নার্ড লুইস এই আশঙ্কা ছড়াচ্ছেন, ইউরোপের বর্তমান জনসংখ্যার ধারাটি শেষ পর্যন্ত মুসলিম ইউরোপের অবস্থা সৃষ্টি করবে। যদিও প্রকৃত চিত্র এই ধারণার সাথে মেলে না। অন্য ডানপন্থী বিশ্লেষকেরা 'ভবিষ্যৎ ইউরোবিয়া'র আতঙ্ক ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করছেন। ইসলাম সম্পর্কে আতঙ্কবাদীরা চরমপন্থী ধর্মনেতাদের ছোট্ট একটি গ্রুপের (যেমনÑ সিরিয়ার শেখ ওমর বাকরি মোহাম্মদ) অগ্নিঝরা বক্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করে তাদের দাবি যৌক্তিক করে তুলছেন। এক সময় লন্ডনের প্রিয়পাত্র টেলিভিশনকে হতবিহ্বল করছেন :

আমি কেন ওসামা বিন লাদেনের নিন্দা করব? আমি টনি ব্লেয়ারের নিন্দা করব, আমি জর্জ বুশের নিন্দা করব। আমি কখনো ওসামা বিন লাদেন বা অন্য কোনো মুসলিমের নিন্দা করব না... আমরা বেসামরিক ও অ-বেসামরিক, নির্দোষ ও অ-নির্দোষের মধ্যে পার্থক্য করব না। পার্থক্য হবে কেবল মুসলিম আর অবিশ্বাসীর মধ্যে। আর অবিশ্বাসীর জীবনের কোনোই মূল্য নেই। তাদের কোনো পবিত্রতা নেই।

কিংবা অ্যান্টওয়ার্পে স্থায়ী লেবাননি দিয়াব আবু জাজাহর মন্তব্য শুনুন। তিনি একীভূত হওয়ার পাশ্চাত্য আদর্শকে 'সাংস্কৃতিক ধর্ষণ' হিসেবে সমালোচনা করে বলেছেন, তার লক্ষ্য ইউরোপের সব মুসলমানকে একটি একক স্বাধীন সম্প্রদায়ে আনা।

চরমপন্থী কোনো কোনো ধর্মনেতার (তাদের অনেকে পাশ্চাত্যের অনেক মসজিদের অবস্থানকে কাজে লাগাচ্ছেন), বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের, মন্তব্য সত্যিই ক্ষোভ সৃষ্টিকারী ও প্ররোচনাদায়ক। সব গণতান্ত্রিক সমাজের চরমপন্থীদের মতো তারাও ব্যাপক প্রচার পায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধে'র মধ্যে এ ধরনের মন্তব্য দ্বিগুণ উসকানি দান করে এবং সত্যিকার অর্থে কিছু সম্ভাব্য সহিংস চরমপন্থীর মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করে। যদিও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাবিষয়ক যেকোনো ধরনের সীমা অবশ্যই সতর্ক এবং সুচিন্তিতভাবে বিধিসম্মত মাত্রার নিখুঁত বর্ণনা দেয়। তবে অপ্রতিনিধিত্বশীল চরমপন্থীর একটি ছোট্ট গ্রুপের বক্তৃতাকে ইউরোপ বা অন্য কোথাও ইসলামের সত্যিকারের প্রকৃতির প্রতিনিধি হিসেবে কোনোভাবেই গ্রহণ করা ঠিক নয়। ছোট্ট কোনো সমস্যাকে কোনোভাবেই বড় সমস্যায় পরিণত করা যাবে না।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, হতাশাজনক মনস্তত্ত্ব ও ঘেঁটো বিচ্ছিন্নতায় বসবাসকারী অনেক মুসলমান ষড়যন্ত্রতত্ত্ব এবং পাশ্চাত্যের অতীত উপনিবেশ বর্বরতার অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা ধারণ করার জন্য মুখিয়ে থাকেন। এসব ঘটনায় অনেক সত্য উপাদান আছে, তবে তাতে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ও সামঞ্জস্যতার অভাব থাকে। বর্ণচ্ছটার অপর প্রান্তে পাশ্চাত্যের আমরা সাধারণভাবে পাশ্চাত্য উপনিবেশ অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক, শুভ এবং ঔপনিবেশিকদের সদিচ্ছাপ্রণোদিত- এমন বিশ্বাসে বেড়ে উঠেছি। এ কারণেই উপনিবেশ আমলে পাশ্চাত্য বর্বরতা এমনকি একেবারে বস্তুনিষ্ঠ অভিযোগও কোনো ধরনের চিন্তাভাবনা করার সময় না দিয়েই পাশ্চাত্যবাসী অতিরঞ্জিত বা প্রান্তিক অভিহিত করে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে মুসলমানেরা যদি অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনা উপস্থাপন করার উদ্যোগ নেয়, তবে সেটা পাশ্চাত্যে

সহজে মনোযোগ পাবে না; এমনকি পাশ্চাত্যের নীতির পাশ্চাত্য সমালোচকেরাও সাধারণত মার্কিন মূল ধারার সংবাদমাধ্যমে প্রত্যাখ্যাত বা অগ্রাহ্য হন।

সবচেয়ে বেশি ঝামেলা সৃষ্টিকারী বিষয় হলো আমরা এখন ডানপন্থী মতাদর্শবিদদের পুরো শ্রেণীটির কাছ থেকে বেশ ব্যতিক্রমী মন্তব্যের মুখোমুখি হচ্ছি। তারা আসলে মুসলমানদের মৌলিক মানবপ্রকৃতিকেই চ্যালেঞ্জ করছে। তাদের মতে, ইসলাম হলো এমন এক সংস্কৃতির পণ্য যা বৈশ্বিক সভ্যতায় যোগদান করতে মৌলিকভাবেই অসমর্থ। তাদের মতে, এই বৈশ্বিক সভ্যতা সৃষ্টিতে ইসলামের তেমন কোনো ভূমিকাই নেই। এ ধরনের অভিযোগ কি অতীতে অন্য কোনো সভ্যতার বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল? হ্যাঁ, ১৯ ও ২০ শতকে পূর্ব ইউরোপের ভয়ঙ্কর নিপীড়ন অভিযানকালে এ ধরনের উসকানিমূলক ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছিল, যার পরিণতিতে ভয়াবহ মাত্রায় গণহত্যার সৃষ্টি হয়েছিল। ওইসব ঘটনায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বিষয়টি কেবল জাতিগত বৈষম্যই ছিল না; বরং পুরো বর্ণবাদী তত্ত্বই সংস্কৃতি হিসেবে ইহুদিদের নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এ ধরনের ঘটনা সাম্প্রতিক ইতিহাসে এখনো পাওয়া যায়।

এখন আমরা মুসলমানেরা আধুনিকতায় আসতে সক্ষম কি না তা নিয়ে দৃশ্যত গুরুতর আলোচনা শুনি। তারা নিজেদের আধুনিকতা থেকে দূরে রাখছে কি না, পাশ্চাত্যে আসলেই তাদের কোনো স্থান আছে কি না তা নিয়ে বিতর্ক হয়। এমন ভয় প্রকাশ্যেই ব্যক্ত করা হয়, মুসলমানেরা পাশ্চাত্যের জনসংখ্যার ওপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পরিকল্পনা করছে, তারা ইসলাম আরোপ করার পরিকল্পনা করছে এবং জঙ্গি ইসলাম অসমর্থভাবে খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের ওপর জয়ী হবে, কারণ ইউরোপিয়ানদের মধ্যে প্রতিরোধের কোনো কিছু নেই। অনেকে যুদ্ধরেখাও টেনেছে, ব্যানারও মেলে ধরেছে। দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, ইহুদি অভিজ্ঞতা আবার দেখা দিতে পারে এবং অনেকভাবেই মুসলমানেরা ইউরোপিয়ান সমাজে অনেকাংশেই নতুন ইহুদিতে পরিণত হতে পারে। এটা উল্লেখ করার মতো বিষয়, বিপুলসংখ্যক ইহুদিও ইসলামফোবিয়ার বর্তমান প্ররোচনাকে প্রাক-নাৎসি জার্মানি এবং ইউরোপিয়ান প্রোগ্রামের একই মানসিকতা ও পরিস্থিতির ইঙ্গিত বলে নিজেরা স্বীকার করে নিচ্ছে। তারা এটাকে ভীতিকর দেখে এ নিয়ে খোলাখুলি কথা বলছে।

ইউরো- মুসলিম ও সেকুলারবাদ

সেকুলারবাদের সাথে মুসলিম সমস্যার সবচেয়ে বেশি যে বিতর্কটি হয়, সেটা কী? সেটা হলো 'মুসলিম' পরিচিতির মৌলিক অস্তিত্বটি, বিশেষ করে ফ্রান্সে, ফরাসি সেকুলার (লেইসিত) ধারণাটিকে চ্যালেঞ্জ করে। লেইসিত কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মতো চার্চের সাথে আইনগতভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ বোঝায় না, বরং ধর্মের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বোঝায়। এই কঠোর সেকুলারবাদ অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিক্ষায় ফ্রান্সকে তার মুসলিম জনসংখ্যার বিরুদ্ধে সঙ্ঘাতের কারণ হয়েছে। ফরাসি ব্যবস্থায় রাষ্ট্র সরকারি স্কুলে ব্যক্তিগত ধর্মীয় অভিব্যক্তি বরদাশত করতে পারে না; ফলে মেয়েদের হেডস্কার্ফ পরার অনুমতি দেয়া হয় না। অথচ মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে এটা একটা উদ্বেগ ও সাংস্কৃতিক প্রতীকের প্রধান ইস্যু। পরিচিতির প্রতীক হিসেবে ধর্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এমন নতুন বিপুল সংখ্যালঘুর উপস্থিতিতে ফরাসি সেকুলারবাদের সাথে বর্তমানে বহুসংস্কৃতিবাদের নির্দেশনার সঙ্ঘাত সৃষ্টি হওয়ায় ফ্রান্স এবং সাধারণভাবে ইউরোপিয়ানদের লেইসিত-এর অর্থ নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হচ্ছে। সাধারণভাবে ধর্মকর্ম নিয়ে অনেক কম ভাবনায় থাকা ইউরোপিয়ানরা এখন সমাজে এবং জীবনযাপনে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হচ্ছে। ইস্যুটি অনেক সময় বেদনাদায়ক বিষয়ে পরিণত হয়। যে ইস্যুটিকে ইউরোপিয়ানরা অতীতে রক্তাক্ত 'ধর্মীয় যুদ্ধের' পর দফারফা করেছিল বলে বিশ্বাস করত, সেটাই আবার নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে।

নির্মম সত্য হলো, ক্যাথলিক চার্চ এই প্রবণতা লক্ষ করেছে এবং কিছুটা অনুমোদনসূচকভাবেই। ক্যাথলিক চার্চের আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ বিভাগের প্রধান কার্ডিনাল জ্যাঁ-লুই তুরাঁ বলেছেন, বর্তমানের ইউরোপে ধর্ম আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি আলোচিত ও লিখিত বিষয় হয়ে পড়েছে। 'এটা হয়েছে মুসলমানদের কারণে।... ইউরোপে তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যালঘুতে পরিণত মুসলমানেরাই সমাজে ঈশ্বরের স্থান দাবি করেছে।... আমরা বহু সাংস্কৃতিক ও বহু-ধর্মীয় সমাজে বাস করি, এটা সুস্পষ্ট বিষয়। এমন কোনো সভ্যতা নেই, যা ধর্মীয়ভাবে বিশুদ্ধ।... ধর্ম নিয়ে সংলাপ নিন্দিত।'

সেকুলারবাদের কঠোর উপদানগুলো (ব্যক্তিগত জীবনে তারা সাধারণত স্পষ্টভাবেই অধর্মীয় থাকে) কুখ্যাত ডেনিশ কার্টুন ঘটনাকে শিরোনামে এনে ইস্যুটিকে সামনে আনার চেষ্টা করে। আবার মুষ্টিমেয়

উদার সেকুলার ডেন রাজনৈতিক শিষ্টাচারের মুণ্ডুপাত এবং হজরত মুহাম্মাদ সা:-এর মর্যাদাহানিমূলক কার্টুন প্রকাশ করার মাধ্যমে তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ধর্মবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করেছে। মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া (এটাকে অশ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও ব্ল্যাসফেমির হিসাবি ও পরিকল্পিত কাজ হিসেবে মনে করা হয়) ছিল ক্রুদ্ধ, যন্ত্রণাদগ্ধ, কঠোর ও অনুমিত।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ধর্মীয় স্পর্শকাতরতার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়ার এ ঘটনাটি নিয়ে আমরা কী করব? ডেনরা ছিল যেকোনো বিষয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রয়োগে তাদের অধিকারের মধ্যেই। কিন্তু প্রশ্নটি হয়তো এমন হতে পারে- এমনটি করা যায়, কেবল এটুকু দেখানোর জন্যই তাদের নবী সা:কে বিদ্রুপ করা কতটুকু বুদ্ধিমান ও কতটা স্পর্শকাতর ছিল? অধিকন্তু ঘটনাটি এমন সময় ঘটেছে, যখন পুরো মুসলিম বিশ্ব মনে করছে, তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধের কবলে পড়ে আছে। কার্টুন ঘটনাটি বিশ্বাসী ডেনদেরকে অবিশ্বাসী ডেনদের মুখোমুখি করেনি, বরং অবিশ্বাসী ডেনদের নামিয়েছে একটি ছোট্ট, পশ্চাৎপদ, ভীত সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে, ইউরোপে যাদের কণ্ঠ বা মর্যাদার অভাব রয়েছে, তাদের দৃষ্টিতে এটা হলো তাদের মূল অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ এবং তাদের উপস্থিতির বিরুদ্ধে বিদ্রুপ। এ ধরনের ঘটনা ইহুদিদের 'ঈশ্বরের মনোনীত জাতি' হিসেবে বিদ্রুপ করা এবং হলোকাস্ট নিয়ে হাস্যরস ও ব্যঙ্গ করার মতোই। (জার্মানিতে হলোকাস্ট অস্বীকার করার বিরুদ্ধে আইন হয়েছে। ফ্রান্সের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বিলিতে ২০০৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আর্মেনিয়ানদের বিরুদ্ধে উসমানিয়া গণহত্যা অস্বীকার নিষিদ্ধ করে বিল পাস হয়েছে।)

ডেনিশদের এ কাজটি পুরোপুরি আইনি কাঠামোর মধ্যে ন্যূনতম পর্যায়ে হলেও বিচারবুদ্ধি, স্পর্শকাতরতা এবং সামাজিক উপলব্ধির ঘাটতির বিষয়টিই তুলে ধরেছে। আইনসম্মত সব কিছুই বিজ্ঞোজনোচিত নয়। বস্তুত পাশ্চাত্য এখানে দু'টি পবিত্র ও বেশ অচ্যালেঞ্জমূলক মূল্যবোধের অসমন্বয়যোগ্য পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে : পাশ্চাত্যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হ্রাস নিয়ে আলোচনা করা পর্যন্ত অচিন্তনীয়, এই অধিকার পবিত্র। মুসলমানদের মধ্যে, এমনকি আচারনিষ্ঠ না হলেও, ইসলাম ও নবী সা:কে নিয়ে বিদ্রুপ ও অবমাননা করা অচিন্তনীয়- এটা পবিত্র এলাকা। (একটি ইতিবাচক নোট : মুসলমানেরা ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় তাদের নিজস্ব কমেডিয়ান তৈরি করছে। তারা মুসলিমবিরোধী ঘৃণা ও বৈষম্যের ব্যাপারে মুসলিম ভীতি সরাসরি না জাগিয়েই তাদের নিজস্ব মুসলিম সমাজ নিয়ে ভদ্রভাবে বিদ্রুপ শুরু করেছে।)

১৩ শ' শতকে মঙ্গোল সেনাবাহিনী যখন প্রাচ্যের বেশির ভাগ এলাকায় ইসলামি শক্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, তখন ছাই থেকে কেমন করে ইসলামি সভ্যতা আবার উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হলো? এমনকি সর্বনিম্ন পর্যায়ে হলেও সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনৈতিক ধারা হিসেবে ইসলামের প্রতিরোধ ক্ষমতা অভিভূত করে। একেবারে শুরু থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত (ইউরোপিয়ান উপনিবেশবাদ, বিশ্বযুদ্ধ এবং স্নায়ুযুদ্ধসহ) সব ধরনের ঘটনার মাধ্যমে মুসলিম সমাজগুলোর মধ্যে দৃঢ়-সংলগ্নতা অব্যাহত থাকায়

বহিরাগত চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে তার সভ্যতাগত এক ধরনের পারস্পরিক সংযুক্ততার ধারণা সৃষ্টি করে, এমনকি যদিও মুসলিম সভ্যতা আধুনিক সময়ে পাশ্চাত্য শক্তি ও প্রযুক্তির দিক থেকে অনেক পেছনে রয়েছে। ইসলাম তা-ই ইসলামি সংস্কৃতির উচ্চ মানের অভিন্ন সভ্যতায় অঞ্চলটিকে একত্র, ঐক্যবদ্ধ রেখেছে। তবে ইসলাম আবির্ভাবের আগেই গভীরভাবে শিকড় গেড়ে থাকা পাশ্চাত্য, রোম এমনকি কনস্টানটিনোপলের বিরুদ্ধে দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের মধ্যেও অব্যাহত থাকে।

ইসলামে বাণীর সরলতা দৃশ্যত ধর্মটিকে গ্রহণ করতে আসা লোকজনের সাথে কথা বলে। অসংখ্য চার্চ রাজনৈতিক-ধর্মীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে নির্ধারিত বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে জটিল (রহস্যময়ও) খ্রিষ্টীয় ধর্মতাত্ত্বগুলোর তুলনায় ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক স্পষ্টতা ও সাবলীলতাও এর অনুকূলে কাজ করেছে। ইসলামের ধর্মীয় আবেদন এবং এর দ্রুত বিস্তারই সম্ভবত প্রথম দিকের অনেক খ্রিষ্টানশক্তির ইসলামকে ভয় পাওয়ার এবং একে দানবীয় করে প্রচার করার কারণ ছিল। সব শাসকই সরকার পরিচালনায় কঠোরতা প্রদর্শনে বেশ সক্ষম হলেও শাসনকাজের ইসলামি ফর্মুলা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিরুদ্ধবাদী ব্যবস্থাগুলোর চেয়ে অনেক ভালোভাবে কাজ করে, যা শাসন-ব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়িত্বেরই প্রমাণ দেয়। শুরুতে তরবারি হয়তো সক্রিয় ছিল, কিন্তু তারপর সরকার পরিচালনার ইতিবাচক দক্ষতা অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হয়। শক্তিশালী অনেক সাম্রাজ্যের পতন লক্ষ করুন।

মধ্যপ্রাচ্যে নিজের নতুন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রাধান্য নিয়ে ইসলাম ছিল অপেক্ষাকৃত পুরনো ও নতুন আইডিয়াগুলোর মিশেল; ধর্মীয় চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের সাবেক ব্যবস্থাগুলোর সাথে তুলনামূলক বেশি স্বস্তিকরভাবে খাপ খাওয়ানোর উপযুক্ত। এই যুক্তি দেয়া কঠিন যে, ইসলাম এমন ধরনের নতুন ও আগ্রাসী শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেছিল, যা হঠাৎ করেই মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিকে বদলে দিয়েছিল কিংবা পাশ্চাত্যবিরোধী উদ্দীপনার নতুন ধরনের নজির প্রতিষ্ঠা করেছিল। সনাতন সংস্কৃতি, মনোভাব ও ভূ-রাজনীতি ভালোভাবেই টিকে ছিল, তবে এখন একটি ইসলামি স্বচ্ছ আবরণের মধ্যে। ইসলাম কখনো যদি অস্তিত্বশীল না হতো তবে কি গ্রিক ও রোমান বায়জান্টাইন সংস্কৃতির প্রকি সেমিটিক বৈরিতা অব্যাহত থাকত না?

অধ্যায় দশ

ইসলাম ও ভারত

বিশ্ব গত ৫০ বছরে হিন্দুপ্রাধান্যপূর্ণ ভারত ও মুসলিম পাকিস্তানের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ দেখেছে; এ ধরনের যুদ্ধের পরেরটি একে অপরের প্রতি পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের লড়াইয়েও পরিণত হতে পারে। কাশ্মির সঙ্ঘাত দীর্ঘ দিন ধরেই বিরোধের একটি প্রধান বীজ হিসেবে বিরাজ করছে। নিপীড়নমূলক বিবেচিত ভারতীয় শাসনের বিরুদ্ধে কাশ্মিরি মুসলিম মুক্তিকামী গ্রুপগুলো গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি প্রক্সি যুদ্ধও চলছে। অধিকন্তু সহিংস ইসলামি গ্রুপগুলো সাধারণত পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কিত, যারা ভারতের অভ্যন্তরে বেশ কয়েকটি রক্তাক্ত সন্ত্রাসী অভিযান চালিয়েছে। ভারত বা পাকিস্তানি জনগণের কেউই ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ প্রণীত ভারতবর্ষের তিক্ত বিভক্তি ভুলতে পারেনি। বিপুলসংখ্যক মানুষের হস্তান্তরকালে (ভারত থেকে মুসলমানদের পাকিস্তানে যাওয়া এবং নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে হিন্দু ও শিখদের ভারতে যাওয়া) ত্রিমুখী বর্বর আক্রমণে লাখ লাখ হিন্দু, শিখ ও মুসলিম নিহত হয়। এটা যদি 'ক্লাশ অব সিভিলাইজেশন্সের' ঘটনাস্থল না হয়, তবে কোনটি হবে?

অন্য সংস্কৃতিগুলোর সাথে ইসলামের সীমান্তগুলোর মধ্যে ভারতের সাথে তার 'সীমান্ত' (অন্য প্রধান সভ্যতাগুলোর সাথে ইসলামের সংস্পর্শ নিয়ে আমাদের আলোচনায় তৃতীয় উদাহরণ) অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। ভারতের সাথে কেবল ইসলামের সীমান্তই (পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সাথে) নয়, বরং বিপুলসংখ্যক মুসলমান হাজার বছর ধরে দেশটির অভ্যন্তরে হিন্দুদের সাথে তাদের নিজস্ব সমৃদ্ধ ও জটিল সম্পর্ক নিয়ে বসবাসও করছে। সময়ের পরিক্রমায় মুসলমানেরা ভারতীয় পর্যায়ে নানা ধরনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে : দক্ষিণে ইসলাম প্রচারক শান্তিপ্রিয় বণিক; উত্তরে মধ্য এশিয়া থেকে আগত বিজয়ী যোদ্ধা; ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে ইতিহাসের অন্যতম মহান 'সম্মিলিত সভ্যতা' অনন্যসাধারণ মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সৃষ্টিকারী এবং অবশেষে ১৯৪৭ সালের বিভক্তিতে পরাজিত সংখ্যালঘু হিসেবে নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রে কিংবা ভারতের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ভারতে সম্প্রদায়টি কার্যত বৈষম্যের বস্তু এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। ইসলামের সাথে প্রথম অখ্রিষ্টান সীমান্তের প্রতিনিধিত্বও করে ভারত। এখন আমরা এ দিকেই নজর দেবো।

ইসলামবিহীন বিশ্বে আমাদের বিকল্প দৃশ্যপটে ভারতের রেখাগুলো অনেক কম স্পষ্ট। এক হিসেবে ইসলাম না থাকলে বিষয়গুলো হতো বেশ ভিন্ন : মোগলদের অনন্যসাধারণ হিন্দু-মুসলিম মিশ্র সভ্যতা থেকে বিশ্ব বঞ্চিত হতো। একই সাথে সাম্প্রতিক ইতিহাসকে বৈশিষ্ট্য দানকারী হিন্দু, মুসলিম ও শিখদের

নোংরা ধর্মীয় যুদ্ধের কিছু অংশ থেকেও হয়তো রক্ষা পাওয়া যেত। ফলে এই প্রেক্ষাপটে আরো বেশি কৌতূহল সৃষ্টিকারী প্রশ্ন হতে পারে, হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যকার ধর্মীয় সংঘাত কি অনিবার্য ছিল? এটা কি রক্তাক্ত সীমান্ত বলা যায়? আজ আমরা যেখানে আছি, কেন আছি? এগুলোর পেছনে সত্যিই ধর্মীয় কারণ কতটা? নাকি সমস্যাটির মূল ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের স্বার্থ পূরণের নীতিতে পাওয়া যেতে পারে?

ভারতে ইসলমের প্রাথমিক মোকাবেলা মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক সীমান্তের প্রতিনিধিত্ব করে : হিন্দুধর্ম কেবল একটি প্রাচীন, বিশাল, জটিল ও বহুমুখী ধর্মই নয়, একই সাথে ইসলামের সামনে আসা এটাই ছিল প্রথম ধর্ম, যেটি মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মগুলো এবং 'আহলে কিতাব' (আসমানি গ্রন্থের অনুসারী জনগোষ্ঠী)-এর সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীন। মুসলমানদের জন্য হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করেছিল। হিন্দুধর্মের প্রকাশ্য সুস্পষ্ট ঈশ্বরবাদ, এর প্রথাবিরুদ্ধ ধর্মীয় ছবির প্রাচুর্য, প্রাণী, মানুষ ও পৌরাণিক চরিত্রের বিস্ময়কর সমন্বয়, অসংখ্য হিন্দু উপদলের ধর্মীয় শিল্পকলায় নগ্নতা কিংবা প্রায় নগ্নতার উপাদান- এই সব কিছু মিলে ইসলামি পরিভাষায় আলেমদের সামনে আসা যেকোনো ধর্মের চেয়ে হিন্দুধর্ম হয়তো ছিল সবচেয়ে বিহ্বলতা সৃষ্টিকারী। কিন্তু তার পরও বাস্তবতার প্রয়োজনে অল্প সময়ের মধ্যেই সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হলো, হিন্দু ও মুসলিম সমাজের মধ্যে অস্বস্তিদায়ক সহাবস্থান প্রতিষ্ঠিত হলো।

ভারতে ইসলামের পুরো খতিয়ান নিয়ে ব্যাখ্যার নানা ঘরানার দেখতে পাওয়া বিস্ময়কর নয়। সব জাতীয়তাবাদই ইতিহাসকে পাঠ করে পেছন দিক থেকে কার্যকর হিসেবে। অর্থাৎ তাদের ইতিহাস পেছন দিকে চলে এবং অতীত খুঁড়তে থাকে আজ ও আগামীকালের জন্য তাদের জাতীয়তাবাদী ও ভূখণ্ডগত দাবির পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করতে। হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের জন্য হিন্দুধর্ম ভারতীয় মাটিতে যেকোনো কিছুর পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা গভীরে প্রোথিত; এই মাটিতে প্রবেশকারী অন্য সব ধর্ম হয় এর বুকে গিয়ে মিশেছে কিংবা বিদেশী অনুপ্রবেশকারী হিসেবে অবাঞ্ছিত হয়েছে। এ কারণেই এই বিদেশী অনুপ্রবেশকারী ভাষ্যেই ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মকে বিবেচনা করা হয়, বিষয়টি ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তির চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক। ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম উভয়েই তাদের নিজেদের অনুকূলে হিন্দুধর্মকে পিছু হটাতে চায়। বস্তুত ভারতের সবচেয়ে পরিচিত আন্তর্জাতিক প্রতীক মৌলিকভাবে মুসলিম স্থাপত্য তাজমহল হওয়া হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের কাছে গভীর যন্ত্রণার বিষয়। কিন্তু তার পরও সম্মিলিত মোগল সভ্যতা না থাকলে সংস্কৃতিগতভাবে ভারত অনেক কম সমৃদ্ধ বিবেচিত হবে।

তুলনামূলক উদার মানসিকতাসম্পন্ন ভাষ্যে একই ইতিহাসকে হিন্দু-মুসলিম সভ্যতার সমৃদ্ধ ফল হিসেবে গর্ব করা হয়। প্রতিটি সংস্কৃতি নানাভাবে অন্য সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করায় উভয়ের সৃষ্টিশীল আত্মস্থকরণ ক্ষমতা এবং নমনীয়তা প্রকাশ করে। বর্তমানে ভারতীয় মুসলিমরা যে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে পশ্চাৎপদ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে, এক সময় তারা সেটা শাসন করেছিল, সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। তারা

এসেছিল বাইরে থেকে, ছিল শীর্ষে, পড়েছে তলানিতে এবং এখন আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রের নতুন পরিবেশে সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের স্থান নিয়ে চিন্তা করছে। হয়তো এই বৈচিত্র্যময় ঐতিহাসিক উত্থান-পতন, যা অন্য যেকোনো বহুসংস্কৃতি সমাজের চেয়ে ভারতীয় মুসলিমদের ইসলামের সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও জটিল ভিশন দিয়েছে।

ভারত বিশেষ পন্থায় মুসলমানদের স্পর্শ করেছে। প্রথমত, ভারত হলো দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক এলাকার অন্যতম, যেখানে ইসলাম প্রাথমিকভাবে তরবারির মাধ্যমে আসেনি। ইসলামের অনেক আগে থেকেই আরব সমুদ্রচারী বণিকদের সাথে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতীয় উপকূলের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। হিন্দু রেকর্ড অনুযায়ী, ভারতীয় উপমহাদেশে সত্যিকারের প্রথম মুসলিম বসতি হয়েছিল সপ্তম শতকের প্রথম দিকে। তখন মাত্র একটি আরব বণিক বসতি ছিল। বলা হয়ে থাকে, প্রথম মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৬১২ সালে হজরত মুহাম্মদ সা:-এর জীবদ্দশায় বর্তমানের কেরালা রাজ্যের কদুনগালুরে।

ইতিহাসবিদেরা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ইসলামের প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আঁকেন। দক্ষিণে ইসলাম এসেছিল বাণিজ্য ও মিশনারি কার্যক্রমের মাধ্যমে, উত্তরে আরো কয়েক শ' বছর পর মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর ভারত আক্রমণকারীদের অন্যতম হিসেবে ইসলাম প্রবেশ করেছিল। এর ফলে দক্ষিণের চেয়ে উত্তর ভারতে মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে উত্তেজনা অনেক বেশি। দক্ষিণ ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ধীরে ধীরে স্থানীয় সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিপরীতে উত্তর ভারতে মুসলমানেরা সেখানে পারসিক, আরব, তুর্কি ও মঙ্গোল রক্তের সৈনিকদের নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছিল।

দামাস্কাসের উমাইয়া রাজবংশের আমলে মুসলিম আরব সেনাবাহিনী প্রথম উত্তর ভারতে প্রবেশ করে। তারা সর্বপশ্চিম প্রদেশ সিন্ধু জয় করেছিল। দশম শতকে আফগানিস্তান থেকে আরো কয়েকটি মুসলিম সামরিক আক্রমণ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মহান তুর্কো-মঙ্গোল কমান্ডার বাবর (মধ্য এশিয়া থেকে আগত) ১৫২৬ সালে দিল্লির পতন ঘটিয়ে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বোচ্চ অবস্থায় মোগলরা প্রায় পুরো ভারত নিয়ন্ত্রণ করেছিল। মোগলরা নিজেরা তুর্কো-মঙ্গোল ও পারস্য সাংস্কৃতিক সম্মিলনের প্রতিনিধিত্ব করত এবং উভয় ভাষাই ভারতে নিয়ে এসেছিল, যা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাষায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ব্র"কলিন ইনস্টিটিউট স্কলার স্টিফেন পি. কোহেন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

এসব বিজয়ীর [গ্রিক, হুন, শক ও মুসলিম] প্রত্যেকেই উপমহাদেশকে তাদের বাইরের শক্তি ঘাঁটির সম্প্রসারিত অংশ বিবেচনা করলেও পরে তারা ভারতকেন্দ্রিক চোখ দিয়ে বিশ্বকে দেখেছিল। ভারতীয় সমাজের হজম ক্ষমতা সব সময়ই দারুণ।... [ইসলাম] সামরিক প্রযুক্তি, ধর্মতত্ত্ব ও রাজনৈতিক ধারণা নিয়ে এলেও প্রাক-ইসলামি পারস্য সংস্কৃতির মতো করে ভারতীয় সভ্যতাকে ধ্বংস করেনি। পরিণতিতে

মোগলদের অধীনে ভারত আবার একটি সাম্রাজ্যিক-ব্যবস্থায় ঐক্যবদ্ধ হয়। এই নতুন ব্যবস্থায় এমনকি ইসলামও এই হিন্দু সংস্কৃতিতে প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, ঠিক যেভাবে হিন্দুধর্মকে হতবিহ্বল ও রূপান্তরিত করেছিল ইসলাম।

মিশ্র সমন্বয়ধর্মী বৈশিষ্ট্যের সুফি ইসলাম অনেক হিন্দুর কাছে আবেদন রাখে এবং ইসলামের প্রাথমিক প্রভাব নমনীয় করতে সহায়তা করে। তবে হিন্দু ও হিন্দুধর্মের সাথে কেমন আচরণ করা হবে তা নিয়ে মুসলিম আলেমসমাজ কখনোই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। বিশিষ্ট মুসলিম বিজ্ঞানী ও মহাজ্ঞানী আল-বেরুনি ১১০০ শতকের মধ্যভাগে কিছু সময় ভারতে কাটিয়ে এখানকার সমাজকে লক্ষ করেছিলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, অনেক দেবতা থাকা সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম আসলে একেশ্বরবাদী বিশ্বাস :

ঈশ্বর প্রশ্নে হিন্দুদের বিশ্বাস হলো তিনি এক, শাশ্বত, যার শুরু ও শেষ নেই, স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করেন, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, জীবন্ত, জীবনদান করেন, ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, সংরক্ষণ করেন, সার্বভৌমত্বে তিনি অনন্য, সব ধরনের পছন্দ ও অপছন্দের ঊর্ধ্বে এবং কোনো কিছুই তার মতো নয় এবং তিনিও কোনো কিছুর মতো নন।

কিন্তু হিন্দুধর্মের বহু ‘দেবদেবতার’ পূজা কী? আল-বেরুনি মনে করতেন, তাদের উপাসনা সত্যিকার অর্থে এসব মূর্তিতে অনুরক্ত থাকা নিম্নতর শ্রেণীর ধর্মতত্ত্বগত অজ্ঞতা প্রতিফলিত করে, কিন্তু আসলে হিন্দুধর্ম যে উচ্চতর দর্শনগত ধারণা লালন করে তা অনিবার্যভাবে ইসলামের মতোই একেশ্বরবাদী। এই ব্যাখ্যার সাথে কেউ একমত হোক বা না-হোক, (এবং বেশির ভাগ আলেম অবশ্যই হয়নি) এমন সিদ্ধান্ত এক মুসলিম স্কলারের কাছ থেকে আসাটা সত্যিই বিস্ময়কর।

ভারতের বেশির ভাগ আলেমের কাছে হিন্দুদের ‘আহলে কিতাবে’ অন্তর্ভুক্ত করাটা অসম্ভব ধর্মতাত্ত্বিক প্রয়াস বিবেচিত হয়েছে; আর তাদেরকে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা না গেলে ইসলামে বাধ্যতামূলক ধর্মান্তরকরণই যথার্থ। কিছু আলেম ছিলেন ধর্মান্ধ, তারা জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তর করতেন, এমন যুক্তিও দেখাতেন, মতদ্বৈধতা দেখা গেলে মৃত্যুই যথাযথ। ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মন্দির ধ্বংস এবং অনেকগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করার অনেক বর্ণনা দেখা যায়। বস্তুত, প্রায়ই দেখা গেছে, সহিংসতা প্রয়োগের চেয়ে মোগল সম্রাটরা মাথাপিছু কর বাড়িয়ে দিয়েছেন, যাতে করের বোঝা থেকে মুক্তি পেতে গরিব হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়। এর চেয়েও বড় একটি বিষয় হলো, নিম্নবর্ণের অনেক হিন্দু তাদের ধর্মের বর্ণবাদী-ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ইসলামে ধর্মান্তরিত কিংবা ক্ষমতাসীন সাংস্কৃতিক-ব্যবস্থার অংশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোগলরা দেশটির বেশির ভাগ লোককে ধর্মান্তরিত করতে পারেনি। তারা বুঝেছিল, কাজটি তারা করতেও পারবে না। এ কারণে পরিস্থিতি একটা শীতল সহাবস্থানে নিষ্পত্তি ঘটেছিল, অন্তত আলেমদের দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবেই হিন্দুরা ন্যূনতম

‘আহলে কিতাবি’ লোকে পরিণত হয়েছিল, এমনকি যদি তা মৌলিক ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রহণযোগ্য ও অসামঞ্জস্যপূর্ণও হয়ে থাকে।

অন্য দিকে মুষ্টিমেয় মুসলিম কোনো হিন্দু মন্দিরে গেলেও বেশির ভাগ হিন্দুই হিন্দু সমন্বয়বাদ বা সর্বেশ্বরবাদ অভিব্যক্তির অংশ হিসেবে মুসলিম দরগায় যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ইসলাম স্রেফ দেবমণ্ডলে যোগ দিয়েছে। হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে হিন্দুদের মধ্যে কোনো আগ্রহ দেখা যায় না, তাদের ধর্ম আসলে একটি বদ্ধ-ব্যবস্থা, এখানে ধর্মান্তরের সুযোগ আসলে নেই। জন্মগ্রহণের মাধ্যমেই এই ব্যবস্থায় শামিল হওয়া যায়। কেউ হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত হতে চাইলে কার্যত তাকে কোনো নির্দিষ্ট বর্ণ বা সমাজে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে, কিন্তু সম্প্রদায় বা রক্তের বন্ধন না থাকলে বহিরাগত ব্যক্তি আইনগতভাবে কোন বর্ণে অন্তর্ভুক্ত হবে? জন্ম থেকে সংশ্লিষ্ট কোনো নির্দিষ্ট বর্ণে না থাকলে তাকে তাত্ত্বিক হিন্দু সামাজিক সীমান্তে ভেসে বেড়াতে হবে। আর আরেকটি অপ্রত্যাশিত সম্মিলন সংঘটিত হলো। আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে ইসলাম নিশ্চিতভাবেই অন্য ধর্মীয় ঐতিহ্য নিজের মধ্যে আত্তীকরণ হওয়া অনুমোদন করে না। কিন্তু ভারতে হিন্দুধর্মের সাথে ইসলামের একটি অবাক করা সম্মিলন অভিজ্ঞতা দেখা গেছে। সেটা বাবরের নাতি মোগল সম্রাট আকবরের (১৫৪২-১৬০৫) উদ্ভাবন। ৪০০ বছর স্থায়ী মোগল শাসনে সব শাসকের চেয়ে আকবরের আবির্ভাব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

আকবর ভারতে ইসলাম (সুন্নি, শিয়া ও ইসমাইলিয়া) এবং হিন্দুবিশ্বাসের অসংখ্য উপদল, জৈন, জরথুস্ত্রীয়, খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদি ধর্মসহ প্রতিযোগী বিশ্বাসগুলোর মধ্যকার তালগোল পাকানো পরিস্থিতির ব্যাপারে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মের ব্যাপারে সহিষ্ণু ও অনুসন্ধিৎসু, ধর্মীয় আলোচনায় সমৃদ্ধ হতেন, ধর্মতাত্ত্বিক ও নৈতিক ইস্যু নিয়ে বিতর্কের জন্য বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের একত্র করতেন। বলা হয়ে থাকে, এসব বিতর্ক থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, কোনো ধর্মেরই সামগ্রিক সত্যের ওপর একচেটিয়া অধিকার নেই। এ থেকে তিনি তার নিজস্ব নতুন একটি ধর্ম সৃষ্টির বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেন। দীন-ই-ইলাহি (ঐশ্বরিক বিশ্বাস) নামের ধর্মটিতে ইসলামি, হিন্দু এবং অন্যান্য বৈদিক বিশ্বাসের পাশাপাশি খ্রিষ্টধর্ম ও জৈন ধর্মের বিশ্বাসেরও সম্মিলন ঘটানো হয়েছিল। তিনি আশা করেছিলেন, তার ধর্মের প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, আর ধর্মীয় কোনো পার্থক্য নিয়ে বিরোধ থাকবে না, একধরনের আন্তর্জাতিক ধর্মের বিকাশ ঘটবে।

মুসলিমরা অবশ্যই ইসলামি ধর্মতত্ত্বে ইহুদি ও খ্রিষ্টান পূর্বসূরিদের সাথে আগে থেকেই পরিচিত ছিল। দীন-ই-ইলাহিতে ধর্মীয় বৈচিত্র্যের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনে গুরুত্ব দিয়ে মরমিবাদ, দর্শন, নৈতিকতা এবং প্রকৃতি পূজার উপাদানও গ্রহণ করা হয়েছিল। এতে কোনো দেবতা, নবী, ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মবেত্তা পরম্পরার স্বীকৃতি ছিল না। তবে এসব ‘পৌত্তলিক’ ধারণার মিশ্রণ বেশির ভাগ আলেমের কাছে বেশ আক্রমণাত্মক মনে হয়েছিল। তারা পুরো প্রকল্পটি ব্লাসফেমিমূলক মনে করেছেন। অবশ্য সম্রাটের ঘোষণা হওয়ায় তারা বেশ সতর্ক ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত নতুন ধর্মটি প্রাসাদ-প্রাচীরের বাইরে স্থান করে নিতে পারেনি;

এটা খুব বেশি গোলমেলে ছিল, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ভিত্তির অভাবও ছিল। তা ছাড়া বিশ্ব সম্পর্কে এই ধর্মের চিন্তাভাবনা ছিল তখনকার সময়ের হিসাবে অনেক আগাম। হিন্দুরা আকবরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করলেও মুসলিম আলেমদের মধ্যে তার গুণগ্রাহী খুবই কম।

ধর্মীয় সম্মিলন দৃশ্যত দুর্বোধ্য মনে হলেও মোগলদের দুর্দান্ত স্থাপত্য শিল্প কিন্তু তেমন নয়। বলিষ্ঠ পারস্য ফ্লেভারে হিন্দু ও ইসলামি স্টাইলের সমন্বয়ে গড়া এসব স্থাপত্য সম্ভবত মোগল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বিখ্যাত ও স্থায়ী অবদান। মোগলদের বিশাল সরকারি ভবনরাজি বর্তমান সময়েও শিল্পকলার গৌরবোজ্জ্বল কর্ম হিসেবে বিবেচিত। তাজমহল শ্রেষ্ঠতম পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। তবে সাধারণত লাল বেলেপাথরে তৈরি তাদের আরো অসংখ্য প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ ও মাদরাসাতেও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে। মোগল স্টাইল বিশ্বজুড়ে মুসলিম স্থাপত্যকলার প্রভাব বাড়িয়ে দিয়েছে, এমনকি ভারতে শক্তিশালী ব্রিটিশরাজের আমলে করা ব্রিটানিয়া প্রতীকের সরকারি ও বেসরকারি ভবনরাজিকেও ছাপিয়ে গেছে।

মোগল রাজবংশ শ্রেষ্ঠ কবিতাও সৃজন করেছিল, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভিত্তিও প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিশ্বে সবচেয়ে বিখ্যাত ভারতীয় রান্না হলো উত্তর ভারতীয়, সেটা ভারতীয় রন্ধনপ্রণালীর সাথে পারসিক রন্ধনপ্রণালীর সম্মিলন, যা মোগলাই খাবার হিসেবে পরিচিত। দুই সহোদরা ভাষা হিন্দি ও উর্দু উভয়ই পারস্য, আরব ও তুর্কি শব্দতালিকা ভারতীয় ব্যাকরণ ভিত্তির ওপর রোপণ করা হয়েছে। তারা এখনো উত্তর ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান ভাষা হিসেবে বিরাজ করছে। সংক্ষেপে বলা যায়, আধুনিক ভারতীয় সভ্যতা মোগল উপাদান ছাড়া ধারণাতীতভাবে প্রায় অপরিচিতই থেকে যাবে। অবশ্য এই তথ্যটি কিছু হিন্দু জাতীয়তাবাদীর কাছে তেমন স্বস্তিদায়ক নয়।

পাল্টা প্রভাব বিস্তার হিসেবে ইসলামের ওপর হিন্দুধর্মের অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল অনেক কম সুখকর : সেটা হলো ভারতীয় মুসলমানদের ওপর হিন্দু বর্ণব্যবস্থার প্রভাব। হিন্দু বর্ণবাদী ব্যবস্থায় বর্ণপরম্পরার মধ্যেই কাউকে নির্দিষ্ট স্থানে জন্মগ্রহণ করতে হয় সারা জীবনের জন্য। শাস্ত্রীয় ও সামাজিক পরিভাষায় এসব বর্ণগত অবস্থান মৌলিকভাবে অপরিবর্তনীয়। কোনো ব্রাহ্মণ (উচ্চবর্ণ) কোনো অচ্ছুতের (দলিত) সাথে দৈহিক সংস্পর্শে আসতে পারবে না। আর কোনোভাবে এলে, তাকে শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুদ্ধ হতে হবে। বর্ণপরম্পরায় তার কোন পর্যন্ত পেশা গ্রহণ অনুমোদনযোগ্য এবং তার সামাজিক ব্যাপ্তি কতটুকু হবে, সেই স্থান নির্ধারণ করে দেবে। ভারতীয় মুসলিমরা দীর্ঘ সময় এই বর্ণব্যবস্থার সামনে অরক্ষিত থাকায় শেষ পর্যন্ত এর কিছু উপাদান আত্মস্থ করে নেয়। এতে করে মুসলিম সমাজ অনানুষ্ঠানিকভাবে আশরাফ (উচ্চ বংশ) ও আতরাফে (নিচু বংশ) বিভক্ত হয়ে পড়ে। উত্তর দিক থেকে প্রথম মুসলিম অভিযানের সময় ভারতে মুসলিমরা মূলত খুবই ছোট্ট অংশ ছিল। সময়ের পরিক্রমায় হিন্দু ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা হয়ে পড়ে বিশাল। অনেক সময় স্থানীয়রা তাদের নিম্নবর্ণ চিহ্ন নিয়েই সমাজে স্থান পেত। বিভাগের সময় ভারতে মুসলিমদের সংখ্যা পৌঁছেছিল প্রায় ১৪ শতাংশে।

ইসলামে যেকোনো ধর্মতাত্ত্বিক পরিমাপে মুসলমানদের মধ্যে বর্ণব্যবস্থা অগ্রহণযোগ্য; পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, আল্লাহর দৃষ্টিতে অন্যদের চেয়ে তিনিই উত্তম, যিনি বেশি ধার্মিক (আল্লাহভীরু)। কিন্তু ভারতে আমরা দেখতে পাই, ধর্মীয় জীবনযাত্রার পাশাপাশি সঙ্কর-সংস্কৃতির প্রভাবও বেশ শক্তিশালী।

এসব থেকে কয়েকটি অবাক করা সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। প্রথমত, বণিক ও মিশনারির মাধ্যমে প্রথম যখন ইসলাম (যেমন- দক্ষিণ দিক দিয়ে) ভারতে প্রবেশ করে, তখন কোনো সংঘর্ষ ছিল না। দক্ষিণ ভারতের মুসলিমরা তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের মতোই জাতিগতভাবে একই রকম। কিন্তু উত্তরে, ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে জাতিগত পার্থক্য বিরাজমান ছিল : মূলত মধ্য এশিয়া থেকে আগত তুর্কি-পারসি মুসলিমরা যাদের ক্ষমতাচ্যুত করেছিল, তাদের অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে সাধারণত শনাক্তযোগ্য বিদেশী বিজয়ীর প্রতিনিধিত্ব করেছিল। দ্বিতীয় বিস্ময় হলো, দৈনন্দিন মানবীয় মেলামেশার পরিস্থিতিতে 'পারস্পরিক সাংঘর্ষিক' ধর্মতত্ত্ব কিভাবে সময়ের পরিক্রমায় সহাবস্থান করতে পারে এবং এমনকি একে অপরকে প্রভাবিতও করতে পারে তার নজির, যদিও আন্তঃধর্মীয় সহিংসতা নিশ্চিতভাবেই ঘটত। তৃতীয়ত, সাংস্কৃতিক যে সম্মিলন ঘটে, তা ইরানে পারসি সংস্কৃতির সাথে ইসলাম এবং উসমানিয়া সাম্রাজ্যে বায়জান্টাইন সংস্কৃতির সাথে তুর্কো-ইসলামের সম্মিলনের মতোই অনন্যসাধারণ।

তাহলে নানা জাতির এই মহামিলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভাববিশিষ্ট এই নজিরবিহীন গতিশীলতা 'রক্তাক্ত সীমান্তের' ধারণাটি অতি সামান্যই ধারণ করে। জরথুস্ত্রীয় পারসিকরা কি ভারত জয় থেকে বিরত থাকত? তাদের ভারত জয় কোন দিক থেকে ভিন্ন হতো? মধ্য এশিয়ার অমুসলিম তুর্কিরা কি অন্যান্য গ্রুপের উত্তর দিক থেকে ভারত আক্রমণে যোগ দেয়া থেকে পিছিয়ে থাকত? ইসলাম কেন্দ্রীয় কোনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় না।

ভারত ভাগ : বর্তমানে মুসলমানরা কোথায়?

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দখলদারিত্বের মুখে মোগল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে পতন ঘটতে থাকায় মোগল-ব্যবস্থা তার ক্ষমতা হারাতে শুরু করে, এর সাথে মুসলমানদের মর্যাদা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ব্রিটিশরা তাদের শাসনের ব্যাপারে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের কাছ থেকেই বেশি প্রতিরোধের মুখে পড়ায় প্রশাসনে হিন্দুদের অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে, তাদেরকে তারা অনেক বেশি 'বিশ্বস্ত' বা 'বশংবদ' মনে করতে থাকে।

ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে মুসলিমরা সত্যিই অনেকবার সক্রিয় হয়েছিল। বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের ভারতের মহাবিদ্রোহে তাদের ভূমিকা ছিল মুখ্য। গাদা বন্দুকে বুলেট কার্তিজ তৈরিতে শূকরের চর্বি ব্যবহারের গুজব নিয়ে মুসলিম সিপাইদের দাঙ্গা সৃষ্টির মাধ্যমে এর সূচনা হয়েছিল। তবে শেষ দিকে হিন্দুরাও একই ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষ ব্যাপকভাবে বিরাজ করায় একটা সামান্য স্ফুলিঙ্গই জাতীয় বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিল। ব্রিটিশ শক্তি ও শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম ও হিন্দুরা সাধারণভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল, যদিও সমস্যার কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকত।

সাম্রাজ্যিক মোগল শক্তি ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকায় বা ব্রিটিশদের করায়ত্ত হতে থাকায় মুসলমানরা শিগগিরই নিজেদের ভারতীয় ব্যবস্থায় নিজেদের ক্ষমতাহীন সংখ্যালঘু এবং ব্রিটিশদের চোখে আংশিক সন্দেহভাজন পরিস্থিতিতে দেখতে পেল। অনেক ব্রিটিশ এমন ধারণাও পোষণ করত, মুসলমান মাত্রই 'বিদেশী শাসনের প্রতি সহজাতভাবে বিদ্রোহপ্রবণ।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের মুক্তির দিন ঘনিয়ে আসতে থাকায় আসন্ন মুসলমানেরা মূলত স্বাধীন ভারতে নিজেদের সংখ্যালঘু অধিকারের সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। তাদের ভয় ছিল, সহজসরল গণতান্ত্রিক-ব্যবস্থায় তারা ভোটে স্থায়ীভাবে পরাজিত সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। এ কারণে মুসলিমরা একধরনের কনফাডেরাল-ব্যবস্থাকে অনুকূল মনে করতে থাকে, যা তাদের সব সময় স্থায়ী সংখ্যালঘু (সব গণতান্ত্রিক-ব্যবস্থাতেই এটা একটা চিরায়ত উভয় সঙ্কট। এতে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের ক্ষমতার পরিবর্তন করার

সুযোগ পাওয়া বিরল ব্যাপার) করবে না। আবার ভারতের মধ্যে মুসলিমরা একই ধরনের ছিল না। তাদের মধ্যে শ্রেণী, অঞ্চল এমনকি ভাষাভিত্তিক পার্থক্য ছিল।

সবশেষে ভারতকে সত্যিই ভাগ করে ভারতীয় ও পাকিস্তানি রাষ্ট্রে পরিণত করাটা মুসলমানদের কাছে অগ্রাধিকারমূলক লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে এবং ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় মুসলমানদের সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি নিয়ে হিন্দুদের উদ্বেগের ফলে হঠাৎ করেই সবার কাছে বিভক্তিকেই সম্ভাব্য বিকল্প মনে হতে থাকে।

মজার ব্যাপার হলো, ভারতের অনেক মুসলিম আলেম কিন্তু দেশ ভাগের পক্ষে ছিলেন না এমনকি তারা নতুন স্বাধীন মুসলিম পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনকেও সমর্থন করেননি। তারা যথাযথভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন, সব মুসলমান পাকিস্তানে যেতে পারবে না এবং যারা পড়ে থাকবে, তারা আরো প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের হাতে আরো ছোট সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। বিভক্তি নামের ১৯৪৭ সালের জাতি নির্মূলের ব্রিটিশ-পরিচালিত এই মহা প্রক্রিয়ায় ভারতে ঢুকতে বা ভারত থেকে বের হওয়ার চেষ্টায় দেড় কোটি লোক নতুন সৃষ্ট সীমান্ত অতিক্রম করেছিল। জনসংখ্যা হস্তান্তরকালে ব্যাপক ও নৃশংস সহিংসতা ঘটে, তিন ধর্মের সব গ্রুপই (শিখ, মুসলিম ও হিন্দু) একে অপরের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর গণহত্যার মুখে পড়ে। ফল হলো এই যে, নতুন অভিবাসীরা (পাকিস্তানে যাওয়া মুসলিমরা, ভারতে যাওয়া শিখ ও হিন্দুরা) এই প্রতিক্রিয়ায় প্রায়ই দেহ-মনে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিটি নতুন সমাজে ধর্মীয়ভাবে সবচেয়ে অসহিষ্ণুদের সংখ্যা বাড়াতে অগ্রসর হলো। রাজনীতি উভয় দেশে ধর্মীয় টাইমবোমা সৃষ্টি করল। বস্তুত যেসব মুসলমান পাকিস্তানে না গিয়ে ভারতে থেকে গিয়েছিল, তাদের জন্য পরিস্থিতি সত্যিই আরো কঠিন হয়ে পড়ল : তারা কেবল সংখ্যাতেই কমে যায়নি, তাদের রাজনৈতিক মূল্যও পড়ে যায়। নতুন হিন্দু-প্রাধান্যপূর্ণ রাষ্ট্রে তাদের চূড়ান্ত আনুগত্য এখন সন্দেহের মধ্যে পড়ল। পরে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার তিনটি যুদ্ধের সময় ভারতীয় মুসলমানরা হিন্দুদের দৃষ্টিতে প্রায়ই অবিশ্বস্ত, সম্ভাব্য পঞ্চম বাহিনী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

কাশ্মির পরিস্থিতিও একই রকম উত্তপ্ত। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ (১৯৪৭ সালে প্রায় ৭৭ ভাগ ছিল মুসলিম) কাশ্মিরের নিজস্ব স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা তাদের ভারত বা পাকিস্তানে যোগদান নিয়ে গণভোট আয়োজনের অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু তাতে নিশ্চিত পরাজয় হবে জেনে ভারত নিরপেক্ষ গণভোট আয়োজন থেকে দূরে সরে আসে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম কাশ্মিরি ক্রুদ্ধ রয়ে গেছে, এখনো তারা তাদের পছন্দ করার অধিকার নিয়ে উত্তেজিত; ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কঠোর হাতে শাসন চালাচ্ছে, কাশ্মিরকে পরিচালনা করছে অবিজ্ঞচিতভাবে ও অস্পর্শকাতরহীনভাবে। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার তিনটি যুদ্ধের, আংশিকভাবে কাশ্মির নিয়ে এবং সবগুলোতেই পাকিস্তান হেরে গেছে, ফলে এলাকাটি সহিংস কাশ্মিরি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে গোপন সমর্থনের মাধ্যমে ভারতকে চাপে রাখতে পাকিস্তানের জন্য উর্বর ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এই দীর্ঘ

দিনের যুদ্ধ বর্তমানে পাকিস্তান-ভারত সম্পর্ক বিষাক্ত করছে, আঞ্চলিক সন্ত্রাসবাদের অন্যতম উৎস হয়ে রয়েছে।

বর্তমানে ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৩ শতাংশ মুসলিম। মুসলিম সম্প্রদায় মারাত্মকভাবে বিভক্ত : এক দিকে অধিকতর ধর্মীয় উপাদানগুলো আলাদা স্বনিয়ন্ত্রিত মুসলিম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার দাবি জানাচ্ছে, যেখানে তারা হিন্দুদের থেকে আলাদা বসবাস করতে পারবে- ভারতজুড়ে মুসলমানেরা যে কত বিচ্ছিন্ন এই উদ্ভট কল্পনায় তা অনুমান করা যায়। যেকোনো মূল্যে সম্প্রদায়গত পরিচিতি বিকাশের একই নীতি মুসলিমদের নিঃসঙ্গতা বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্য দিকে মুসলিমদের একটি আরো ছোট গ্র“প সম্প্রদায়গত অবস্থানের ঊর্ধেŸ উঠে সেকুলার ভারতীয় রাষ্ট্রে শামিল হতে চায়। সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আশ্রয় খোঁজা নিরাপত্তাহীনতা ও ভীতির কাজ; সেকুলার আত্তীভূত হতে চাওয়া আত্মবিশ্বাস ও আশাবাদের ইঙ্গিত। উভয় পক্ষই তাদের অবস্থানের পক্ষ যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবে।

তবে পছন্দ করার ব্যাপারটা কেবল মুসলমানদের ওপরই বর্তে না : ভয়ঙ্কর হিন্দু জাতিগত বা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আবির্ভূত হয়ে অহিন্দুদের বিশেষ করে মুসলিমদের টার্গেট করেছে, তাদের ধারণায় এরা হিন্দুধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসহিষ্ণু ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) অতীতে ভারতীয় জাতীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে, আবারো তা করতে পারে, অনেক রাজ্য সরকার পরিচালনা করছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সহিংসতা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি। এটা তাদের একত্রে একটি উত্তপ্ত ও বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়গত অবস্থানের দিকে চালিত করছে।

হিন্দু জাতীয়তাবাদ (হিন্দুসভা) কেবল ধর্মভিত্তিকই হতে পারে, কারণ সহজাত কোনো 'হিন্দু' জাতীয়তা নেই; মুসলমানদের মতোই হিন্দুদেরও বিপুল বৈচিত্র্যময় জাতিগত প্রেক্ষাপট ও ভাষা রয়েছে। অধিকতর সেকুলার হিন্দু নেতৃত্বের বিপরীতে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি বাধা দূর করার লক্ষ্যে বিশেষ করে মুসলিমদের বহিষ্কারের লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের বিভক্তিকে প্রবলভাবে সমর্থন করেছে। মুসলিম, শিখ ও খ্রিষ্টান এবং তাদের উপস্থিতির বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভের আংশিক কারণ হলো তাদের কারণেই সেকুলার ও বহুসংস্কৃতির ভারতীয় রাষ্ট্র রক্ষা করতে হচ্ছে, অথচ হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা সেটা বিলোপ করতে চায়। আর নির্মম সত্য হলো, এই মুসলিম জনসংখ্যাই অন্য যেকোনো মুসলিম দেশের চেয়ে বর্তমানে সর্বাত্মকভাবে সেকুলার রাষ্ট্রকে সমর্থন করে। তারা সরকারি হিন্দুধর্মের বিপরীতে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, সমাজ ও ধর্ম সুরক্ষিত করার জন্য সেকুলার রাষ্ট্রের উপকারিতা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পেরেছে। ভারতীয় মুসলমানেরা সাধারণভাবে মনে করে, পাকিস্তান দীর্ঘ সময় সামন্ততান্ত্রিক বদ্ধ পরিবেশে থাকায় এবং লাহোর নগরী ছাড়া মোগল ভারতের সাংস্কৃতিক গৌরবগুলোর সবই বিভক্তির পর ভারতে পড়ায় তাদের সংস্কৃতি পাকিস্তানের চেয়েও অনেক বেশি সমৃদ্ধ।

এমন পরিবেশে সাম্প্রদায়িক হানাহানি কম থাকে না। উত্তর ভারতীয় নগরী অযোধ্যা উভয় পক্ষের জন্যই আবেগমিশ্রিত ভীতিকর স্থানে পরিণত হয়েছে। এটা ভারতে ছয়টি সবচেয়ে পবিত্র হিন্দু তীর্থস্থানের একটি, সুন্দর ও মুগ্ধতা সৃষ্টিকারী মন্দিরের জন্য এটি পরিচিত। ৯০০ বছর আগে আফগানিস্তান থেকে আসা মুসলিম বাহিনীর হাতে নগরীটি আক্রান্ত ও লুট হয়। পরে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন বলে বলা হয়ে থাকে। হিন্দুরা অনেক পরে দাবি করে, রামমন্দিরের ওপর সেটা বানানো হয়েছিল, যদিও ওই দাবির পক্ষে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই। মোগল ও মুসলিম ভারতের ধারণাটির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে ১৯৯২ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি এই স্থানটিকে বেছে নেয়। দীর্ঘ প্রচারণার পর প্রায় দেড় লাখ হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তাদের গাঁইতি হাতে বাবরি মসজিদ আক্রমণ করতে লাগানো হয়, পরিকল্পিতভাবে একে টুকরা টুকরা করে ফেলা হয়। উভয় পক্ষের জন্যই প্রতীকীবাদ ছিল তীব্র, পরিণতিতে সারা ভারতে প্রতিশোধের বৃত্ত সৃষ্টি হয়। অযোধ্যায় এর প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ২০০৫ সালে। তখন পাঁচ সশস্ত্র মুসলিম বন্দুকধারী ওই স্থানে অস্থায়ীভাবে নির্মিত নতুন রামমন্দিরে বোমা হামলার চেষ্টা চালায়। তবে এই কাজের সময় তারা কেবল আত্মহত্যা করতে সক্ষম হয়।

মুম্বাই (বোম্বে) ভিত্তিক হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল শিবসেনার আবির্ভাবে মহারাষ্ট্র রাজ্যে আরো বেশি ধর্মীয় ও জাতিগত ভাবাবেগের মেরুকরণ ঘটে। মুম্বাইয়ে দক্ষিণ ভারতীয় অভিবাসীদের প্রতি প্রবল বৈরী এই আন্দোলনটির বিশেষ টার্গেট মুসলমানেরা, যারা মুম্বাইয়ের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫ ভাগ। আন্দোলনটি উগ্র জাতীয়তাবাদী মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে, বাগাড়ম্বরে এবং মুসলিম প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে ভীতিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে গুণ্ডা-বদমাশদের দলে নিতে পারদর্শী। আবার একই সাথে অনেকটা দক্ষতার সাথেই নগর সরকার পরিচালনাতেও সামর্থ্যের পরিচয় দেয়। মুম্বাইয়ে ১৯৯২ সালে মারাত্মক মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা ঘটে, এতে ৯০০ জন নিহত হয়, তাদের বেশির ভাগই মুসলিম। অনেককে পুড়িয়ে মারা হয়। সরকারি তদন্ত কমিশন দাঙ্গার জন্য শিবসেনাকে দায়ী করে। এসব দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় ১৯৯৩ সালের মার্চে মুম্বাইয়ে ১৩টি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হয়, ২৫০ জন নিহত হয়। মুম্বাইয়ের মাফিয়া চক্র এই বোমা হামলা করেছে বলে দেখা যায়। ইটের বদলে পাটকেল সহিংসতা অন্যান্য লোকালয়েও হরদম ঘটতে থাকে।

তারপর ২০০১ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশ্যে পাঁচ মুসলিম বন্দুকধারী নয়াদিল্লির পার্লামেন্ট ভবনে হামলা চালানোর ধৃষ্টতা দেখায়। সৌভাগ্যবশত মৃত্যু নিরাপত্তা রক্ষী এবং সব বন্দুকধারীর মধ্যে সীমিত থাকে। কিন্তু আক্রমণটি নিয়ে জাতীয় শোক ছিল বিপুল। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মতে, বন্দুকধারীরা লস্কর-ই-তৈয়বা ও জয়শ-ই-মুহাম্মাদ গ্র“পের সদস্য। পাকিস্তানভিত্তিক এ গ্র“প দু'টি কাশ্মিরে অভিযান চালানোর জন্য অনেক বছর ধরে পাকিস্তানি সমর্থন পেয়ে আসছে বলে ভারত অভিযোগ করে আসছে।

২০০২ সালে গুজরাটে মুসলিমবিরোধী উন্মত্ত দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। এ দাঙ্গাটি ছিল বিশেষভাবে নৃশংস। এতে দুই হাজার পর্যন্ত মুসলিম নিহত হয়। যুক্তরাজ্যের গার্ডিয়ান পত্রিকার মতে, স্থানীয় জরিপ অনুযায়ী ভারতীয় রাজ্য গুজরাটে সাম্প্রতিক মুসলিমবিরোধী দাঙ্গার সময় ২৩১টি অনন্য ইসলামি মনুমেন্ট, ৪০০ বছরের প্রাচীন সৌন্দর্যপূর্ণ একটি মসজিদসহ, ধ্বংস বা ভাঙচুর করা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্ষতি এত ভয়াবহ যে তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত আফগানিস্তানে বামিয়ান বৌদ্ধ বা রেড গার্ডদের তিব্বতের মঠগুলো বিধ্বস্ত করার সাথে তুলনীয়। এ ছাড়াও হিন্দু দুর্বৃত্তরা সুন্দর সুন্দর অনেক মসজিদের স্ক্রিন চুরমার করেছে, পারসিক হস্তলিপিতে ইট নিক্ষেপ করেছে, প্রাচীন পবিত্র কুরআনে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।... ‘এটা একটা পুরো সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা,’ বলেছেন তালিকাটি প্রণয়নকারী এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিরোধী সংস্থা সাপারার তিস্তা সিতলভাড়।

অর্থাৎ, ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে মুম্বাইয়ে মুসলিম জিহাদিদের ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হামলাকে একটি সিরিজের অংশ হিসেবে দেখা দরকার : এই একটি ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নির্বিচারে দুই হাজার লোক হত্যা করা হয়, পাবলিক প্লেøস ও বড় বড় হোটেলে অনেক হামলা হয়েছে। ঘটনাটি ভারতের মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে, যদিও এতে তাদের হাত থেকে থাকলেও মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ছিল। এসব ঘটনা মুসলিম সম্প্রদায়গত নিরাপত্তাহীনতা তীব্র করে মূল মুসলিম পরিচিতিতে আশ্রয় গ্রহণ এবং আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে, যা এখন বিশ্বজুড়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

ভারতের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা নিয়ে ১৯৯৫ সালে প্রস্তুত ইউএস লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের সমীক্ষায় ভারতের এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতার জন্য ‘প্রাচীন ঘৃণা’ বা ধর্মীয় মৌলবাদ তেমনভাবে দায়ী নয় বলে জানিয়ে বলেছে, আর্থসামাজিক সমস্যাবলি এবং ১৯৮০ সাল থেকে ভারতের রাজনীতিবিদদের দায়িত্বহীন কূটকৌশলের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়াকে অভিযুক্ত করেছে। সমীক্ষায় দ্রুত নগরায়নের অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী চরিত্র এবং জীবিকার জন্য বিভিন্ন গ্র“পের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতাকে চিহ্নিত করা হয়। লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের সমীক্ষায় ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতিতে পরিবর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করে বলা হয়, এর ফলে রাজনীতিবিদেরা নির্বাচনে স্বল্পমেয়াদি সাফল্যের জন্য বিপজ্জনকভাবে ধর্মীয় ভাবাবেগকে ব্যবহার করেন, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে উৎকট বর্ণভক্তির আবেদন জানান। কাশ্মিরে মুসলিম গেরিলা ও পাঞ্জাবে শিখদের সহিংসতাও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টিতে অবদান রাখে, যা ‘ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সরকারের কাছ থেকে বিশেষ ছাড় আদায়ের জন্য আগ্রাসী কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে।’ সমীক্ষার উপসংহারে বলা হয়, ‘জঙ্গি, দুর্বৃত্ত ও রাজনীতিবিদদের ভারতের ধর্মীয় উত্তেজনাকে নিজ নিজ স্বার্থে ব্যবহারে ভারতে ধর্মীয় ভাবাবেগ কতটুকু মাত্রায় স্বার্থসিদ্ধির বস্তুতে পরিণত হয়েছে।’

২০০৩ সালে ভারতের দাঙ্গা নিয়ে টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনে ভারতে হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে উত্তেজনাকর বিভক্তির কথা বলা হয়। কেবল সহিংসতা নিয়ে বলা হয় :

সহিংস আক্রমণের শিকার হওয়ার আশঙ্কা হিন্দুদের চেয়ে মুসলিমদের অনেক বেশি। স্বাধীনতার পর হওয়া সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পুলিশের সরকারি রেকর্ডে বলা হয়েছে, প্রাণহানি ও সম্পত্তি ধ্বংসের তিন-চতুর্থাংশই হয়েছে মুসলিমদের, (২০০২ সালের) গুজরাট দাঙ্গায় তা তুঙ্গে উঠে ৮৫ ভাগে দাঁড়ায়।

২০০৩ সাল থেকে হিন্দু দাঙ্গায় প্রায় ছয় হাজার লোক নিহত হলেও ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ বা খুনের কোনো অপরাধীরই বলতে গেলে সাজা হয়নি। বিজেপি আমলে জাতীয় বা স্থানীয় সরকারের হিন্দু মদদপুষ্ট সহিংসতায় মৌন সমর্থন খুব কমই গোপন রাখা হয়।

টাইম আরো লক্ষ করেছে, নগরীগুলোতে ৪০ শতাংশ মুসলিম আয় বেতন স্কেলের নিম্নতম প্রান্তে রয়েছে, হিন্দুদের মধ্যে এটা ২২ শতাংশ। মুসলিমরা জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ হলেও সরকারি চাকরিতে তারা আছে মাত্র ৩ শতাংশ, বেসরকারি খাতে হিন্দুরা আরো কম নিয়োগ করে। নগরীগুলোতে মুসলিমদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার ৩০ ভাগ, হিন্দুদের মধ্যে যা ১৯ ভাগ। ভারতের উদার একটি হিন্দু দলের নেতা কে সি ত্যাগী মন্তব্য করেছেন, 'ভারতে একটি সাধারণ প্রবণতা রয়েছে, তা হলো মুসলিমদের আমাদের না বলে তাদের হিসেবে চিহ্নিত করা। আর এই প্রবণতা ভয়ঙ্করভাবে প্রকাশিত করা হয়ে থাকে। এমনকি আজো আমরা যেটাকে ভারতীয় মূলধারা হিসেবে অভিহিত করি, তাতে মুসলমানেরা ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

ভারতে জাতীয়তাবাদের (গুলোর) আবির্ভাব আসলে অনেক শক্তির (উপনিবেশবাদী প্রতিক্রিয়া, 'দেশপ্রেম' এবং জাতীয়তাবাদ, জাতিগত অবস্থান, শ্রেণী ও ধর্মীয় পার্থক্য এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা) একই সাথে সক্রিয় রাখার একটি আধুনিক বাহন। ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের গোলযোগপূর্ণ ঘটনাবলি আসলে আধুনিক জাতীয়তাবাদের সক্রিয় শক্তিগুলোর (এমনকি গণতান্ত্রিক-ব্যবস্থার মধ্যেও) সম্ভাব্য কুৎসিত অবস্থাটি প্রদর্শন করছে।

তার পরও ভারতে ঐতিহাসিক মুসলিম অভিজ্ঞতা প্রবলভাবে ফলপ্রসূ সহাবস্থানের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যাতে মুসলিম ও হিন্দু উভয় শ্রেণীই একে অপরকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করছে। দুই সংস্কৃতি এখন যেমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, সেটাকে সভ্যতাগত 'সীমান্ত' বলা যায় না। আর সংস্কৃতি দু'টি যে আগামীতে ভারতীয় রাষ্ট্রে নতুন ধরনের সহাবস্থান সৃষ্টি করবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে সামান্যই। এই দিক থেকে বলা যায়, ইসলাম সত্যিই ভারতে ইতিহাসের ধারা বদলে দিয়েছে। তবে সেটা করেছে আত্তীকরণ, সম্পৃক্তকরণ ও সম্মিলনের মাধ্যমে। ভারতজুড়ে মুসলিমরা বৈচিত্র্যপূর্ণ, বেপরোয়া ও নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হলো, 'ইসলাম' যখন অনেক ব্যাপারে ক্ষোভ তুলে ধরছে, মূর্ত করছে, তখন হিন্দুরাও আরো অনেক বিষয়ে একই অবস্থায় রয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে ধর্মের কিছু করার নেই, তবে ক্ষমতা ও প্রভাবের জন্য নানা ধরনের সাম্প্রদায়িক সংগ্রামের সব কিছুই

করার আছে। এই প্রেক্ষাপটে কঠিন খেলার মাঠে প্রতিযোগী অনেক সাম্প্রদায়িক গ্রুপের মধ্যে মুসলমানেরা কেবল একটি গ্র"প মাত্র। নিজেই নিজের নড়বড়ে জাতীয় পরিচিতিতে আক্রান্ত, ভূ-রাজনীতির ভয়ে তাড়িত, কাশ্মির ও আফগানিস্তানে সম্পৃক্ত পাকিস্তানের ভূমিকা সমস্যাটিকে আরো তীব্র করেছে। আধুনিক সময়ে যদি সব পক্ষের সঙ্কীর্ণমনা শক্তিগুলোকে পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে গেঁথে থাকা এই সাংস্কৃতিক বন্ধনকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সেগুলোকে স্থায়ীভাবে টুকরা টুকরা করতে দেয়া হয়, তবে তা হবে একটা ট্র্যাজেডি।

এটা খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন : ব্রিটিশরাজ কিংবা সাম্রাজ্যিক উপনিবেশ হিসেবে কোনো ধরনের ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ যদি কখনো প্রতিষ্ঠিত না হতো, তবে কি ভারত শেষ পর্যন্ত বিভক্ত হতো? যদি ভারতে মোগল সাম্রাজ্য সময়ের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে রাজোচিত রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রে পরিণত হতো তবে কি হিন্দু ও মুসলিমরা শেষ পর্যন্ত তাদের প্রাসঙ্গিক স্বার্থের জন্যই কোনো না কোনো রকমের স্বাভাবিক সমাধানে পৌঁছে অভিন্ন লক্ষ্যে তথা ফেডারেল ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ভারতের ধারণাটি বহাল রাখত? এমনটা হওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল। অধিকন্তু হিন্দু ও মুসলিম খেলোয়াড়েরা নিজেরা বিভক্তির কলাকৌশল কখনো উদ্ভাবন করতে এবং বাস্তবায়ন কতটুকু করতে পারত কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। নানা সমস্যা সৃষ্টিকারী এবং সম্ভবত অপ্রয়োজনীয় বিভক্তির (যা কোনো কিছুরই সমাধান করতে পারেনি) ফন্দি আঁটার বেশির ভাগ জবাব রয়েছে, ইসলামের চেয়ে অনেক বেশি, কয়েক শ' বছর ধরে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে।

অধ্যায় এগারো

ইসলাম ও চীন

ইসলাম ও চীনের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের খুব কম লোকই অবগত রয়েছে, যদিও যেসব দেশে বিপুল মুসলিম রয়েছে, তাদের মধ্যে চীনের স্থান ওপরে। দেশটিতে দুই কোটি মুসলমান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। সংখ্যাটি বেশির ভাগ আরব দেশের চেয়েও বেশি। তবে তাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য টানা যায়। চীনা মুসলমানদের প্রায় অর্ধেক জাতিগতভাবে হ্যান চীনা। চীনে প্রাথমিককালের মুসলিম বসতি স্থাপনকারী আরব ও পারসিকদের মিশ্র রক্তের বংশধর। তাদের হুই বা হুই-হুই হিসেবে অভিহিত করা হয়। তারা কেবল চীনা ভাষায় কথা বলে, অন্য হ্যান চীনার মতোই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, অবশ্য ইসলাম থেকে উদ্ভূত অল্প কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া। সময়ের পরিক্রমায় হ্যান ও মুসলিম উপাদানগুলো চমকপ্রদভাবে পরস্পরের সাথে মিশেছে এবং বৃহত্তর চীনা সংস্কৃতির সাথে অত্যন্ত স্বস্তিদায়কভাবে সহাবস্থান করছে। চীনা মুসলিমদের অপর অংশ জাতিগত ও ভাষাগতভাবে অনেক ভিন্ন। তারা প্রধানত তুর্কি বংশোদ্ভূত। উইঘুররা পশ্চিম চীনের প্রত্যন্ত এলাকায় বাস করে, তারাই বিপুল সংখ্যাধিক্যে বৃহত্তম তুর্কি গ্রুপ। হুই মুসলিমরা চীনা জীবনযাত্রার সাথে বেশ ভালোভাবে মিশে গেলেও তুর্কি উইঘুররা পারেনি। চীনা কর্তৃপক্ষ উইঘুরদের সন্দেহের চোখে দেখে, তাদের সাথে কঠোর আচরণ করে। সমস্যাটির অনিবার্য জাতিগত চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলে, যা ইসলামের সাথে উইঘুরদের সংশ্লিষ্টতায় জোরালো হয়।

চীনা উদাহরণে বহুল কথিত ‘তরবারির মাধ্যমে ইসলাম প্রচার হওয়ার প্রচারণা’ আবারো ভুল প্রমাণিত হয়। মুসলিম ভাষ্যানুযায়ী, ইসলাম বিস্ময়করভাবে অনেক আগে, সেই ৬৫১ সালে পৌঁছে ছিল চীনে। মহানবী সা:-এর ইন্তেকালের মাত্র ১৮ বছর পর নৌকায় [হজরত] ওমরের দূত ক্যান্টন পৌঁছেন। মহানবী সা:-এর একটি সুপরিচিত হাদিসে বলা হয়েছে, ‘প্রয়োজনে চীন গিয়ে হলেও জ্ঞান অর্জন করো’। মুসলিম ভাষ্যানুযায়ী, তাঙ রাজবংশের সম্রাট ক্যান্টনে একটি মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। চীনে এটাই ছিল প্রথম মসজিদ। সেটা এখনো টিকে আছে। সম্রাট বিশ্বাস করতেন, কনফুসিয়ান ধর্মের শিক্ষার সাথে ইসলাম সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি ওই এলাকায় মুসলিম বসতি স্থাপন করার জন্য আরব ও পারসিক বণিকদের অনুমতি দেন। ক্যান্টনে ইসলামের সাথে প্রাথমিক চীনা সাক্ষাৎ তা-ই শান্তিপূর্ণ ও ফলপ্রসূই হয়েছিল। মুসলিমদের চীনা সমাজে স্থান মঞ্জুর করা হয়েছিল। আরব ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক দক্ষতা ও যোগাযোগের বিষয়টি প্রাক-ইসলামি আমল থেকেই চীনাদের জানা ছিল। চীন অল্প সময়ের মধ্যেই

মুসলমানদের সমুদ্র ভ্রমণের বিপুল দক্ষতা স্বীকার এবং নিজের প্রভাব ও পরিসর বাড়ানোর কাজে সম্ভাব্য লাভের বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ফলে সং রাজবংশের সময়ের (৯৬০-১২৭৯) মধ্যেই চীনের আমদানি-রফতানি শিল্পে মুসলমানেরা প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলে; ডাইরেক্টর জেনারেল অব শিপিং পদটি দীর্ঘ দিন ধরে কোনো না কোনো মুসলিম অধিকার করে থাকতেন।

কিন্তু চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রত্যন্ত এলাকায় চীন ও ইসলামের মধ্যে সংগঠিত ভূ-রাজনৈতিক ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে রয়েছে দীর্ঘ মেয়াদি বিপুল ভূ-রাজনৈতিক পরিণতি। তাঙ রাজবংশের অগ্রসরমান বাহিনী মধ্য এশিয়ায় অভিযানের একপর্যায়ে ৭৫১ সালে তারা তালাসে (বর্তমান সময়ের কিরঘিস্তান) আব্বাসীয় খিলাফতের আরব বাহিনীর মুখোমুখি হয়। আরবরা চীনা বাহিনীকে পরাজিত করে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মধ্য এশিয়ায় চীনা সম্প্রসারণের বন্ধের সূচনা ঘটে। অনেকে তালাস যুদ্ধকে কৌশলগত ও সভ্যতাগত টার্নিং পয়েন্ট বিবেচনা করে। আরব বিজয়ের ফলে মধ্য এশিয়া চীনা শাসনের অধীনে যায়নি এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ওই অঞ্চলের তুর্কি গোত্রগুলো তখন ক্রমবর্ধমান হারে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। ফলে এই ঘটনা ভবিষ্যতে তাদের শতাব্দী-দীর্ঘকালের অভিবাসনে অমোচনীয় চিহ্নে পরিণত হয়। চূড়ান্তপর্যায়ে তারা ভূমধ্যসাগরীয় এবং আনাতোলিয়া অঞ্চলের বায়জান্টাইন বিশ্বে তাদের ধর্ম নিয়ে যায়।

সময়ের পরিক্রমায় মুসলিমরা সাম্রাজ্যের মৌলিক প্রশাসনে আরো বেশি করে নিয়োজিত হয় : ইউয়ান (মঙ্গোল) রাজবংশের (১২৭১-১৩৬৮) মাধ্যমে মঙ্গোলরা পাশ্চাত্যের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করতে মুসলমানদের ব্যবহার করে। দামাস্কাসের মতো পশ্চিম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া মঙ্গোলরা শত শত আরব, পারসিক ও মধ্য এশিয়ার তুর্কিকে আটক করে চীনে পাঠিয়ে দেয় সাম্রাজ্য পরিচালনায় (বিশেষ করে অর্থ ও কর, পঞ্জিকা তৈরি, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বেইজিংয়ে নতুন রাজধানী নির্মাণে) সাহায্য করার জন্য। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আরব ও পারসিক বংশোদ্ভূত প্রথম মুসলমানদের পাশাপাশি মধ্য এশিয়ার তুর্কি রক্তের লোকজনের প্রথম বড় ধরনের প্রবাহ ঘটে চীনে। মুসলমানদের প্রশাসক ও গভর্নরের মতো পদে নিয়োগ দেয়া হয়, তাদের অনেকে মুসলিম পরিচিতি বজায় রেখেই চীনা সংস্কৃতি পুরোপুরি আত্মস্থ করে নেয়। এ ঘটনা হুইদের বিভিন্ন রক্তধারা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

মিঙ রাজবংশের আমলটা (১৩৬৮-১৬৪৪) ছিল মুসলমানদের জন্য ফলপ্রসূ। এত দিন মুসলমানদের বহিরাগত আরব ও পারসিক বণিক শ্রেণী হিসেবে মনে করা হলেও এই সময়ে হুই মুসলমানেরা চীনা সংস্কৃতিতে আরো ভালোভাবে মিশে যায়, চীনা নাম পর্যন্ত গ্রহণ করে। তারা নানজিঙে মুসলিম শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে; ইসলামি শিক্ষার জন্য দু'টি সাংস্কৃতিক ভাষা ছিল আরবি ও ফারসি। মুসলমানেরা ক্রমবর্ধমান হারে অমুসলিম চীনাদের বিয়েও করতে থাকে। এতে করে তারা বিদেশী মর্যাদা বিলীন করে অবয়বে 'স্বতন্ত্রহীন' হতে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, হুইদের কোনো ['স্বতন্ত্র'] অভিন্ন ভাষা, কোনো অভিন্ন ভূখণ্ড এবং কোনো অভিন্ন অর্থনৈতিক জীবন ছিল না, যদিও তারা বাজারে ব্যবসায়

করার দক্ষতার দিকেই ঝুঁকছিল এবং সব হুইয়ের মধ্যে একমাত্র অভিন্নতা, যা ছিল তা হলো ইসলাম এবং এর সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর চর্চা। চীনে ইসলামের প্রাথমিক উপস্থিতির কারণে অতি সাম্প্রতিক সময়ের আগ পর্যন্ত এটাকে চীনা সাম্রাজ্যের অন্যতম আনুষ্ঠানিক দেশজ ধর্ম বিবেচনা করা হতো। সময়ের পরিক্রমায় হুইরা তাদের অপরিহার্য হ্যান সংস্কৃতি এবং চীনা সমাজে অনেক বেশি হারে মিশে যাওয়ায় পর্যায়ক্রমিক রাজবংশের কাছে বেশ ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। অবশ্য দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে ভিন্ন জাতিসত্তার মুসলিম সংখ্যালঘুদের অবস্থা ছিল অন্যরকম। হানকরণের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ প্রবণতা আজকের দিনেও অব্যাহত রয়েছে।

১৫০০ শতকের প্রথম ভাগে চীনা ইতিহাসের বেশির ভাগ চমকপ্রদ সমুদ্র অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অ্যাডমিরাল জেন হি। তিনি ছিলেন চীনা মুসলমান। চীনা সম্রাট তাকে ভারত মহাসাগরের পুরো এলাকা চষে ফেলতে সাতটি অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। তিনি পশ্চিম দিকে অবস্থিত বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিপুল হালনাগাদ তথ্য নিয়ে ফেরেন।

সঙ্কর সংস্কৃতির প্রভাব

রাশিয়া ও ভারতের মতো চীনেও ইসলাম বিপুল চীনা সাংস্কৃতিক পরিবেশে চমৎকারভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এবং বিশ্বের অন্য সব স্থানের মতো চীনেও সময়ে সময়ে ইসলামি পুনর্জীবন আন্দোলন জেগে উঠেছে বিশ্বাসকে আবর্জনামুক্ত করতে, অনৈসলামিক চিন্তা ও অনুশীলন থেকে পরিশুদ্ধ করতে এবং ইসলামের মৌলিক রীতিনীতি অটলভাবে পালনের জন্য। এসব সাঙ্ঘর্ষিক প্রবণতার উভয়টি (নতুন ধারণা গ্রহণ বনাম উদ্ভাবন প্রত্যাখ্যান) চীনের ইসলামকেও প্রভাবিত করেছে। বেশ আগে থেকেই চীনের মুসলিম চিন্তাবিদেরা চীনা দার্শনিক চিন্তাধারার বিপুল অবয়বে অভিভূত হয়েছিলেন, যা ইতোমধ্যেই ইসলাম আবির্ভাবের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিল। ইতিহাসবিদ জোনাথন লিপম্যান উল্লেখ করেছেন এভাবে :

কনফুসিয়ান চিন্তাধারায় চীনা ইসলামের প্রভাব ও পরিব্যাপ্তি দৃশ্যত শেষ দিকের মিঙ এবং প্রথম দিকের কিঙ ইসলামের (যা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছিল) সতেজ, তরতাজা ও নতুন জীবনীশক্তি দান করে ছিল।... চীনা-ইসলামি একটি গ্র"প উদ্দীপ্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তারা ইসলামি ধর্মীয় মতবাদ অধ্যয়ন, বিন্যস্ত করা এবং সারমর্ম তৈরি করার মতো বিষয়ে পদ্ধতিগতভাবে কনফুসিয়ান ভাষা ও কনফুসিয়ান ধারণা ব্যবহার করেন। তারা একটি পূর্ণাঙ্গ চীনা ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিকব্যবস্থাও নির্মাণ করেন, অনন্য চীনা রীতিতে চীনা ভাষায় ইসলামি শিল্পকলা নিয়ে রচনাও প্রকাশ করেন। এসব শিল্পকে চীনের মুসলমানরা বলত হ্যান কিতাব, অর্থাৎ চীনাদের কানুন, এবং চীনা-মুসলিম সমাজের তাদের বিশেষ প্রভাব ছিল।

চীনে মসজিদগুলো নির্মিত হতো চীনা ঐতিহ্যবাহী মন্দির ও প্যাগোডা রীতিতে। হুইরা আরবি হস্তলিপি চীনা ভাষায় রূপান্তরিত করে অনন্য চীনা-আরবি হস্তলিপিও তৈরি করেছিল। ইসলামি ও চীনা সংস্কৃতির মধ্যে আরো সমন্বয় কামনাকারী মুসলিম স্কলাররা আসলে কনফুসিয়ানবাদের মধ্যে তাদের দার্শনিক সামঞ্জস্য পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। চীনের অন্যতম মুসলিম স্কলার ইউসুফ মা দেক্সিন এ দু'টির মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজটি করেছিলেন। দক্ষিণ-পূর্বের ইউনান প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী এই স্কলার ১৮৪১ সালে হজ করেছিলেন, আট বছর মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান করার সময় কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন, তারপর জেরুসালেম এবং উসমানিয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ সফর করেন। আরবি, ফারসি উভয় ভাষায় তার বিপুল জ্ঞান ছিল, তিনিই প্রথম চীনা ভাষায় পবিত্র কুরআন

অনুবাদ করেন। তিনিই মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি ও রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার সর্বশেষ ধারাটি চীনে নিয়ে আসেন।

কনফুসিয়ানবাদের প্রতি মুসলিম আকর্ষণ প্রথম দর্শনে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। কারণ কনফুসিয়ানবাদ মূলত ‘সেক্যুলার’ ও নৈতিকতাসম্পন্ন। এটা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ধর্মের চেয়ে দর্শনগত অবস্থার প্রতিই বেশি গুরুত্ব দেয়। কনফুসিয়ানবাদ মূলত নৈতিক ও নীতিগত কাঠামো দেয়ার কারণেই আসলে এটা ধর্মতাত্ত্বিক পর্যায়ে ইসলামকে খুব কমই চ্যালেঞ্জ করে। চীনের সব ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে ‘চীনা’ বিবেচিত হয় কনফুসিয়ানবাদ। এ কারণে অত্যাচারী ও সন্দেহপ্রবণ কিং রাজবংশের কর্মকর্তাদের সতর্ক দৃষ্টির মুখে মুসলিমদের কাছে কনফুসিয়ানবাদকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। তারা কর্তৃপক্ষকে বোঝায়, কনফুসিয়ান ধর্মের সাথে ইসলামের ব্যাপক মিল রয়েছে, এই ধর্মটি শৃঙ্খলা, সুবিচার, সুশাসনের পক্ষে এবং সম্রাটকে সমর্থন করে।

অনেক মুসলিম বিশ্বাস করত, তারা কনফুসিয়ান ধর্ম ব্যবহার করে চীনাদের মধ্যে ইসলামকে ছড়িয়ে দিতে পারবে। কিন্তু ধর্ম দু’টির মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় সব সময়ই একটা চাপ সৃষ্টি করত। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বাসের প্রধান অংশটি কনফুসিয়ান ধর্মের নিরাবেগ, ইহলৌকিকতা, নাস্তিকতাপূর্ণ নৈতিক দর্শন থেকে অনেক দূরে প্রসারিত হয়। অধিকন্তু, চীনা সংস্কৃতির শক্তিশালী জাতিকেন্দ্রিকতা ইসলামি বিশ্বাসের কেন্দ্র অনেক দূরের মক্কাকে গ্রহণ করতে কঠিন মনে হতো। তা ছাড়া পশ্চিমের তিনটি ধর্মের মধ্যে থাকা অলৌকিক উপাদান এবং বিশ্বাস চীনাদের বিশ্বাসপ্রবণতার মধ্যে চাপ বাড়াত। ফলে হ্যান চীনাদের ইসলামে নতুন করে ধর্মান্তরের কাজে মুসলমানদের সাফল্য এসেছে সামান্যই। ভারতীয় উৎস, চীনে অস্থানীয় এবং মুসলিম সংবেদনশীলতায় খুবই বিমূর্ত, পারলৌকিক ও নিরীশ্বরবাদী বিবেচিত হওয়ায় বৌদ্ধধর্মকে মুসলমানদের পক্ষে তাদের ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করতে পারা আরো কঠিন হয়ে পড়ে।

কিং রাজবংশ (১৬৪৪-১৯১১)

কিং রাজবংশের আবির্ভাব মুসলমানদের জন্য মারাত্মক টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়, সম্ভবত চীনা ইতিহাসে ১৯৭০-এর দশকে মাওয়ের নেতৃত্বাধীন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগ পর্যন্ত তাদের জন্য এটাই সবচেয়ে খারাপ অধ্যায়। হ্যান নয়, জাতিগতভাবে মাঞ্চু (আলতাইক) কিংরা ছিল বৈষম্যপূর্ণ এবং ভিনদেশীদের প্রতি বিরূপ; তারা হুইদের অবিশ্বাস করত। কিংরা নতুন কোনো মসজিদ নির্মাণ বন্ধ করে দেয়, মক্কায় হজযাত্রা নিষিদ্ধ করে, মুসলমানদের আলাদা করে দেয়া হয়। বৈষম্য সৃষ্টিকারী ও পতনোন্মুখ কিং শাসনের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত দু'টি প্রবল মুসলিম আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, একটি দক্ষিণ-পশ্চিমের ইউনান প্রদেশে 'পান্থাই বিদ্রোহ' (১৮৫৫-১৮৭৩) এবং অন্যটি উত্তর-পশ্চিমের 'দানগান (হুই) বিদ্রোহ' (১৮৬২-১৮৭৭)। এই দু'টি বিদ্রোহের ধারাবাহিকতায় সরকার অনেক সময় গণহত্যা ধরনের নীতি অনুসরণ করায় কয়েক কোটি লোক মারা যায়। এসব রক্তাক্ত সময়ে অনেক হুই রুশ মধ্য এশিয়ায় পালিয়ে যায়। তারা সেখানে দানগান নামে পরিচিতি পায়। তারা এখনো চীনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বড় সংখ্যালঘু গ্র"প হিসেবে বিরাজ করছে। কিংবিরোধী বিদ্রোহ কেবল মুসলমানেরাই করেছিল, এমন নয়। কিং রাজবংশ পতনের দিকে যেতে থাকায় চীনজুড়ে ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ ও গোলযোগ সৃষ্টি হয়। এখানে এবং যেমন দেখা যায় রাশিয়ায়, একটি গুরুত্বপূর্ণ উপসংহার এমন হতে পারে যে, নিপীড়নমূলক অবস্থা সৃষ্টির কারণে মুসলমানেরা শোচনীয় পরিস্থিতিতে না পড়লে তেমনভাবে বিদ্রোহ করে না, যেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল কিং রাজবংশের অত্যাচার এবং পরে রাশিয়া ও চীনের দুই কমিউনিস্ট পার্টি।

মরমিবাদের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার মাধ্যমে আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগের ব্যবস্থাকারী অত্যন্ত কার্যকর মুসলিম শক্তি সুফিবাদ চীনে প্রবেশ করেছিল মধ্য এশিয়ার এবং মুসলিম বিশ্বের পশ্চিম দিক থেকে। মধ্যপ্রাচ্য নিজেই পুনর্জীবন আন্দোলন সৃষ্টি করার সময় চীনা মুসলিম সমাজের একটি ছোট্ট তবে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইসলাম অধ্যয়ন করতে মিসর, আরব উপদ্বীপ, উসমানিয়া সাম্রাজ্য এবং অন্যান্য স্থান সফর করেছিল। 'নয়া শিক্ষা আন্দোলন' নামের এসব নতুন ধারণা চীনা ইসলামের সনাতনী এবং প্রায় স্থির হয়ে থাকা রূপকে মোকাবেলা করতে নিয়ে আসা হয়। 'নয়া শিক্ষা আন্দোলন' উদ্যোগটি মুসলিম বিশ্বের দূরবর্তী উপাদানগুলোর মধ্যকার বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগ পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়টির প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

কারণ, নতুন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বরা চীনা ইসলামকে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের চিন্তাধারার সাথে আরো ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে চেয়েছিলেন।

তবে চীন ১৯৩০-এর দশকের দিকে এগোতে থাকার প্রেক্ষাপটে শীর্ষস্থানীয় মুসলিম স্কলাররা মুসলিম সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করতে তখনো চীনা হ্যান সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের পরিকল্পনা করছিলেন এবং মুসলিম আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। অনেকেই বিশ্বাস করতে থাকে, একমাত্র শক্তিশালী, নিয়মতান্ত্রিক ও সুব্যবস্থিত চীনই পারে চীনা মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সাংস্কৃতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে। এসব প্রয়াসের লক্ষ্য ছিল মূলনীতির সাথে আপস না করেই চীনা রাজনীতি, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জগতের মধ্যে ইসলামকে আরো সহজবোধ্য, নৈতিকতাসম্পন্ন ও কার্যকর করে গড়ে তোলা।

কিন্তু চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সেই সব কিছুই নস্যাৎ করে দেয় : কেবল ইসলাম নয়, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় সেসব ধর্ম, ঐতিহ্য গুঁড়িয়ে দেয়। চীনজুড়ে মসজিদগুলো বিকৃত করা, ধ্বংস করা বা বন্ধ করে দেয়া হয়। অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও এই অবস্থায় পড়ে। কিন্তু কমিউনিস্ট-পরবর্তী সময়ে হুইরা ঘুরে দাঁড়ায়, ক্রমবর্ধমান হারে সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৌঁছে যায়। হুই ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম সংস্কৃতি চীনা মহাকাব্যগুলোতে জনপ্রিয় রোমান্টিক আবহ তৈরি করে, যা অতি সম্প্রতি দেখা গেছে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র ক্রচিং টাইগার, হিডেন ড্রাগনে। এ ছাড়া সংস্কৃতিটি চীনা পোশাক ও সঙ্গীতেও প্রভাব বিস্তার করে। চীনা নগরীগুলোতে মুসলিম রেস্তোরাঁও ব্যাপকভাবে দেখা যায়। চীনা আদর্শ রান্না প্রণালীতে সাধারণভাবে না থাকলেও তাদের কঠোর হালাল খাবার এবং সেই সাথে ভেড়ার গোশতের নানা উপাদেয় বিশেষ পদের আকর্ষণে অমুসলিম চীনারাও ব্যাপকভাবে সেখানে যায়। হুইরা 'চীনা সহাবস্থানের মডেল' হিসেবে চীনের বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পূর্ব এশিয়ার স্কলারদের নিয়ে ১৯৯৫ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা (দি ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার অন ইসলাম অ্যান্ড কনফুসিয়ানবাদ : এ সিভিলাইজেশনাল ডায়ালগ) অনুষ্ঠিত হয় কুয়ালালামপুরে। বিশিষ্ট মালয়েশিয়ান রাষ্ট্রনায়ক ও ইসলামি চিন্তাবিদ আনোয়ার ইব্রাহিম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি উল্লেখ করেন:

ইসলাম ও কনফুসিয়ানবাদের মধ্যে অবাক করা অনেক মিল রয়েছে। জনগণ পর্যায়ে উভয়ের পরমাদর্শ ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, ধর্ম থেকে সরে থাকার ধারণা প্রত্যাখ্যান, জনগণ পর্যায়ে নীতিনৈতিকতায় সামঞ্জস্যতা রয়েছে। সেকুলারবাদের বিরুদ্ধে ইসলামি যুক্তি তথা ধর্ম ও নৈতিকতাকে রাজনীতি এবং অন্যান্য সামাজিক বিষয় থেকে আলাদা করার ধরন অধ্যাপক তু ওয়ে-মিংয়ের ওয়ে, লার্নিং অ্যান্ড পলিটিক্স গ্রন্থে উল্লিখিত কনফুসিয়ানবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বেমিলপূর্ণ নয়। সরকারের আস্থা অর্জন

এবং সমাজকে নৈতিক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করার কনফুসিয়ান প্রকল্পের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে একাত্ম হতে একজন মুসলিমের কোনোই সমস্যা হয় না।

উইঘুর

মুসলিম জনসংখ্যার অপর অংশ তথা যারা জাতিগতভাবে হ্যান নয় (মূলত তারা তুর্কি; এবং সেই সাথে ইরানিভাষী তাজিকদের ছোট ছোট গ্রুপ), তাদের প্রসঙ্গ এলে কাহিনীটা পুরো বদলে যায়। এসব গ্রুপের মধ্যে উইঘুররা ব্যাপকভাবে বৃহত্তম, তাদের সংখ্যা প্রায় এক কোটি, তারা বাস করে জিনজিয়াঙ প্রদেশে। রুশ মুসলমানরা যেভাবে রুশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ফলে দেশটিতে আত্মস্থ হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই উইঘুররা চীনা সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হওয়ায় আত্মস্থ হয়েছিল। এসব তুর্কি ও তাজিক সংখ্যালঘু মধ্য চীন থেকে অনেক দূরে পাকিস্তান ও কাজাখস্তান সীমান্তসংলগ্ন পশ্চিম জোনে বাস করে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, তারা মাত্র অতি সাম্প্রতিক সময়ে চীনা রাষ্ট্রের সাথে আত্তীভূত হয়েছে। উইঘুররা সম্প্রসারিত মধ্য এশিয়ান তুর্কি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, মধ্য এশিয়ার অন্য তুর্কি জনগোষ্ঠীগুলোর সাথে, বিশেষ করে উজবেকদের সাথে তারা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ইতিহাসের বেশির ভাগ সময় তারা উজবেকদের সাথেই ছিল। অর্থাৎ এসব সংখ্যালঘু গোষ্ঠী জাতিগত, সংস্কৃতিগত ও ধর্মীয়ভাবে হ্যানদের থেকে ভিন্ন, যা আরো জোরালভাবে স্বতন্ত্র পরিচিতি সৃষ্টি করছে এবং নিজের মধ্যে মিশিয়ে ফেলতে উদ্যোগী হ্যান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রতিরোধ তীব্র করছে।

চীনে কমিউনিস্ট শাসন, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক বিপ্লব অনেক সংখ্যালঘুর সংস্কৃতিকে তছনছ করে দেয়ায় তারা বৈরী হয়ে পড়ে। উইঘুর স্বায়ত্তশাসন ও সংস্কৃতি পঙ্গু করে দেয়ার চীনা রাষ্ট্রীয় নীতির বিরুদ্ধে উইঘুররা অনেকবার বিদ্রোহ করেছে। সশস্ত্র কিংবা শান্তিপূর্ণ যে প্রতিরোধই হোক না কেন, পুলিশ সেটা মোটামুটিভাবে দমন করেছে। কিন্তু তবুও উইঘুররা তাদের চীনাকরণের বেইজিংয়ের নীতির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো অব্যাহত রেখেছে।

তাদের দাবি অমূলক কিছু নয় : 'অবাধ্য' একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ওপর নিয়ন্ত্রণ জাহির করার উপায় হিসেবে বেইজিং পরিকল্পিতভাবে জিনজিয়াঙ প্রদেশে হ্যান চীনাদের ব্যাপক হারে অভিবাসন ঘটাচ্ছে। এসব অভিবাসী বিরামহীনভাবে উইঘুরদের চেপে ধরছে, উইঘুর ভূমি হ্যান বসতি স্থাপনকারীরা ক্রমাগত বেশি হারে ছেয়ে ফেলছে। সময়ের পরিক্রমায় এক কোটি উইঘুর চীনের ১২০ কোটি হ্যান চীনার বিপরীতে তাদের পরিচিতি ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে সামান্যই সক্ষম হবে। কোনো না কোনো পর্যায়ে,

উইঘুর সংস্কৃতি হয়তো পর্যটকদের আকর্ষণীয় বস্তুদের চেয়ে বেশি আর কোনো কদর থাকবে না, হয়তো তারা পরিণত হবে জাদুঘরে রাখা অতীতের কোনো বস্তুতে। আর 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধের' সুবিধাটি দ্রুত গ্রহণ করে চীনারা ঘোষণা করেছে, ওয়াশিংটন যে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, উইঘুররা তাদেরই অংশ।

এটা সুস্পষ্ট, বর্তমান বিশ্বের যেকোনো স্থানের মতো বেইজিংয়ের সমস্যাটাও আসলে ইসলামের সাথে মোটেই সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং সমস্যাটা সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীবিষয়ক। বিশেষ করে আলাদা ধর্মের কারণে তাদের অনন্যসাধারণ জাতিগত পরিচিতিটি আরো জোরদার হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে মুসলিম উইঘুর ও বৌদ্ধ তিব্বতি ও মঙ্গোলদের কথা বলা যায়। এই দ্বিগুণ স্বতন্ত্র পরিচিতি কোনো না কোনো ধরনের স্বায়ত্তশাসন আকারে তাদের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার দৃঢ় প্রতিশ্র"তি বাড়িয়ে দিচ্ছে।

বেইজিংও জানে, এশিয়ায় তার নিজের ভবিষ্যৎ শক্তি নির্ভর করছে মুসলিম রাষ্ট্র এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীগুলোর (মুসলমানদের হাতে থাকা জিনজিয়াঙ থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সর্ব-গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি খাতসহ) সাথে তার ওয়ার্কিং রিলেশনের ওপর। চীনা নেতৃত্ব উইঘুর বা তিব্বতি বিচ্ছিন্নতাকামী, প্রতিরোধ বা সহিংসতার স্ফুলিঙ্গ গুঁড়িয়ে দিতে চাইলেও 'ইসলামের রক্তাক্ত সীমান্ত' হওয়ার সম্ভাবনা তাদের ধারণার মধ্যে একেবারেই নেই। একটি ছোট জিহাদি সংখ্যালঘু হয়তো জিনজিয়াঙে সক্রিয় থাকবে, কিন্তু সেটা কেবলই ছোট ও মøান হতে থাকা প্রভাব সৃষ্টি হবে। কারণ চীন ধীরে ধীরে ও নীরবে স্বতন্ত্র য়ত্তশাসিত সমাজ হিসেবে উইঘুরদের পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে।

মুসলিম বিশ্বের বেশির ভাগ স্থানে চীনকে বিবেচনা করা হয় মুসলিম বিশ্বে আমেরিকার সীমাহীন শক্তিপ্রয়োগ রুখে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ও সাদরে গ্রহণযোগ্য ভারসাম্য বিধানকারী শক্তি। মধ্য এশিয়ার মতো চীনা সীমান্তের খুব কাছের মুসলমানদের সামনে চীন অনেক বেশি দ্ব্যর্থবোধক ছবি উপহার দিচ্ছে। তারা অতীতে চীনের সম্প্রসারণবাদী নীতি এবং বিপুল সংখ্যাধিক্য দিয়ে অন্য সব সংস্কৃতিকে স্থায়ীভাবে আত্মস্থ (লুপ্ত করা) করার সামর্থ্যরে সাথে ভালোভাবেই পরিচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে চীন ও রাশিয়া একে অন্যের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করতে থাকায় মুসলমানদের জন্য কিছুটা দম ফেলার ফুরসতের ব্যবস্থা করতে পারে।

অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে ইসলাম নয়, বরং চীনের বৈচিত্র্যপূর্ণ জাতিগত বিষয়টিই একটি বিশেষ সমস্যা। ইসলাম না থাকলেও এসব জাতিগত সমস্যা খুব বেশি ভিন্ন হতো না। চীনা হ্যান মুসলিমরা নিশ্চিতভাবেই আত্তীভূত হয়ে গেছে এবং মুসলিম ও চীনা সংস্কৃতির সাথে সৃষ্টিশীলভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে। জাতিগতভাবে ব্যাপক ভিন্ন মুসলিমরা মূলত বিচ্ছিন্নতার জন্য জাতিগত লড়াই করছে, অবশ্য সেটা জোরদার হচ্ছে চীনের সাথে তাদের ধর্মীয় পার্থক্যের কারণেও।

অধ্যায় বারো

উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদ, ইসলাম এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম

মুসলমানদের দীর্ঘ এবং মর্মভেদী চড়াই-উৎরাইয়ের সংক্ষিপ্ত চিত্রটা এমন : মুসলিম গৌরবগাথা, ধীরে ধীরে মুসলিমদের পতন, পাশ্চাত্যের উত্থান, পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মুসলিম বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ, উপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম এবং নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপমূলক পাশ্চাত্য নব্য-সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সমসাময়িক ক্ষোভ। পাশ্চাত্য ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আজকের মুসলিম বিশ্বের সঙ্ঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই কাহিনী। মুসলিম বিশ্ব থেকে যে গোলযোগ ও ক্রোধের উদ্ভব ঘটছে, সেটা বুঝতে হলে এই চড়াই-উৎরাই সম্পর্কে উপলব্ধি থাকাটা খুবই জরুরি। এটা মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্বে সংগঠিত একের পর এক প্রকৃত, বস্তুনিষ্ঠ ও নেতিবাচক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট অসন্তোষের ইতিহাস। ইসলামের উপাদানটি ফোকাস, উসিলা এবং প্রাণশক্তি দিয়েছে, তবে সেটা এই কাহিনীর বিশেষ কোনো মূল প্রতিপাদ্য নয়।

আমি 'মুসলিম বিশ্ব' বলছি, তবে বাস্তবে সমস্যাটি ইসলাম হিসেবে পরিচিত অংশে সীমিত নয়। এসব দেশ আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাতিন আমেরিকার একই সংগ্রাম আর ক্ষোভে জর্জরিত উন্নয়নশীল বিশ্বের বিশাল বিস্তৃত এলাকার অংশবিশেষ। উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ থেকে সৃষ্ট এসব সমস্যা একই পরিমাপে থাকবে, যদি বিশ্ব ইসলামবিহীনও হয়। তবে বিশ্বব্যাপী, আত্মসচেতন মুসলিম সংস্কৃতির উপস্থিতি অকাট্যভাবেই মুসলিম দুর্দশাকে অন্য যেকোনো স্থানের চেয়ে অনেক বেশি গভীরভাবে প্রকাশ করতে সহায়ক হচ্ছে। অধিকন্তু, প্রতিরোধের মনস্তত্ত্ব চূড়ান্তভাবে এসে মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের পরিকাঠামো তৈরি করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চীনারা পাশ্চাত্য আধিপত্যের ইস্যু নিয়ে একই ধরনের স্পর্শকাতর হলেও সেটা তারা তাদের নিজস্ব বিশেষ সাংস্কৃতিক বর্ণনা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ধরে রাখে।

মুসলমানরা ইতিহাসে তাদের ভূমিকা নিয়ে সব সময়ই আত্মবিশ্বাসী- স্বর্ণযুগে ইসলামি সভ্যতার অর্জন অনিবার্যভাবেই ইসলামি কর্মপরিকল্পনায় আল্লাহর অনুগ্রহ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে। নতুন ধর্মটির প্রাথমিক বিস্ফোরক সাফল্য ছিল অবাক করা। নবীজির (সা:) ইন্তেকালের কয়েক দশকের মধ্যেই ধর্মটি এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার অর্ধেক অংশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে; দীপ্তিময়, টেকসই সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্য

প্রতিষ্ঠায় তা সর্বোচ্চপর্যায়ে উপনীত হয়। কয়েক শ’ বছর ধরে মুসলমানেরা শিল্পকলা, বিজ্ঞান, দর্শন, সামরিক দক্ষতায় বেশির ভাগ বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। এসবের মাধ্যমে মুসলমানেরা বলেছে, এই বিকাশমান সভ্যতার অত্যন্ত ইতিবাচক কিছু আছে, যা এসবের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

তখনকার পরিচিত দুনিয়ার একটি অঞ্চলই ছিল যার ওপর ইসলামের প্রভাব বা যোগাযোগ ছিল খুবই কম। সেটা হলো পশ্চিম ইউরোপ। সবার শেষে আসা এই পশ্চিম ইউরোপই, ‘রিফরমেশন’ এবং ‘আবিষ্কারের যুগ’ শেষে জাতি-রাষ্ট্র দ্রুত বিকাশের পর আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে আসতে থাকে। পরিণতিতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতার মধ্যে ভারসাম্যের পরিবর্তন শুরু হয়। মুসলিম সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রগুলো তাদের সৃষ্টিশীল উদ্যম হারিয়ে ফেলে পতনের দিকে ধাবিত হয়।

পশ্চিম ইউরোপের সাথে ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে বিপরীত হয়ে যাওয়া নিয়ে মুসলমানেরা এখনো নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে : এমনটা কেন হলো, কী ভুল ছিল এবং মুসলমানেরা কিভাবে তার সৌভাগ্য পুনরুদ্ধার করতে পারে? তারা তাদের ইসলামি মূল্যবোধ হারানোর কারণেই কি এমনটা হয়েছে? এটা ছিল এমন যুগ যখন ইউরোপিয়ান শক্তিকে বিকশিত হয়ে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবং তারপর পুরো মুসলিম বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং আরো পরে চূড়ান্তভাবে এর বিরুদ্ধে মুসলিম প্রতিরোধ স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হতে দেখেছে। এসব অভিজ্ঞতা আজকের মুসলিম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোস্তত্ত্বের ভিত্তি গঠন করেছে।

সভ্যতাগুলোর প্রাণশক্তি উত্থান-পতনের সুপরিচিত ধরণ প্রকাশ করে, এই বৈশিষ্ট্য ইসলামি সভ্যতাকেও পরিব্যাপ্ত করেছে। ধার্মিক মুসলমানেরা তাদের সভ্যতার পতনে যন্ত্রণাদগ্ধভাবে নৈতিক বিচ্যুতিকে সম্ভাব্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করে। তবে প্রাচ্যের পতন এবং পাশ্চাত্যের উত্থানের পেছনে আরো অনেক কারণ রয়েছে, সেগুলো অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত। এসব উপাদানের ইসলাম প্রশ্নে করার আছে সামান্যই, কিন্তু বিশ্বের রাজনৈতিক এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন, সেই সাথে অন্যান্য উদ্দেশ্য-সম্পর্কিত উপাদান প্রশ্নে করার রয়েছে অনেক কিছু। সংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামের অস্তিত্ব যদি না থাকত, তবে খুবই সম্ভাবনা রয়েছে, এসব ঘটনার বেশির ভাগেরই গতিধারা তেমনভাবে পরিবর্তিত হতো না। উদাহরণ হিসেবে বলছি, ১৯ শতকের শেষ দিকেও চীনের মতো অনেক ক্ষেত্রে সভ্যতাগত বক্তব্য উজাড় করে বর্ণনা প্রত্যক্ষ করেছি।

সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপাদান

স্বর্ণযুগে ইসলাম সম্ভবত ছিল প্রাথমিক আধুনিক বিশ্বায়নের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন। রোমান সাম্রাজ্যের চেয়ে অনেক বেশি এলাকায় সম্প্রসারিত ইসলাম অভিন্ন ইসলামি সংস্কৃতির মাধ্যমে (যেখানে আরবি ও ফারসি জাতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতো) পরিচিত বিশ্বের বিশাল অঞ্চলের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিল। অবশ্য এই বিশ্বমুখী চেতনা ম্ø়ান হতে থাকায় একসময়ে উন্মুক্ত ও অনুসন্ধিৎসু সমাজকে সীমাবদ্ধ ও ক্ষয়িষ্ণুতার দিকে ধাবিত করে। অবশ্য তার পরও বিশ্বাসের অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ও কঠোর-আক্ষরিক ব্যাখ্যা এবং বৃহত্তর পরিসর, আরো বেশি সভ্যতাবিষয়ক ব্যাখ্যার মধ্যে লড়াইয়ের অস্তিত্ব সব সময়ই ছিল।

ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণশক্তি ও অনুসন্ধিৎসার মৃত্যু (নাটকীয় নতুন বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে লব্ধ উপাদান না থাকায় সভ্যতাগত প্রাণস্পন্দন ফুরিয়ে যায়) ইসলামি ধর্মতত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগে সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনা পতনের দিকে চালিত করে। ইসলাম অধ্যয়ন হিসেবে বিবেচিত চিন্তা-গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার বদলে শাস্ত্রীয় ও আক্ষরিক বিধিবিধানের জয়জয়কার ঘটে। চিন্তাধারা শুকিয়ে গেল, এমনকি আগের শতকগুলোতে ইসলামের নিজস্ব গ্রন্থরাজি ও উৎসের বস্তুনিষ্ঠতা ঐতিহাসিক যাচাইয়ের যে সুযোগ ছিল, সেটা পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়ে যায়। মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণশক্তিতে এই ক্ষয়িষ্ণুতা মুসলিম বিজ্ঞানের পতনে প্রবলভাবে দৃশ্যমান এবং সম্ভবত আরো ক্ষতিকর ছিল পরবর্তীকালের পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশের প্রতি সাধারণ আগ্রহহীনতা সৃষ্টি। এই উদাসীনতা ওই একই প্রযুক্তি মুসলিম দোরগোড়ায় পৌঁছে তাকে আচ্ছন্ন করা পর্যন্ত বজায় থাকে। এমনটি পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জের মুখেও বেশির ভাগ মুসলিম সংস্কারক পাশ্চাত্যকে মূলত প্রযুক্তিগত হার্ডওয়্যারের পণ্যাগার বিবেচনা করে, এগুলো চালানোর জন্য সর্ব-গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যে সফটওয়্যারের প্রয়োজন, সেটা উপলব্ধি না করেই।

বহিরাগত গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক উপাদানগুলোও মুসলিম বিশ্বের পতনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। ১৩ শ’ শতকে মঙ্গোলিয়ান তৃণভূমি এলাকা থেকে আকস্মিকভাবে ধেয়ে আসা বর্বর মঙ্গোল হামলা মহান মুসলিম নগরকেন্দ্রগুলোর সেরা অংশটি নিশ্চিহ্ন করে দেয়, পাঠাগার, জনসংখ্যা ও সহায়সম্পদসহ

অসংখ্য নগরী বিলীন হয়ে যায়। এই আঘাত থেকে মুসলমানেরা কখনোই পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেনি। তারপর ১৬ শতকে ইরানের শিয়া রাষ্ট্রের আবির্ভাব সুন্নি মুসলিম বিশ্বকে বাস্তবে বিভক্ত করে ফেলে, ইউরেশিয়াজুড়ে সুন্নি মুসলিমদের মধ্যে সদা-প্রস্তুত যোগাযোগ ও বাণিজ্য জটিল হয়ে পড়ে। নতুন ইউরোপিয়ান জাতি-রাষ্ট্রের উত্থান এবং তাদের নৌ-সামর্থ্যরে বিকাশের সাথে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা এবং প্রাচ্যের মধ্যকার বাণিজ্য স্থল রুট থেকে সমুদ্রপথে সরে যায়। স্থলপথের বাণিজ্যে মুসলিম দেশগুলো দীর্ঘ দিন একচেটিয়া অবস্থান ধরে রাখায় পাশ্চাত্যের কাছে ট্রান্স-এশিয়ান বাণিজ্যে সরাসরি অংশগ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ১৪ শ' শতকের প্রথম দিকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় এশিয়া থেকে 'কৃষ্ণ মৃত্যুর' আবির্ভাব স্থল রুটটির ব্যাপারে পাশ্চাত্যের আগ্রহ আরো কমিয়ে দেয়। আর এর ফলে স্থলপথে ভ্রমণের ঝামেলা ও জটিলতা দূর করতে প্রাচ্যে যাওয়ার সমুদ্রপথ অনুসন্ধান শুরু হয়।

প্রাচ্যে যাওয়ার নতুন কয়েকটি সামুদ্রিক পথ আবিষ্কার ছিল নতুন সমুদ্র প্রযুক্তিভিত্তিক। পাশ্চাত্য এসব প্রযুক্তি হাসিল করে আগের শতকগুলোতে আরব ও মুসলিম সমুদ্র ভ্রমণ দক্ষতা, ভারত মহাসাগরে তাদের ব্যাপকতর অনুসন্ধান, নিখুঁত মানচিত্র-প্রণয়ন, কম্পাসের ব্যবহার, উন্মুক্ত সাগরে চলাচলে উপযোগী নৌকা নির্মাণে সাফল্যের ওপর ভর করে। এসব অত্যাধুনিক সামুদ্রিক দক্ষতা অতি গুরুত্বপূর্ণ নতুন বিশ্ব 'আবিষ্কারে'র পথ দেখায়। আটলান্টিকজুড়ে সমুদ্রপথ বিকাশে ইউরোপের ক্রমবর্ধমান নজর দেয়ার ফলে বিশ্ব ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে, যা ইউরোপকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করে, পূর্ব এশিয়ায় অনুসন্ধানের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, একসময় এশিয়ান বাণিজ্যে প্রাধান্য বিস্তারকারী মুসলিম সমুদ্রচারীদের ভূমিকা ভয়াবহ মাত্রায় কোণঠাসা করে ফেলে।

গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত পরিবর্তনও সভ্যতার উত্থান-পতনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। জারেড ডায়মন্ড বলেছেন, সভ্যতার দীর্ঘকালীন সূতিকাগার 'ফারটাইল ক্রিসেন্ট' বৃক্ষশূন্যতা, শুষ্কতা এবং এর পরপরই প্রাকৃতিক ও প্রাণিজ সম্পদ হ্রাস পেতে থাকায় উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়ে ধীরে ধীরে অঞ্চলটির পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রোম পতনের পর দীর্ঘ দিন পর্যন্ত (মধ্যযুগের শেষ হওয়া পর্যন্ত) পশ্চিম ইউরোপ বিশ্ব ইতিহাসের সার্বিক ঘটনাবলিতে সামান্যই অবদান রাখতে পেরেছিল। ইতোমধ্যে ইউরোপের উদার জলবায়ু, উর্বর ভূমি এবং প্রাচুর্যপূর্ণ গাছপালার সাথে আত্মপ্রকাশ করে নবলব্ধ সভ্যতাগত শক্তি অনেক কম উৎপাদনশীলে পরিণত হওয়া সমাপিত প্রাচ্য সমাজগুলোর সাফল্য ও অর্জনের ভিত্তির ওপর নতুন ও শক্তিশালী পশ্চিম ইউরোপিয়ান সভ্যতার আত্মপ্রকাশ নিশ্চিত করে।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনালের জেফরি স্যাচসও জলবায়ু এবং প্রতিবেশগত পরিবর্তনজনিত প্রভাবের ওপর আলোকপাত করেছেন : ইউরোপ যখন নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ভোগ করছিল, মধ্যপ্রাচ্য তখন ক্রমবর্ধমান শুষ্কতায় ভুগছিল : '১৯০০ সাল নাগাদ, উসমানিয়া সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতনের সময় ইউরোপের ছিল কয়লা, পানিশক্তি, ব্যবহার্য কাঠ ও লোহার খনি। ১৯ শতকের

শিল্পায়নের জন্য এসব সম্পদের মজুদ ইসলামি দেশগুলোতে ছিল খুবই কম। তেলক্ষেত্রগুলো আবিষ্কার ও উত্তোলন শুরু হয় ইউরোপিয়ানদের উপনিবেশ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর।' নগরকেন্দ্রিক নথিপত্র অনেক কাহিনীই বলে। ৮০০ সালে মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম ইউরোপ উভয়ের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সমান, প্রতিটির প্রায় তিন কোটি করে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের ১৩টি নগরী ছিল যাদের জনসংখ্যা ছিল ৫০ হাজারের ওপরে, আর ইউরোপের মাত্র একটি। সেটা হলো রোম। ১৬০০ সাল নাগাদ ভারসাম্য নাটকীয়ভাবে বদলে যায়।

প্রাচ্য ও 'নতুন পৃথিবীতে' ইউরোপিয়ান সমুদ্র অভিযান এশিয়ার সমুদ্র উপকূলজুড়ে দীর্ঘমেয়াদি ইউরোপিয়ান উপস্থিতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। তারা প্রথমে সেখানে বাণিজ্যিক গুদামঘর, তারপর উপনিবেশ সীমান্তচৌকি এবং শেষ পর্যন্ত উপনিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও সাম্রাজ্য সৃষ্টি করে। এসব সীমান্তচৌকি প্রতিষ্ঠায় পর্তুগাল, স্পেন, হল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড পর্যায়ক্রমে একে অপরের উত্তরসূরি হয়। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার বেশির ভাগ মুসলিম অঞ্চল হিসেবে বহাল থাকলেও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যিক পরিধি কয়েক শ' বছর স্থায়ী সাম্রাজ্যবাদ যুগের সূচনা করেছিল। ইউরোপিয়ানরা প্রতিদ্বন্দ্বী দাবি নিয়ে একে অপরের সাথে দরকষাকষি, লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত এসব সাম্রাজ্যিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বাস্তব চরিত্র লাভ করে- অন্তত তাদের মধ্যে, যদি সাম্রাজ্যিক প্রজাদের মধ্যে না-ও হয়ে থাকে।

তবে প্রায় পুরো মুসলিম বিশ্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যিক নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কেবল মরুভূমির গভীরে দুর্ভেদ্য সৌদি আরব ও আফগানিস্তানের বেশির ভাগ এলাকা ছিল ব্যতিক্রম। আর বেশির ভাগ ইউরোপিয়ান শক্তি তথা পর্তুগাল, স্পেন, হল্যান্ড, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, বেলজিয়াম ও ইতালি বৈদেশিক সাম্রাজ্যিক খেলায় মেতেছিল। তাদের সাম্রাজ্যিক স্টাইল ব্যাপকভাবে ভিন্ন হলেও সবাই তাদের উপনিবেশের প্রজাদের ক্ষোভ ও প্রতিরোধের মুখে পড়ে।

তবে এটা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর হবে যদি বলা হয় যে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ পুরোপুরি পাশ্চাত্য বৈশিষ্ট্য কিংবা তা কেবলই পাশ্চাত্যের পাপ। সর্বোপরি, বিভিন্ন সময়ে বেশির ভাগ বিশ্বে সাম্রাজ্য ছিল স্বাভাবিক রাজনৈতিক-ব্যবস্থার অংশ। তবে পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদের বেশ কিছু অনন্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে : প্রথমত, ইউরোপিয়ানরা অনেক দূরের অন্য দেশ থেকে সমুদ্রযাত্রার মাধ্যমে জাতিগত ও সাংস্কৃতিকভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। নিয়ন্ত্রণ-প্রক্রিয়াটিকে নমনীয় করার জন্য ইউরোপিয়ানরা সাধারণত সংশ্লিষ্ট এলাকায় খ্রিষ্টান মিশনারিদের আমদানি করত। সাম্রাজ্যবাদের এই ব্যবস্থাটি বেশির ভাগ অ-ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যের তুলনায় ব্যাপকভাবে ভিন্ন। অ-ইউরোপিয়ানগুলো স্থলসাম্রাজ্য হওয়ায় তা হতো সংলগ্ন সাম্রাজ্য। এগুলো গঠিত হতো ধীরে ধীরে সম্প্রসারণের মাধ্যমে। সম্প্রসারণশীল সাম্রাজ্যের ভূমিশক্তিগুলো তাদের নবলব্ধসংলগ্ন সাম্রাজ্যিক অঞ্চলগুলো ভালোমতো চিনত, প্রায়ই কয়েক শ' বছর ধরে ভূখণ্ড দেয়া নেয়ার প্রক্রিয়ায় অংশ নিত- অনেক সময় তা হতো সাংস্কৃতিক আপেক্ষিক বর্ণনার অংশ হিসেবে।

সংলগ্ন সাম্রাজ্যগুলো সাধারণত কেবল প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণ করত। ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদ সাম্রাজ্যিক প্রজা ও শাসনকেন্দ্রের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত, অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের আইনি কাঠামো আরোপের মাধ্যমে এই নতুন ধরনটি বৈধ করার চেষ্টা চালাত এবং একই ধরনের সাধারণ ইউরোপিয়ান স্বীকৃতির প্রত্যাশা করত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন আলজেরিয়া ও কঙ্গোয় ফ্রান্স ও বেলজিয়াম আনুষ্ঠানিকভাবে সেগুলো নিজ দেশের সাথে জুড়ে দিয়েছিল। এই আরোপিত ন্যায়সম্মত নিয়ন্ত্রণ দৃশ্যত পাশ্চাত্য আন্তর্জাতিক-ব্যবস্থার 'আইনগত' স্বীকৃতি লাভ করত বলে তা স্থানীয় জাতীয় সার্বভৌমত্বের ওপর অনেক বেশি প্রকাশ্য মর্যাদাহানির কারণ হতো। তবে বৈশিষ্ট্যে ব্যাপক পার্থক্য থাকলেও সংলগ্ন বা সামুদ্রিক কোনো সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণই সহজাতভাবে কোনো ধরনের ভালো কিছু বয়ে আনত না।

চূড়ান্তভাবে বেশির ভাগ অস্থিতিশীলতা ও কণ্টকময় সাম্রাজ্যবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল বিদেশীদের সশরীরে বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দেয়া। যেটাকে বলা যায় বসতি স্থাপন উপনিবেশবাদ। বিদেশীরা জীবনযাপন করত, ভূমি দখল করত এবং সব দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনসাধারণের ওপর সরকারি শাসন প্রতিষ্ঠা করত। এগুলো ছিল কঠিনতম ধরনের উপনিবেশ পরিস্থিতি, প্রকৃত সহিংসতা ছাড়া এগুলো বিলীন করা যেত না। এ কারণেই আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ রোডেশিয়া (জিম্বাবুয়ে), পর্তুগিজ অ্যাঙ্গোলা, আলজেরিয়া ও ইসরাইলে ইউরোপিয়ান ইহুদিদের ফিলিস্তিনি ভূমিতে বসতি স্থাপনে ব্যাপক উত্তেজনা ও রক্তপাত দেখি।

মুসলিম সমাজে উপনিবেশ প্রভাব

সাম্রাজ্যিক শাসন দ্রুততার সাথে মুসলিম বিশ্বের স্বাভাবিক বিকাশের পথ বিকৃত করে দেয়, নেতৃত্ব ও শাসন পরিচালনার ঐতিহ্যবাহী কাঠামো গুঁড়িয়ে দেয়, ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে, সাংস্কৃতিক ধারাকে বিশৃঙ্খল করে ফেলে এবং সেই সাথে স্থানীয় বিকল্পের সহজাত বিকাশকে উৎসাহিত করতেও ব্যর্থ হয়। সাম্রাজ্যবাদ প্রাচ্যে চাপিয়ে দিতে পাইকারিভাবে বিদেশী সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম ও কাঠামো রফতানির ব্যবস্থা করে। সাধারণত এসব বিদেশী সামগ্রী আগের সভ্যতার ওপর সফলভাবে স্থাপিত হয় না। মুসলিম সমাজগুলোকে এখনো বিদেশী আধিপত্যের ভূত তাড়া করে ফিরছে, যদিও ওই আধিপত্য আজ আর সনাতনী উপনিবেশ আকারে নেই।

ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যিক পরিচালনা কাঠামো শাসকজাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রণীত, উপনিবেশের ব্যাপকভিত্তিক জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজনের আলোকে ওই কাঠামো তৈরি করা হয় না। নিযুক্ত দেশীয় শাসকদের সামান্যই স্বাধীনতা থাকত, তাদের বসানো হতো শাসকদের স্বার্থের দিকে চোখ রাখতে এবং সুরক্ষিত করতে।

উপনিবেশ শাসনে আলেমদের মর্যাদা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়। সরকার পরিচালনা, বিশেষ করে আইনি ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে পড়ে দুর্বল, সীমিত কিংবা বিলুপ্ত। আলেমদের সাধারণভাবে ব্যক্তি ও পারিবারিক আইনের মতো তুলনামূলক ছোটখাটো বিষয় তদারকির কাজে নামিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু আলেমদের পরিচালনা ও আইনি প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে দেয়াটা সমসাময়িক পরিস্থিতিতে ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিবর্তন ও আধুনিক হওয়ার সামর্থ্য অর্জনের পথে একটি মারাত্মক আঘাত বিবেচিত হয়। শাসনকাজের স্থানীয় ঐতিহ্য পূর্ণাঙ্গভাবে বিবর্তিত হতে পারেনি, আর দৈনন্দিন পরিচালনা কার্যক্রমপ্রক্রিয়া থেকে অপসারিত হওয়ার পর ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে, উন্নয়নশীল সমাজের চাহিদার সাথে আর তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। এটা শাসন পরিচালনার ঐতিহ্যবাহী একটা পুরো শ্রেণীকে পেছনে ফেলে দেয়, যা স্বাধীনতার পর দেশের মধ্যেই নতুন ক্ষমতা সম্পর্ক খোঁজার সংগ্রাম চালানোর প্রেক্ষাপটে পরে ক্ষোভের একটি উৎসে পরিণত হয়।

সাংস্কৃতিক ফলাফলের দিক থেকে আলজেরিয়ান উদাহরণটি বিশেষভাবে মর্মান্তিক। আলজেরিয়াকে একসময় ফ্রান্স আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের মধ্যে শামিল করে নিয়েছিল এবং এর পছন্দনীয় স্থানগুলোতে লাখ লাখ ইউরোপিয়ান বসতি স্থাপন করেছিল। উপনিবেশ কর্তৃপক্ষের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত একটি পুরো নতুন ফরাসিভাষী প্রশাসনিক এবং কর্তৃত্বপরায়ণ এলিট আলজেরিয়ানের আবির্ভাব ঘটে। তাদের নিজস্ব বিশ্ববীক্ষা ফরাসি সংস্কৃতির বিপুল উপাদান আত্মস্থ করে ধীরে ধীরে দেশটির আরব উৎস থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এই এলিট শ্রেণী চূড়ান্তভাবে অনিবার্য অংশ হিসেবে থাকা সামাজিক টাইমবোমায় পরিণত হয়। নীতিগতভাবে অধিকতর প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিকভাবে উন্নত ফরাসি সমাজ থেকে এ ধরনের সভ্যতা-সংশ্লিষ্ট উপাদান গ্রহণ আলজেরিয়ার জন্য কল্যাণমূলক হওয়ার কথা। কিন্তু আট বছর স্থায়ী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ফরাসি-ভাবাপন্ন এলিটরা নিজেদের ভয়াবহ ধরনের পরস্পর বিপরীতমুখী দোলাচলে দুলতে থাকে : তারা কি বেশি ফরাসি নাকি আলজেরিয়ান? আরো বড় প্রশ্নেরও উদয় হয় : দেশের এলিটদের বাকি জনগোষ্ঠীর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো ভাষায় শিক্ষিত করা কি সমাজসেবা? এলিট ও বাকি জনসমষ্টির মধ্যে সাংস্কৃতিক ব্যবধান সৃষ্টি করার জন্য ভাষাগত ব্যবধান স্থায়ী করা হলে তা স্থানীয় আরবি ভাষায় শিক্ষিত ভূমিপুত্র অংশ থেকে আসা নতুন এলিটদের উদ্ভব ঘটার ক্ষেত্রে ভয়াবহ রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্ঘাতের সৃষ্টি করবে এবং ক্ষমতার সংগ্রামে পুরনো ফরাসিভাষী এলিটদের মুখোমুখি করবে। সে ক্ষেত্রে ভাষা এবং এমনকি সংস্কৃতিও ঐক্য সৃষ্টিকারী উপাদান না হয়ে বিভক্তি সৃষ্টিকারী বিষয়ে পরিণত হয়। আলজেরিয়ার সমসাময়িক রাজনৈতিক যন্ত্রণায় এসব ইস্যুর এখনো সমাধান হয়নি।

উনিশ শতকে উসমানিয়া সাম্রাজ্যই মূলত ইউরোপিয়ান দখলদারিত্বের মুখে তার সার্বভৌমত্বের নির্যাস সুরক্ষিত রাখতে পেরেছিল। ঠিক এই জায়গাতেই তুর্কি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যকার বিবর্তনের একটি সহজাত প্রক্রিয়ায় থাকা রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিতর্ক হওয়াটা তাই বিস্ময়কর ছিল না। ঠিক এ কারণেই কিছুটা হোঁচট খেলেও মুসলিম বিশ্বের প্রায় যেকোনো স্থানের চেয়ে তুর্কি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক বেশি স্থিতিশীল, অনেক বেশি 'সমাজসংশ্লিষ্ট'।

অবশ্য অনান্য স্থানে ইউরোপিয়ান উপনিবেশ শাসন অনিবার্যভাবেই উন্নয়নশীল সমাজের মধ্যে ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলোর যেকোনো ধরনের সম্ভাব্য পূর্ণাঙ্গ বিবর্তন স্থগিত করে দিয়েছিল। আজকের অনেক ইসলামি প্রতিষ্ঠান কেন এত অনমনীয়, নিঃসার ও ক্ষয়কারী প্রকৃতির তার এটাই একটি প্রধান ব্যাখ্যা। এসব প্রতিষ্ঠান এখন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিবর্তনে প্রতিবন্ধকতামূলক ভূমিকা পালন করছে, ঐতিহ্যবাহী ও পাশ্চাত্য ঘরানার ব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক আবেগময় সঙ্ঘাত সৃষ্টি করছে। একটি কড়া বক্তব্য দেয়া যেতে পারে, রাষ্ট্রের মধ্যে ইসলামের 'স্বাভাবিক' বিবর্তন বন্ধ করে দেয়ার ফলে মুসলিম বিশ্বজুড়ে বিপজ্জনক উত্তেজনার সৃষ্টি করা হয়েছে, ইসলামি আন্দোলনগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান হারে চরমপন্থার জন্য ব্যবহার্য উপাদান সরবরাহ করছে।

একই কথা প্রযোজ্য উপনিবেশ শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে : ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা বহুলাংশে পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। এর ফলে আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কার্যক্রম বিবর্তনমূলক পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাভাবিক পন্থায় সামাজিক চাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নির্মূল করে দেয়া হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, রুশ সাম্রাজ্যে ককেশাস ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম জনসমষ্টির কাছে পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জের ফলে তথাকথিত জাদিদবাদী বা পুনর্জীবন আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কারের দৃঢ় স্থানীয় প্রয়াসের সূচনা করেছিল। উসমানিয়া সাম্রাজ্যেও নানা সংস্কারমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নতি সাধন করা হয়েছিল।

সাম্রাজ্যিক উদ্যোগ থেকে উপনিবেশ অবসানে

আজকের মুসলমানদের কাছে পাশ্চাত্যের অনধিকারমূলক ও নব্য সাম্রাজ্যিক নীতি থেকে উদ্ভূত কয়েকটি বিষয় স্বাধীনতার চেয়েও বেশি আলোড়িত করছে। যুক্তরাষ্ট্রে 'নব্য সাম্রাজ্যিক' পরিভাষাটিতে এক ধরনের মার্কসবাদী প্রতিধ্বনি থাকায় অনেকে কোনো চিন্তাভাবনা করা ছাড়াই এটাকে মতাদর্শগত কচকচানি হিসেবে বাতিল করে দেয়। অন্যরা 'আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ' পরিভাষাটিতে বিশেষভাবে অপমানিত হয়, যদিও গত কয়েক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে সৃষ্ট ধারণা নিয়ে অনেক গ্রন্থ ও সমীক্ষা হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের সময় মার্কসবাদী, কমিউনিস্ট ও তৃতীয় বিশ্বে এসব পরিভাষা ব্যাপকভাবেই ব্যবহৃত হতো। যদিও কমিউনিস্টদের পরিভাষাটি গ্রহণ করার ফলে তা অকার্যকর হয়ে যায় না : পাশ্চাত্য অন্তত ৪০০ বছর ধরে বিপুল মুনাফা ও তুলনামূলক দায়মুক্তি নিয়ে অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর আধিপত্য প্রয়োগ করে আসছে। আজ যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের হিসেবেই কোনো না কোনোভাবে তার ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়ার সঙ্কল্প নিয়ে প্রায় সব ক্ষেত্রেই সারা বিশ্বের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে। এ ধরনটিকে অনেকে বলে কর্তৃত্ব বা সাম্রাজ্যিক শক্তি। অনেক নব্য রক্ষণশীল চিন্তাবিদ এমনকি প্রকাশ্যেই আমেরিকান সাম্রাজ্যের ধারণাটি গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু নাম যা-ই হোক না কেন, এটা যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, সেটাই আসল বিষয়।

'সাম্রাজ্যবাদ' পরিভাষাটি তেমন বেঠিক মনে হয় না : এমনকি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের যুগ আনুষ্ঠানিকভাবে অবসান হওয়ার পরও বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে আধুনিক যুগে নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ চালু হয়েছে। এর সূচনা ঘটে বেশির ভাগ দেশে সদ্য স্বাধীন সরকারগুলোর ওপর আধিপত্য চালাতে ব্রিটিশদের নমনীয় প্রকৃতির শাসকদের বাছাই করার মাধ্যমে। এসব শাসকের কাছে প্রত্যাশা করা হয় তারা পাশ্চাত্য প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারের প্রতি সাড়া দেবে, এমনকি তাদের নিজ জনগণের কাছ থেকে সমর্থন না থাকলেও। পাশ্চাত্যপন্থী সরকার এবং তাদের জনগণের মধ্যে উত্তেজনা ব্রেকিং পয়েন্টে পৌঁছে যাওয়ার পরই ইরান, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে বিপ্লব ঘটেছে। একই কারণে মিসর, আলজেরিয়া, লিবিয়া, জর্ডান, সিরিয়া, ইরাক ও ইয়েমেনে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এর পর থেকে আরব বিশ্ব এবং অন্যান্য স্থানে যে নেতাদের পাশ্চাত্য সমর্থন দিয়ে আসছে, তারা নির্বাচিত নয় এবং স্থানীয় জনগণের কাছে অজনপ্রিয় পশ্চিমাপন্থী নীতিমালা অনুসরণ করে আসছে।

মুসলিম বিশ্বে দু'টি কারণে নব্য সাম্রাজ্যবাদ শক্তিশালী রয়ে গেছে : মুসলিম বিশ্বের বেশির ভাগ এলাকা বিপুল ভূকৌশলগত গুরুত্ব বহন করে জ্বালানি সম্পদ ও পরিবহন রুটের কারণে এবং আরো নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, এটা এখনো ওই শেষ এলাকা রয়ে গেছে যেখানে দুর্বল ও নমনীয় স্বৈরতন্ত্র শাসন চালাচ্ছে। প্রত্যক্ষ ধরনের বিদেশী শাসন অনেক আগেই মøান হয়ে পড়লেও এসব দেশে প্রেসার পয়েন্ট হিসেবে বিপুল অর্থনৈতিক ভর্তুকিসহ (বিশেষ করে মিসরের ক্ষেত্রে), বিশ্বব্যাংক থেকে মার্কিন নিয়ন্ত্রিত ঋণ কৌশলের ব্যবহার, সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি, কূটনৈতিক সমর্থন, সামরিক ঘাঁটির উপস্থিতি, নিয়মিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, আঞ্চলিক নীতির হিসাবি প্রয়োগ, সামরিক হুমকি, মানবাধিকার ও নাগরিক মুক্তির লঙ্ঘন নিয়ে প্রায় নীরব থাকার আধুনিক কৌশলগুলো অনুসরণ করা হয়।

এসব নীতির সবই চূড়ান্ত পর্যায়ে হীতে বিপরীত হয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে ক্ষোভ উসকে দিচ্ছে, তাদের শাসকদের মর্যাদা হ্রাস করছে, স্থানীয় চরমপন্থা ও সহিংসতা বেগবান হচ্ছে। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের চেয়ে মধ্যপ্রাচ্যে এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপমূলক নীতি মধ্যপ্রাচ্যে রুঢ় আকারে প্রয়োগ করা হয়েছে। আর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটা তার শিকড় আরো সম্প্রসারিত ও গভীর করায় আবেগ টগবগ করে ফুটছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন করে তুলছে।

সাম্রাজ্যিকবিরোধী বিদ্রোহ

বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রাম মুসলিম বিশ্বে এসেছে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসের বিস্ময়কর রকমের দেরিতে। পেছনে তাকালে দেখা যাবে, আমেরিকার দেশগুলো প্রথমে তাদের ইউরোপিয়ান প্রভু ব্রিটেন, স্পেন ও পর্তুগালের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। তবে এসব বিদ্রোহ কিন্তু ইউরোপিয়ান উপনিবেশ শাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণের সংগ্রামের প্রতিনিধিত্বশীল ছিল না। বরং ইউরোপিয়ান উপনিবেশকারীরা তাদের শাসকদের প্রবল নিয়ন্ত্রণমূলক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, যা বিশ্বের অন্যান্য স্থানে উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের চেয়ে বেশ ভিন্ন।

উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি আসলে আবির্ভূত হয়েছিল ১৯ শতকে মুসলিম উসমানিয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বলকানে অনেক খ্রিষ্টান বিদ্রোহে। তাদের সাফল্যের অন্যতম উৎস ছিল ইউরোপিয়ান শক্তিগুলো ও রাশিয়ার সমর্থন। উসমানিয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও আকার হ্রাস করার জন্য এসব দেশ অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম চালিয়ে অঞ্চলটিতে নতুন নতুন অনুসারী পাওয়ার জন্য খ্রিষ্টান বিদ্রোহে সমর্থন দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। এসব বিদ্রোহে খ্রিষ্টান বৈশিষ্ট্য উসমানিয়া শাসনের অধীনে থাকা মুসলিম জনসমষ্টির মৌলিক আনুগত্যের চেয়ে তীব্র বিপরীত ছিল। মুসলমানেরা তখনো নিজেদের বৈধ বহুজাতিক ইসলামি সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে তার প্রতি তাদের মৌলিক আনুগত্য প্রকাশ করে যাচ্ছিল, সাম্রাজ্যের নির্দিষ্ট কোনো স্থানীয় নীতির প্রতি বিশেষ ক্ষোভ যতই থাকুক না কেন; এর ফলে বিদ্রোহে খ্রিষ্টান সংখ্যালঘুদের সংবেদনশীলতা, বিশেষ করে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আনুগত্য প্রশ্নে মুসলিম শাসকদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। বস্তুত দেড় শ' বছর আগে মুসলিম নেতারা উসমানিয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উসকে দেয়ার জন্য কিছুটা নির্ভুলভাবে খ্রিষ্টধর্মের রক্তাক্ত সীমান্তের কথা বলতে পারতেন। উসমানিয়া সাম্রাজ্য প্রায়ই স্থানীয় মুসলিম বিদ্রোহের মুখেও পড়ত, তবে তা ছিল অনেক বেশি সীমিত।

আরব বিশ্বের বেশির ভাগের কাছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানিয়া সাম্রাজ্যের পতনের মানে কোনোভাবেই স্বাধীনতা বিবেচিত হয়নি। অভূতপূর্ব ঘটনায় যুদ্ধের পরপরই ইউরোপিয়ান শক্তিগুলো দ্রুততার সাথে বেশির ভাগ আরব দেশকে তাদের ম্যান্ডেট হিসেবে গ্রহণ করে সাম্রাজ্যিক আধিপত্যে

নিয়ে নেয়। অর্থাৎ ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সফল বিদ্রোহ সংগঠিত হয় অনেক দেরিতে, ২০ শতকে। (একটি বড় ধরনের ব্যতিক্রম ছিল ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত ভারতীয় সিপাহি বিদ্রোহে ব্যাপকসংখ্যক মুসলিম সম্পৃক্ততা এবং আফগানদের তাদের দেশ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক উদ্যোগ ভণ্ডুল করে দেয়া।) প্রথম মুসলিম দেশ হিসেবে কিছুটা স্বাধীনতা পায় আফগানিস্তান, ১৯১৯ সালে। পরে আসে ইরাক, তবে তারা ১৯৩২ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে ন্যূনতম স্বাধীনতা পেয়েছিল; ব্রিটিশরা পরোক্ষ শাসন এবং একটি অজনপ্রিয় সামরিক উপস্থিতির মাধ্যমে সেখানে আরো ২৬ বছর ইরাকি সরকার ও এর নীতির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিল। বেশির ভাগ মুসলিম দেশ সীমিত বা ন্যূনতম পর্যায়ের স্বাধীনতা পেয়েছিল প্রধানত পাশ্চাত্য-নির্বাচিত অনুগত শাসকদের মাধ্যমে এবং সেটাও কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। বাস্তবতা হলো, বিপুলসংখ্যক মুসলিম দেশ তুলনামূলকভাবে অনেক দেরিতে স্বাধীনতা অর্জন করায় আজকের মুসলিমদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার সাথে এত অপরিমার্জিত আবেগ সম্পৃক্ত থাকতে পারছে। ইতোমধ্যে নব্য সাম্রাজ্যিক পাশ্চাত্য রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এখনো বেশ ব্যাপকভাবেই অব্যাহত রয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইসলাম না জাতীয়তাবাদ

বিদেশী আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সব সংস্কৃতিরই মৌলিক প্রবৃত্তি। আর মুসলিম বিশ্বের ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী উপনিবেশ শক্তিগুলো তাদের প্রজাদের থেকে কেবল জাতিগতভাবেই ভিন্ন নয়, ধর্মীয়ভাবেও আলাদা : কোনো উপনিবেশকারী খ্রিষ্টান পাশ্চাত্য মুসলিম প্রাচ্য বা কোনো হিন্দু ভারত বা কোনো কনফুসিয়ান বা বৌদ্ধ চীনের ওপর জয় লাভ করেছে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যিক বিদেশীদের সাথে জাতিগত পার্থক্যের পাশাপাশি ধর্মীয় ব্যবধানের ওপরও জোর দেয়। ধর্ম কেন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভেদ রেখা এবং সেই সাথে জাতিগত প্রতিরোধ সংগ্রামকে পবিত্র করার কাজ হিসেবে ব্যবহৃত হবে না। আর একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোতে প্রত্যাদেশ বৈশিষ্ট্যে ধর্মতাত্ত্বিক নিশ্চয়তা থাকায় জাতীয়তাবাদের সাথে মিশে সবচেয়ে কার্যকরী ধর্মীয় শক্তিতে পরিণত হয়।

বস্তুত উচ্চতর শক্তির কাছে আবেদন থাকায় ধর্ম অনেক সময়ই কেবল জাতিগত শক্তির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর সংহতি প্রকাশক শক্তি হয়ে থাকে, অন্তত গোষ্ঠীগত রক্তের বন্ধন সেটাকে অতিক্রম না করা পর্যন্ত। ফলে সাম্রাজ্যবিরোধী সংগ্রামে ইসলামের নিয়মিতভাবে উদ্বুদ্ধ করা মোটেই বিস্ময়কর নয়। তবে বিষয়টি উপনিবেশবিরোধী প্রতিরোধ, ধর্মীয় যুদ্ধ নয়। বিষয়টি দৃঢ় অন্তর্বর্তী ধর্মীয় আন্দোলন নয়, বরং দেশ থেকে দেশের জাতিভিত্তিক সংগ্রাম। আমাদের এটাও ভুলে যাওয়া উচিত নয়, মুসলমানদের উপনিবেশবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম বিস্তৃত, বৈশ্বিক উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের অংশবিশেষ, যাতে শামিল রয়েছে ইউরোপের আধিপত্যবিরোধী খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, কনফুসীয় এবং আরো অনেকে।

মুসলিম বিশ্বে সাম্রাজ্যিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো সুফি গ্র“পগুলো। সুফি ভ্রাতৃত্ববোধ সাধারণভাবে ইসলামের অনেক বেশি শান্ত, মরমি দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পরিচিত হলেও তারা ঐতিহ্যগতভাবে সমাজের সবচেয়ে সঙ্ঘবদ্ধ এবং সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে যুক্ত গ্রুপগুলোর অন্যতম। তারা চরম নিপীড়নমূলক সময়ে ইসলামি সংস্কৃতি ও চর্চা লালন এবং বিদেশী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জোরদার করা এবং গেরিলা যুদ্ধকৌশলের জন্য রেডিমেড সংস্থা (আপনি চাইলে তাদেরকে

সমাজভিত্তিক এনজিও বলতে পারেন) গঠন করে। অনেক মুক্তি সংগ্রামে সুফি অংশগ্রহণের ইতিহাস দীর্ঘ এবং তা এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকাজুড়ে বিস্তৃত। সুফি গ্র"পগুলো আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী এবং পরে আমেরিকাবিরোধী এবং ইরাকে মার্কিন দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু ইসলামকে প্রতিরোধের উৎস বিবেচনা করা হবে ভুল। কারণ সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো বিশ্বাস করব, এই মুসলমানেরা যদি মুসলমান না হতো, তবে তারা বিদেশী আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত না।

পাশ্চাত্যে নিজের ঘরেই, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩০-এর দশকের শুরু থেকে পুরো কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম আন্দোলন শ্বেতাঙ্গ নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান সামাজিক ব্যবধান তীব্রভাবে তুলে ধরতে পরিকল্পিতভাবে ধর্মের ব্যবহার করে। ২০ শতকের শুরুর দিকে এলিজা মোহাম্মদ এবং পরে ম্যালকম এক্সের নেতৃত্বাধীন আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদী নেতারা তাদের আফ্রিকান মূলের অনেক কাছাকাছি হিসেবে অভিহিত ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে ক্রীতদাসসুলভ মানসিকতা ঝেড়ে ফেলার জন্য আফ্রিকান-আমেরিকানদের প্রতি আহ্বান জানায়। আফ্রিকান-আমেরিকানরা ইতোমধ্যেই বর্ণের কারণে শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা হয়ে ছিল; এলিজা মোহাম্মদ তখন পৃথক ধর্মীয় পরিচিতি উচ্চকিত করে সংগ্রামকে জোরদার করতে চাইলেন।

এ দিকে, পাশ্চাত্যও ইসলামি আন্দোলনগুলোকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে কখনো পিছপা হয়নি। স্নায়ুযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে মস্কোর বিরুদ্ধে সম্ভাবনাময় ব্যবহারযোগ্য সোভিয়েত শক্তির নাজুক অংশ বিবেচনা করত যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিনপন্থী স্বৈরাচারীদের সাথে আঁতাত গড়ে ওয়াশিংটন অনেক দেশে প্রায়ই স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে ইসলামপন্থীদের উৎসাহিত করত। এর সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হলো আফগানিস্তানে মুজাহিদিনদের প্রতি মার্কিন সমর্থন। ১৯৮০-এর দশকে সোভিয়েত দখলদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান তাদেরকে আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা পিতাদের নৈতিক সমতুল্য হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বহিরাগত সাম্রাজ্যিক উদ্যোগগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলনে মুসলমানদের বিপুল বহিরাগত সমর্থনের প্রয়োজন হতো না।

মুসলিম পরিচিতির সম্প্রসারণশীল ভূমিকা কেন?

প্রতিটি ব্যক্তি অনেক পরিচিতি বহন করে : পরিবার, বংশ, অঞ্চল, নৃগোষ্ঠী, জাতীয়তা, জেন্ডার, ভাষা, শ্রেণী, আয়, পেশা, সমর্থক। এই নানা পরিচিতি পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে, আসে-যায়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করে : শাস্ত্রীয়, অনুষ্ঠান, উদযাপন ও সাপোর্ট নেটওয়ার্কে পরিবার আর বংশ প্রাধান্য পায়; নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক পরিচিতি; সামরিক সার্ভিসের সময় জাতীয় পরিচিতি; ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে ধর্মীয় পরিচিতি; পেশাগত কার্যক্রম ও অ্যাসোসিয়েশনের সময় পেশাগত পরিচিতি; নারী বা পুরুষের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট বিপরীত জেন্ডার; বৈষম্য মোকাবেলার সময় পারিবারিক পরিচিতি। অর্থনৈতিক কঠিন অবস্থা ও সামষ্টিক (মালিক-শ্রমিক) দরকষাকষির সময় শ্রেণী সংহতি অল্পতেই জাতিগত অবস্থান অতিক্রম করতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে পরিচিতি প্রতিক্রিয়া আলাদা আলাদা হতে পারে।

১৯২০ সালে উদার বার্লিনে কোনো ইহুদিকে তার পরিচিতি জিজ্ঞাসা করলে তিনি হয়তো জবাব দিতেন এই ধারাবাহিকতায় : 'জার্মান, জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক, সোস্যালিস্ট, ইহুদি।' এর ১৫ বছর পর নাৎসি আমলে ইহুদি পরিচিতি জীবন বা মৃত্যুর মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় সেটাই সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পেত। মার্কিন দখলদারিত্বের সময় শিয়া বাগদাদের কোনো এলাকায় কোনো ইরাকি সুন্নির কাছে তার সুন্নি পরিচিতিটি হয়তো জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারে পরিণত হয়, সেখানে ইরাকি পরিচিতিটার গুরুত্ব থাকে সামান্যই। ২০০১ সালে বসনিয়ায় ধর্মীয় পরিচিতিটাই ছিল একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এমনকি প্রত্যেকের রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড ও ভাষা সত্যিকার অর্থে অভিন্ন থাকলেও। অথচ এর মাত্র ১০ বছর আগে টিটোর যুগোস্লাভিয়াতে ধর্মীয় পরিচিতিটির তেমন কোনো তাৎপর্যই ছিল না।

পুরো মুসলিম বিশ্ব যখন নিজেদের অবরোধের মুখে মনে করে, তখন প্রায়ই মুসলিম পরিচিতিটিই বেশির ভাগ মুসলিমের কাছে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। মালয়েশিয়ার মুসলিমরা টিভিতে দেখে ফিলিস্তিনিদের হত্যা করা হচ্ছে, কাশ্মিরিরা দেখে চেচেনদের, নাইজেরিয়ানরা দেখে ইরাকিদের, আফগানরা দেখে সোমালিদের। সহিংসতা এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধে যখন সম্প্রদায় প্রাধান্য পায়, তখন অন্যান্য পরিচিতি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। তবে এটা স্বাভাবিক বিষয় নয়। মূলত কঠিন পরিস্থিতিতেই অন্যান্য পরিচিতি উপাদানের বিপরীতে মুসলিম পরিচিতি অতিরিক্ত প্রাধান্য পায়। ইসলাম তখন সম্প্রসারিত ও আন্তর্জাতিক সংহতির মূলমন্ত্রে পরিণত হয়। তবে বাস্তবে বেশির ভাগ সংগ্রামই

আঞ্চলিক ও জাতিগত। পাশ্চাত্য নীতির একটি প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এসব অঞ্চলকে শান্ত হওয়ার সুযোগ দেয়া, জীবনযাপনকে অনেক বেশি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে দেয়া, বিদেশী সামরিক বাহিনীর প্ররোচনা সৃষ্টিকারী উপস্থিতি থেকে মুক্ত করা। এতে করে পরিচিতির মুসলিম উপাদানগুলোর গুরুত্ব কমে ব্যক্তিজীবনের অনেক প্রতিযোগী বৈশিষ্ট্যের একটিতে পরিণত হয়ে প্রথাগত বিষয়ে পরিণত হবে। এতে করে জীবনের বেশির ভাগ সময় মুসলিমরা নিজেদের স্রেফ মুসলিম না ভেবে আরো অনেক কিছু ভাবার অবকাশ পাবে।

সম্প্রদায় যখন অন্যদের থেকে নিজেদের রক্ষা করতে বাধ্য হয়, তখন তারা বহিরাগতদের বিরুদ্ধে অভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে। ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই আমাদেরকে আজকের ইসলামি পরিচিতিকে দেখতে হবে। ৫০ বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যে ঐক্যবদ্ধকারী মূলমন্ত্র হিসেবে ইসলামের চেয়ে অনেক বড় অবস্থানে ছিল জাতীয়তাবাদ। যদিও বর্তমানে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম হওয়ার তাৎপর্যটা ইতিহাসের অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে। বহিরাগত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গণসমর্থন কামনাকারী মুসলিমরা যে ব্যানারে বেশি লোককে সবচেয়ে কার্যকরভাবে ঐক্যবদ্ধ করবে, সেটাই বেছে নেবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আরবেরা যখন শেষ পর্যন্ত বহুজাতিক উসমানিয়া সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে এলো, তখন ওই ঘটনায় নিশ্চিতভাবেই ইসলামের কোনো ভূমিকা ছিল না; সেটা ছিল সর্বোপরি মুসলিম বনাম মুসলিম সংগ্রাম। সংঘর্ষ যখন আরব বনাম তুর্কি হয়, তখন কেবল জাতিগত অবস্থানই হয় প্রধান মন্ত্র, ইসলাম নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইউরোপিয়ান হস্তক্ষেপ ও নব্য-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ভিত্তি হিসেবে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে মিসরের জামাল আবদুন নাসেরের আমলে আরব বিশ্বে জাতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদ প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত দুর্বলতার মুখে শক্তি হিসেবে জাতীয়তাবাদ কলঙ্কিত হয়ে পড়লে ইসলামি পরিচিতি তার স্থান অধিকার করে, ওই পর্যায়টি এখনো শেষ হয়নি।

১৯ ও ২০ শতকে জাতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের আতঙ্ক প্রত্যক্ষ করার পর আমরা বেশ ভালোভাবেই জিজ্ঞাসা করতে পারি, সীমান্ত সৃষ্টির জন্য জাতিগত পরিচয়টাই সবচেয়ে বিজ্ঞজনোচিত ভিত্তি কি না। নাকি সামাজিক সংস্থার আকারে কোনো ধরনের বহুজাতিক-ব্যবস্থা 'আরো উন্নত' বিন্যাস হতে পারে? যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মতো অভিবাসী সমাজগুলো নিশ্চিতভাবেই এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছে, বহুজাতিক-ব্যবস্থা জাতিভিত্তিক ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে। অবশ্য ওই সব অভিবাসী রাষ্ট্রের হাতে তখন বিকল্প ছিল অতি সামান্যই।

মুসলিম বিশ্বে এমন কোনো স্থির বিশ্বাস নেই যে, জাতিগত পরিচিতি অনিবার্যভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্থার জন্য সর্বোত্তম ভিত্তির ব্যবস্থা করতে পারে। ইসলাম নিজেই জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সঙ্কীর্ণ ও বিভক্তিসূচক হিসেবে সহজাতভাবে ঘৃণ্যভরে প্রত্যাখ্যান করেছে, এমনকি যদিও ওই পার্থক্য বেড়ে উঠতে থাকার কথাটি স্বীকার করেও। 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের পুরুষ ও স্ত্রী হিসেবে

সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের জাতি ও গোত্র হিসেবে তৈরি করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। (পবিত্র কুরআন ৪৯:১৩)। ইসলামের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ধর্মের ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করাই উত্তম, কারণ এটা মানবজাতির বৃহত্তর পরিমণ্ডলকে গ্রহণ করে এবং মুসলিম হতে ইচ্ছা পোষণকারী কাউকেই এটা থেকে দূরে রাখা হয় না। এ কারণে কোনো নির্দিষ্ট জাতীয়তাভিত্তিক সংহতির ধারণার চেয়ে ইসলামকে কেন্দ্র করে সংহতি কামনা করার গুরুত্ব অনেক বেশি। আর সংহতির মূলমন্ত্র হিসেবে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে ইসলাম খুবই কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে।

অনেক ইসলামপন্থী তা-ই আরব জাতীয়তাবাদ ধারণাটির প্রতি বৈরী। তারা মনে করে, 'জাতীয়তাবাদের' মূল ধারণাটিই বিধ্বংসী এবং নিশ্চিতভাবেই পাশ্চাত্যের সৃষ্টি। বস্তুত, তাদের সবচেয়ে ভয়াবহ ভীতিটি দেখা গেছে তুরস্কের ক্ষেত্রে। উসমানিয়া সাম্রাজ্যের উত্তরসূরি আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক নতুন তুর্কি জাতীয়তাবাদে ইসলামি শক্তির সব স্বতন্ত্র হাতিয়ার প্রায় পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন, তুরস্কের মুসলিম প্রতিবেশীদের প্রতি এবং সাধারণভাবে ইসলামের প্রতি বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের কাছে আরো খারাপ বিষয় ছিল, তিনি সুন্নি মুসলিমদের ইসলামের আলঙ্কারিক নেতা হিসেবে থাকা খিলাফতের মূল পদবিটিই বিলুপ্ত করেন, ঠিক একই রকমভাবে ইতালির এক প্রধানমন্ত্রী পোপের পদটি বিলোপের সিদ্ধান্ত নিতে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদী বিভক্তিতে বিভক্ত ইসলামি বিশ্বকে হস্তক্ষেপবাদী পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে শক্তিহীন বিবেচনা করা হয়।

অর্থাৎ এই বিবেচনায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধকে ব্যাপকভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের যুদ্ধ মনে হওয়ায় ইসলামের ভূমিকাকে বাড়িয়ে দেখানোর এবং মুসলিম সংহতিকে অস্বাভাবিক স্তরে ঠেলে দেয়ার নিশ্চয়তা তৈরি হয়।

মুসলিমদের জন্য সাম্রাজ্যবাদের দুঃখদায়ক কৃতকর্ম

উপনিবেশ শক্তির স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে এবং সেই সাথে তাদের সুনির্দিষ্ট জাতীয় প্রয়োজন মেটানো কিংবা অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জের ধরে সীমান্ত পুনর্নির্ধারণটা ছিল উপনিবেশ শক্তির সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয়গুলোর অন্যতম। জাতিগত গ্রুপগুলোকে প্রায়ই বিভক্ত করা হয়েছে, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাভাবিক মেলামেশার ধারাটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে, নতুন প্রশাসনের বিচারবুদ্ধিহীন রেখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আরবদের হাতেই যদি সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যবস্থা থাকত তবে সম্ভবত বর্তমানে অনেক কম আরব রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকত : আমরা হয়তো আজকেও বর্তমানের সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান ও ফিলিস্তিনকে নিয়ে বৃহত্তর সিরিয়ার মতো ঐতিহাসিকভাবে পরিচিত অঞ্চল দেখতে পেতাম। নব্য সৃষ্ট এসব কৃত্রিম দেশ শাসন করা, বিশেষ করে তথাকথিত স্বাধীনতার পর, আরব নেতাদের জন্য আরো বেশি সমস্যামূলক মনে হতে থাকে। পুনঃসংযুক্তির লক্ষ্যে বিভক্ত লোকজনের জাতিগত সংগ্রাম ও হস্তক্ষেপের প্রেক্ষাপটে নবসৃষ্ট রাষ্ট্রগুলোর প্রতি 'আনুগত্য' ছিল কৃত্রিম, সীমান্ত বিরোধগুলো ছিল স্বাভাবিক পরিণতি। অনেক সময় মূলত হাজার হাজার মাইল দূরে থাকা রাষ্ট্রগুলোর সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনের আলোকে রাজনৈতিক ঘটনা সৃষ্টি হতো।

রাষ্ট্রের নিজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের চেয়ে উপনিবেশ শক্তির চাহিদার আলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশন করা হয়। উপনিবেশ রাষ্ট্রগুলো নিঃসন্দেহে তাদের বেশির ভাগ উপনিবেশে অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করে, তবে সেগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়; আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আফ্রিকার রেলওয়েগুলো খনিজসম্পদকে আফ্রিকার উপকূলের গুদামঘরে পরিবহনের জন্য তৈরি করা হয়েছে, এক দেশকে অপর দেশের সাথে জুড়ে দিতে নির্মাণের ঘটনা বিরল। আর সাংস্কৃতিক দিক থেকে, উপনিবেশ শক্তিগুলো এসব উপনিবেশে নতুন, স্বেচ্ছাচারী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য স্থায়ী করে দেয়, অন্যদের বিপরীতে নির্দিষ্ট কোনো জাতিগোষ্ঠী ও ভাষাকে আনুকূল্য দেয়, অনেক সময় উপনিবেশিক শক্তির নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে। এগুলো বিধ্বংসী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক টাইম বোমায় পরিণত হয়ে অব্যাহতভাবে বিস্ফোরিত হতে থাকে, অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা সৃষ্টি করতে থাকে, যা মীমাংসিত হতে নেবে দীর্ঘ সময়।

বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ, নোবেল পুরস্কারজয়ী যোশেফ স্টিগলিৎজ সমস্যাটি এভাবে তুলে ধরেছেন :

উপনিবেশবাদ উন্নয়নশীল বিশ্বে মিশ্র প্রভাব ফেলে গেছে- তবে একটি স্পষ্ট ফল হলো জনগণের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি যে, তারা নির্মমভাবে শোষিত হয়েছে।... দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক উপনিবেশে আসা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদের অবসান ঘটায়নি। আফ্রিকার মতো অনেক অঞ্চলে শোষণ-প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং পরিবেশের ধ্বংস করা হচ্ছে অতি সামান্য মূল্যে- ছিল সুস্পষ্ট। অন্যান্য স্থানে তা হয়েছে অনেক সূক্ষ্মভাবে। বিশ্বের অনেক স্থানে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) এবং বিশ্বব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো উপনিবেশ-পরবর্তী নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখার হাতিয়ারে পর্যবেশিত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান ঠেলে দেয় বাজার মৌলবাদে (মাঝে মাঝে একে বলা হয় 'নব্য-উদারবাদ) আমেরিকানরা এই ধারণাকে 'মুক্ত ও অবাধ বাজারের' আদর্শ হিসেবে প্রচার করে থাকে।... মুক্তবাজার আদর্শ নতুন ধরনের শোষণের অজুহাতে পরিণত হয়।

সর্বোপরি, মুসলিম বিশ্বের তেল ও জ্বালানি সম্পদ বিরামহীন পাশ্চাত্য হস্তক্ষেপের প্রধান কারণ। তেলের সেরা চুক্তি, রাজনৈতিক ও সশস্ত্র হস্তক্ষেপের জন্য তেলের মালিকানা, তেল কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণ, মূল্য নির্ধারণ নীতি ও মূল্য বণ্টন, নেতাদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার থাকে তাদের উদ্দেশ্য। ইরানি তেলের জাতীয়করণের উদ্যোগ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ১৯৫৮ সালে ইরানের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে উৎখাত করে। তেল রাজনীতি এখনো উচ্চ-ঝুঁকির খেলা হিসেবে রয়ে গেছে, মুসলিম বিশ্ব এবং এর বাইরের মাটিতে তা নিয়ে পরাশক্তিগুলো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

উপনিবেশবিরোধী চরমপন্থা ও ইসলাম

সাম্রাজ্যবাদ একেবারে সবসময়ই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিক্রিয়াকে বিপন্ন করে। সাফল্য লাভ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলো নানা সময়ে নানা ধরনের মতাদর্শ গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যের মতাদর্শগত দৃশ্যপটে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল বামধারার জাতীয়তাবাদ। মিসরে নাসেরের জাতীয়বাদী বার্তার এখনো একটি আবেদন সৃষ্টিকারী প্রতিধ্বনি রয়েছে : মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্য হস্তক্ষেপের নিন্দা, মুসলিমদের নিজেদের জ্বালানি সম্পদের ওপর নিজেদের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ দাবি, মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্যের সামরিক ঘাঁটি নির্মূল করা এবং বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের চলমান দুর্দশার ন্যায়সঙ্গত সমাধান।

আমরা ভুলে যাই, ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্য স্বার্থের কাছে আরব জাতীয়তাবাদকে সবচেয়ে শক্তিশালী হুমকি বিবেচিত হওয়ায় ইরান ও সিরিয়ার নেতাদের উৎখাত করতে এবং মিসরের রাজনৈতিক দৃশ্যপট নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন গোপন অভিযান চালাতে উদ্দীপ্ত হয়েছিল। (এই ২১ শতকেও যুক্তরাষ্ট্র সর্বনাশাভাবে বিশ্বাস করে, তারা ইরাক ও সিরিয়ার সঙ্কটের মূল কারণ আরব, বা অন্য, জাতীয়তাবাদকে অবজ্ঞা ও অগ্রাহ্য করতে পারবে।) অনেকের কাছে এখন বিস্ময়কর মনে হলেও এটা সত্য, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য প্রায়ই আরব জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব এবং স্থানীয় সোভিয়েত স্বার্থ দুর্বল করার জন্য ইসলামপন্থীদের হাতিয়ার বিবেচনা করত।

বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র কখনোই তার অনুগ্রহভাজনদের শাসন প্রতিষ্ঠা বা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে একের পর এক দেশে নিয়মিতভাবে বৈরী শাসকদের উৎখাতে গোপন অভিযান কিংবা সুস্পষ্ট সামরিক হস্তক্ষেপ চালাতে পিছপা হয়নি। তালিকাটি বিস্ময়কর রকমের বড় : কোরিয়া (১৯৫০-১৯৫৩), ইরান (১৯৫৩), গুয়াতেমালা (১৯৫৪), কোস্টারিকা (১৯৫৫), সিরিয়া (১৯৫৭), ইন্দোনেশিয়া (১৯৫৮), ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র (১৯৬০), পেরু (১৯৬০), ইকুয়েডর (১৯৬০), কঙ্গো (১৯৬০), ভিয়েতনাম (১৯৬১-১৯৭৩), কিউবা (১৯৬১), ব্রাজিল (১৯৬৪), চিলি (১৯৭২), অ্যাঙ্গোলা (১৯৭৫), নিকারাগুয়া (১৯৮১), লেবানন (১৯৮২-১৯৮৪), গ্রানাডা (১৯৮৩), পানামা (১৯৮৯), ইরাক/উপসাগর (১৯৯১), সোমালিয়া (১৯৯৩), বসনিয়া (১৯৯৪-১৯৯৫), কসোভো (১৯৯৯), আফগানিস্তান (২০০১-আজ পর্যন্ত) ও ইরাক (২০০৩-আজ পর্যন্ত)।

ওয়াশিংটন ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে মিসরে নাসেরের বিরোধিতা করার জন্য মুসলিম ব্রাদারহুডকে তহবিল দিয়েছে, একই কাজ করার জন্য সৌদিদের নিয়োজিত করেছে। ১৯৬২ সালে ইয়েমেনে নাসেরপন্থী সরকারকে উৎখাতে সহায়তা করতে ব্রাদারহুডের সাথে কাজ করেছে। সমর্থন হয়তো ইন্দোনেশিয়ান মুসলিম আন্দোলনগুলোতে পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল। ইসরাইলও একই খেলা খেলেছে : ১৯৬০-এর দশকে ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বাধীন আরব জাতীয়তাবাদী ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থার (পিএলও) বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ইসরাইল হামাস নেতা শেখ আহমদ ইয়াসিনকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়, ইসলামপন্থী হামাসকে তহবিল দেয় এই বিচারবুদ্ধিহীন বিশ্বাসে যে, জাতীয়তাবাদীদের চেয়ে ইসলামপন্থীদের আয়ত্তে রাখা হবে অনেক সহজসাধ্য। ইসরাইল তারপর ২০০৪ সালে আগের অবস্থানে ফিরে আসে এবং শেখ ইয়াসিনকে গোপনে হত্যা করে।

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন মতাদর্শভিত্তিক আন্দোলনকে কৃত্রিমভাবে শক্তিশালী ও ভূমিকা পালন করার ব্যবস্থা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বেশ দায়দায়িত্ব রয়েছে। পরে অবশ্য এগুলো তারই শত্র“তে পরিণত হয়েছে। ইসলামকে পাওয়া না গেলে ওয়াশিংটন তখন সংশ্লিষ্ট সময়ের চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুর্বল বা ধ্বংস করতে অন্য কোনো আদর্শবাদী শক্তিকে খুঁজে নিত।

প্রতিরোধ আন্দোলনে আরব জাতীয়তাবাদীরা একা নয়। জাতীয়তাবাদী নেতাদের একটা পুরো দল মধ্য শতকে আবির্ভূত হয়ে ১৯৫৫ সালে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম) গঠন করে স্নায়ুযুদ্ধকালে এটাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পাশ্চাত্যের মধ্যে 'তৃতীয় শক্তি' হিসেবে তুলে ধরেন। এখনো কৌশলগত আধিপত্য বিস্তারে নিয়োজিত নব্য-সাম্রাজ্যিক পাশ্চাত্য বাহিনীর বিরুদ্ধে সার্বভৌম অধিকার আদায়ের জন্য এই আন্দোলনের নেতারা রুখে দাঁড়াতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইউএসএসআরের প্রতি সত্যি সত্যি ঝুঁকে থাকার জন্য ওয়াশিংটন পুরো ন্যাম আন্দোলনকে হুমকি বিবেচনা করতে থাকে।

১৯৭৯ সালে হাভানা ঘোষণায় উল্লেখিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের কর্মপন্থায় 'সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নব্য-উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, জায়নবাদ এবং সব ধরনের বিদেশী আগ্রাসন, দখলদারিত্ব, আধিপত্য, হস্তক্ষেপ বা প্রাধান্য বিস্তার এবং সেইসাথে পরাশক্তি ও ব্লক রাজনীতির বিরুদ্ধে' তাদের সংগ্রামে 'জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা' রক্ষার আহ্বান জানানো হয়। জাতিসঙ্ঘের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ন্যামের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই বিবৃতির ভাষাটি এখনো সত্যকে প্রতিধ্বনিত করে।

(ন্যামকে ইসরাইলবিরোধী হিসেবে বিবেচনা করার যৌক্তিক কারণ ছিল ইসরাইলের। অবশ্য ন্যামের ইসরাইল বিরোধিতার ভিত্তি সেমিটিকবাদবিরোধিতা ছিল না। বরং তাদের বিরোধিতা ছিল একেবারে স্বতন্ত্রমুখী ইহুদি জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে, যা কেবল ইহুদিদের জন্য একটি জায়নবাদী রাষ্ট্র

সৃষ্টিকে সমর্থন করে। এই নীতির ফলে ১০ লাখ ফিলিস্তিনির তিন-চতুর্থাংশ তাদের ভিটামাটি হারায়। মুসলিম বিশ্ব এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্য অনেক দেশ পাশ্চাত্যের ইসরাইল প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃঢ় সমর্থনে এই আশঙ্কা অনুভব করে, ইসরাইল হলো পাশ্চাত্যের আজ্ঞাবাহক, মধ্যপ্রাচ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এর কেন্দ্র পরিকল্পিতভাবে স্থাপিত। পরবর্তী ঘটনাবলি এসব সন্দেহ মোচনে সামান্যই ভূমিকা রাখে।)

ইস্যুর মূলে ইসলামের অপ্রাসঙ্গিকতা ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনি সমস্যাটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। ফিলিস্তিন সমস্যার সৃষ্টি এবং আরব-ইসরাইলি সঙ্কটের উৎস যা-ই হোক না কেন ইসলামের তাতে কোনো কিছুই করার নেই। ফিলিস্তিন সমস্যাটির শুরু হয় পূর্ব ইউরোপ থেকে ইহুদিদের ফিলিস্তিন ভূমিতে অভিবাসনের সাথে। ১৯ ও ২০ শতকের প্রথম দিকে অভিবাসন ছিল প্রথমে মন্থর, পরে পাশ্চাত্য ইহুদিদের বিপুল অর্থায়নে তা অনেক দ্রুতগতির হয়। ইউরোপে অন্যান্য চরম স্বতন্ত্রবাদী জাতিগত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় নতুন জায়নবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। ইতালিয়ান, জার্মান, হাঙ্গেরিয়ান, স্ল্যাভ, তুর্কিদের সাথেই ইহুদিদের আন্দোলন শুরু হয়। ইউরোপে এবং বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপে ইহুদিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরে চলা বৈষম্য বিবেচনা করে চরম স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী বা ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করার অত্যন্ত যৌক্তিক কারণ ছিল। ফিলিস্তিনিরা ইউরোপিয়ান বসতি স্থাপনকারীদের বিপুলভাবে তাদের মধ্যে আসতে দেখে তাদের কাছে জায়নবাদী মতাদর্শ পুরো ফিলিস্তিনকে নতুন ইহুদি আবাসভূমি করার পরিকল্পনাটি পরিষ্কার হয়ে যায়। এতে তারা ক্রমাগত বেশি হারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

হলোকাস্টের অপরাধের পুরো দায় ইউরোপিয়ানদের কাঁধে বর্তায়। এটাই ইহুদিদের ফিলিস্তিনে যাওয়ার জন্য চূড়ান্তভাবে ঠেলে দেয়, আর তাতে সমর্থন করে অপরাধী ইউরোপিয়ানরা। নতুন ইহুদি রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ফলে ১০ লাখ ফিলিস্তিনির তিন-চতুর্থাংশ চূড়ান্তভাবে নির্মূল হয়ে যায়, ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইউরোপিয়ান পাপের মূল্য চুকাতে বলায় ফিলিস্তিনিরা তিক্তভাবে ক্ষুব্ধ হয়। ইসলামের অস্তিত্ব যদি কখনো না থাকত, তবে খ্রিষ্টান ফিলিস্তিনিরাও তাদের ভূমি ইহুদিদের হাতে ছেড়ে দিয়ে খুশি থাকত না কিংবা হারানো জমি ফিরে পেতে গেরিলা পন্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকত না। বস্তুত ইসরাইলের বিরুদ্ধে গেরিলা আন্দোলনগুলোর মধ্যে ফিলিস্তিনি খ্রিষ্টানরা বেশি খ্যাতিমান। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফিলিস্তিনি-ইহুদি জাতিগত সঙ্ঘাত ধর্মীয় সুর বেশি গ্রহণ করেছে, কিন্তু তবুও এর সৃষ্টিতে ইসলামের কোনো ভূমিকা নেই।

বস্তুত, ফিলিস্তিনি আন্দোলন তাদের আদর্শগত ক্রমাগত রূপান্তরিত ভূমিকায় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধাপ অতিক্রম করেছে : আরব জাতীয়তাবাদী ধাপ, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধাপ এবং শেষে ইসলামি ধাপ। অবশ্য, প্রতিটিরই লক্ষ্য ছিল অভিন্ন, সেটি হলো স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র। ফিলিস্তিনি স্বার্থ অভিন্ন থাকলেও মতাদর্শগত বাহনের পরিবর্তন চলছে- স্থায়ী দুর্দশার জন্য পরিবর্তিত মতাদর্শ।

এসব ঘটনা উন্নয়নশীল বিশ্বের জাতিগুলোর তাদের প্রকৃত সার্বভৌমত্ব সন্ধানের কর্মপন্থা ও স্পর্শকাতরতার পেছনে থাকা নাটকীয় আবেগ প্রকাশ করে। ওই আন্দোলনে মুসলিম বিশ্ব স্রেফ একটি অংশমাত্র। আর ইসলাম পাশ্চাত্য হস্তক্ষেপবাদের বিরোধিতাকারী অন্যান্য বাহন বা ব্যানারের স্রেফ একটি মাত্র। ইসলাম না থাকলেও সাম্রাজ্যিকবিরোধী কষ্ট কম হতো না, প্রতিরোধও কম হতো না; তবে প্রতিরোধ আন্দোলন হয়তো বর্তমানে জাতীয়তাবাদের সাথে থাকা ইসলামের আবেগগত ও আদর্শগত বাড়তি শক্তি থেকে বঞ্চিত হতো।

যতক্ষণ পর্যন্ত হানাদার, দখলদার বা নির্যাতনকারীরা অমুসলিম হবে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাতীয়তাবাদের সাথে ইসলাম অবিচলভাবে উদ্দীপ্ত হবেই।

অধ্যায় তেরো

যুদ্ধ, প্রতিরোধ, জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ

বিশ্বে অন্য কোনো অঞ্চল সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্যের মতো পাশ্চাত্যের এত প্রবল ও স্থায়ী হস্তক্ষেপের মুখে পড়েনি। এর পেছনে থাকা কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে অঞ্চলটি পাশ্চাত্যের একেবারে লাগোয়া, এখানে পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্য শক্তিশালী সম্প্রসারণবাদী শক্তির বিকাশ ঘটায়; মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল জ্বালানি সম্পদ এবং এর সংশ্লিষ্ট বিপুল অর্থনৈতিক প্রভাবের প্রতি আকর্ষণ; হাজার হাজার বছর ধরে আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতির প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংযোগস্থলে এর কৌশলগত অবস্থান। আগের অধ্যায়ে আমরা কয়েক শ' বছর ধরে উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও নব্য সাম্রাজ্যিকবাদের প্রভাব এবং বর্তমানে মার্কিন হস্তক্ষেপবাদের তীব্রতা বাড়তে দেখেছি।

হস্তক্ষেপের এই ইতিহাসের ফসল হিসেবে পুঞ্জিভূত ক্রোধ, হতাশা ও চরমপন্থাবাদ ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান। ৯/১১ কিভাবে ঘটতে পারল প্রশ্নটা সম্ভবত সেটা নয়, বরং প্রশ্ন হতে পারে কেন তা আরো আগে ঘটেনি? আমাদের বিশ্বায়নের যুগে মধ্যপ্রাচ্যের চরমপন্থী গ্রুপগুলো তাদের দুর্দশা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য তাদের সংগ্রামকে চূড়ান্তভাবে পাশ্চাত্যের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসবে, তাতে আমরা কেন আশ্চর্য হচ্ছি? সে ক্ষেত্রে এটা বুঝতে মাথা ঘামানোর দরকারই নেই যে, দীর্ঘমেয়াদি পাশ্চাত্য ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় কোনো না কোনো ধরনের প্রত্যাঘাত, প্রতিরোধ, তীব্র বা এমনকি সহিংস প্রতিক্রিয়া হতেই পারে। এ পর্যায়ে পাশ্চাত্যের জন্য এটা বিশেষভাবে ভণ্ডামি যে, অন্য দিকে ঘুরে অনুমান করার বা খোঁজার চেষ্টা করা, মুসলিম বিশ্বের বা ইসলামের সাথে কী এমন ভুল ঘটনা ঘটল, যার ফলে মুসলিম বিশ্বের কাছ থেকে পাশ্চাত্য সহিংস প্রতিক্রিয়ার শিকার হবে? মুসলিম বিশ্ব থেকে বর্তমান প্রতিক্রিয়ার মাত্রা সৃষ্টিতে গত ২০০ বছর বা এর চেয়েও বেশি সময় ধরে চলা নিজের নীতির কোনো ধরনের প্রভাব বা ভূমিকা থাকার বিষয়টি স্বীকার না করা স্থূলবুদ্ধিতা বা একগুঁয়ে অজ্ঞতার কাছাকাছি।

সহিংসতার ব্যবহারেও বিস্ময়ের কিছু নেই। পরিস্থিতির যখন অবনতি ঘটতে থাকে, তখন উদারপন্থী না চরমপন্থী- কারা প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে? এই যুক্তিতে উসামা বিন লাদেন হলেন মধ্যপ্রাচ্যের সুড়ঙ্গের খাঁচায় রাখা বাজপাখি। তার প্রথম দিকের সহিংস কার্যক্রম ইঙ্গিত দিচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা ভয়াবহভাবে খারাপের দিকে যাচ্ছে। প্রকৃত চরমপন্থীরা প্রথমবারের মতো মুগুর হাতে নিলে একই

পরিবেশ ও অমঙ্গলের আশঙ্কায় থাকা উদার শক্তিগুলো কতটা পেছনে থাকতে পারে? আমরা এর মধ্যেই জানতে পেরেছি, মধ্যপ্রাচ্যে বিন লাদেনের প্রতি সমর্থন যদি না-ও থাকে, তবুও তার প্রতি সাধারণ মানুষের সহানুভূতি কত ব্যাপক, যদিও তার পদ্ধতি পুরোপুরি মার্জনা করা হয়নি।

ফলে ইসলাম, মাদরাসা বা চরমপন্থী মতাদর্শকে কোনো না কোনোভাবে প্রতিরোধের চূড়ান্ত কারণ বলা বিশ্লেষণাত্মক স্খলন। এটা অবশ্যই সন্দেহাতীত বিষয় যে, ধর্মীয় বা মতাদর্শগত উপাদানগুলো প্রতিরোধ ও সহিংস প্রতিক্রিয়াকে জোরালো ও উদ্দীপ্ত করতে কিছু ভূমিকা পালন করে, কিন্তু এগুলো সমস্যার প্রকৃত উৎস নয়। আমরা কি সমস্যার বাহনটি নিয়েই বিভ্রান্তিতে থাকব; নাকি আমরা এ কথা বলব যে, শত শত বছর ধরে পাশ্চাত্যের হাতে মুসলিমরা যে অভিজ্ঞতার মুখে পড়ছে, সেখানকার নাগরিকদের জন্য সেটা কোনো ব্যাপারই হতো না, যদি তারা মুসলিম না হতো।

বস্তুত মধ্যপ্রাচ্য যদি তার মধ্যে জমে থাকা ক্ষোভগুলো প্রকাশের জন্য একটি বাহন চায়, তবে তারা কেন ধর্ম তথা ইসলামকে গ্রহণ করবে না? ধর্ম ও ধর্মভ্রষ্টতা মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরোধমূলক রাজনীতির দীর্ঘ ঐতিহ্যের মূল্যবান ব্যানার। আমরা দেখেছি, সেই আদি খ্রিষ্টধর্মের আমলেও এমনটি ছিল। ইসলাম সম্মান ও কর্তৃত্ব নির্দেশ করে, যারা তাদের কারণকে ন্যায়সঙ্গত মনে করে তাদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠতার অনুভূতির ব্যবস্থা করে। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি হলো বাহিরাগত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জাতি বা উম্মাহর আত্মরক্ষা।

ইসলামের মাধ্যমে না হলে মধ্যপ্রাচ্য কিভাবে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধ পরিকল্পনা গড়ে তুলত? প্রতিরোধ সংগ্রামের ঐক্য সৃষ্টিকারী মূলমন্ত্র কী হতো? ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে নাসেরের আমলে মিসরে আমরা দেখেছি, আরব জাতীয়তাবাদ কিভাবে এ ধরনের একটি বাহন হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অসফল হয়, ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সঙ্কটে অ্যাঙ্গো-ফরাসি-ইসরাইলি যৌথ সামরিক টাস্কফোর্স আসলে তাকে উৎখাত করার চেষ্টা চালিয়েছিল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদও স্বর্ণযুগে মতাদর্শগত বাহন হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুব কমই প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। এমন অবস্থায় আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে গভীর মূল থাকায় এবং আঞ্চলিক স্বার্থের দোহাই দিয়ে গণসমর্থন লাভের সামর্থ্যের কারণে ইসলামি মতাদর্শ কর্মপন্থা হিসেবে সর্বাধুনিক ও সবচেয়ে শক্তিশালী আদর্শগত বাহনে পরিণত হয়েছে, অন্তত দূরদর্শী ভবিষ্যতের জন্য হলেও।

যখন রাশিয়ার লক্ষ্য হয় তার বিরুদ্ধে নিয়োজিত বহির্বিশ্বের কর্মপন্থা, তখন গণসমর্থন পাওয়ার জন্য বাহন কী হয়? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে থার্ড রাইখ সেনাবাহিনী যখন আক্রমণ চালাল, তখন স্টালিন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছিলেন প্রতিরোধের জন্য জনগণের হৃদয়কে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ স্পর্শ করতে পারবে না। তিনি প্রথমে রুশ জাতীয়তাবাদের দিকে মুখ ফেরালেন। তারপর বেপরোয়া হয়ে হলি মাদার

রাশিয়ার প্রতীক হিসেবে অর্থোডক্স চার্চকে বরণ করে নিয়েছিলেন জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার মূলমন্ত্র হিসেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জাপানি সম্রাট এশিয়ায় তার সম্প্রসারণবাদী ও সাম্রাজ্যিক নীতির প্রতি জাপানি জনগণের সমর্থন লাভের বাহন খুঁজতে গিয়ে শিন্টো ধর্মের পবিত্র চরিত্র এবং এমনকি বৌদ্ধধর্মকে পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছিল জাপানি প্রেরণাকে চাঙা করার জন্য। শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধে বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলিরা হিন্দু তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে সিংহলি জনসমর্থন বাড়ানোর জন্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নিয়োজিত করেছিল। জার্মান যুদ্ধ প্রয়াসে চার্চের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেছিলেন হিটলার। এমনকি যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রেও বেশির ভাগ মূলধারার চার্চ ও যাজকমণ্ডলী (প্রটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক ও ইহুদি) তাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রতি ধর্মীয় বৈধতা প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে।

এই প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে মুসলিম জনগণের সংগ্রামে স্থানীয় জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি ইসলামকে উদ্দীপক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা না হলেই বরং তা হতো ব্যতিক্রমী বিষয়। বিদেশী হুমকির মুখে এসব শক্তি একে অপরের পরিপূরক।

মার্কিন সামরিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সহিংস প্রতিক্রিয়ার শক্তিশালী উৎস হিসেবে ইসলামের ব্যবহার নিয়ে ওয়াশিংটন বোধগম্যভাবেই উদ্বিগ্ন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কি এটা বাস্তবসম্মতভাবেই প্রত্যাশা করা উচিত যে, মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরোধ না করে বরং আমেরিকার কৌশলগত লক্ষ্যকে নীরবে মেনে নেবে? স্রেফ সেটা হচ্ছে না। এমন কোনো প্রত্যাশা যদি থেকে থাকে তবে বুঝতে হবে, নীতিনির্ধারকেরা বাস্তবতার বাইরে বাস করছেন। (সাম্রাজ্য প্রায়ই বাস্তবতার বাইরে থাকে, কারণ সে বিশ্বাস করে, সে-ই বাস্তবতা সৃষ্টি করে।) ভুলত্রুটি ও সমস্যা বুঝতে গিয়ে বাহনটিকেই কোনো না কোনোভাবে প্রতিরোধ সমস্যার উৎস (এ ক্ষেত্রে ইসলাম) বিবেচনা করায় আসল বিষয়টি চরমভাবে মিস হয়ে যাচ্ছে। নাকি আপনি যা করছেন, তা নিয়ে অন্যদের আরো গুরুতর সমস্যা থাকতে পারে- এই বাস্তবতা অস্বীকার করার এটাই সহজ পথ? এটা আবারো সুইস স্কলার তারিক রামাদান কথিত 'সমস্যার ইসলামিকরণ' বিষয়টি মনে করিয়ে দেয়।

এই বিষয়ে রবার্ট ক্যাপলান একটু ভিন্ন যুক্তি দেন এই বলে যে, মুসলিম উপাদানটি ইস্যুটির সাথে কিছুটা সংশ্লিষ্টতা প্রদর্শন করে। তার যুক্তি শোনার মূল্য আছে :

আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী ও প্রাচ্যবিদ কার্লটন স্টিভেন্স কুন ১৯৫১ সালে লিখেছিলেন, 'ইসলাম ১৪ শ' বছর ধরে ক্রমবর্ধমান হারে নিঃশোষিত পরিবেশে কোটি কোটি মানুষকে সর্বোচ্চভাবে বেঁচে থাকতে ও সুখী হতে সম্ভব করেছিল।' ইসলামের অদম্য, সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত বার্তা ছাড়াও ধর্মটির যথাযথ সংগ্রামপ্রবণতা একে নিপীড়িতের কাছে আকৃষ্ট করে তুলেছে। এটা লড়াই করার জন্য প্রস্তুত একটি ধর্ম। পরিবেশগত কঠিন চাপ, ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক স্পর্শকাতরতা, অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন, উদ্বাস্তু

অভিবাসনচালিত রাজনৈতিক যুগটি ইতোমধ্যেই বিশ্বের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু ধর্মে পরিণত হওয়া ইসলামের বিস্তার ও তীব্র আবেগপূর্ণতার জন্য ঐশ্বরিক সৃষ্ট যুগ। (ইসলাম পশ্চিম আফ্রিকায় বিস্তৃত হলেও এটা সর্বপ্রাণবাদের সাথে সমন্বিত হয়ে স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলেছে। এর ফলে নতুন ধর্মান্তরিতদের অনেক কম পাশ্চাত্যবিরোধী-প্রবণ করতে পারছে। এতে বিশ্বাসের দুর্বল সংস্করণও তৈরি করছে, যা অপরাধের প্রতিষেধক হিসেবে অনেক কম কার্যকর।)

ক্যাপলান আসলে এ কথাই গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাইছেন, বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ইসলাম একটি কার্যকর ঐক্যবদ্ধকারী মূলমন্ত্র। তবে ইসলাম না থাকলেও একই ধরনের নিপীড়নমূলক বা সহিংস পরিবেশে বেশির ভাগ সংস্কৃতির কাছ থেকেই সহিংস প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হতো বলে ধারণা করা হচ্ছে।

৯/১১-এর টেলিভিশন ফুটেজ সর্বকালের জন্য আইকনিক ছবি তৈরি করেছে : অভিযানটির ব্যাপ্তি ও সাহসিকতা, এর হিংস্রতা, মৃত্যুর মাত্রা, নীল আকাশের বিপরীতে ধ্বংসযজ্ঞের কালো ধোঁয়া দৃষ্টিকে স্থিরভাবে আটকে রাখে এবং মর্মপীড়ার সৃষ্টি করে। তবে ওই সব ছবি ভিন্ন দর্শকদের ভিন্ন কাহিনী বলে।

অনেক আমেরিকান ও কিছু অন্য পাশ্চাত্য দর্শকের কাছে, বর্ণনাটি সোজাসাপ্টা : যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে শান্তি সুরক্ষা করার জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করার সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ধর্মান্ধ ঘাতকদের হিংস্র আক্রমণের শিকার হয়েছে। ঘটনাটি দ্রুত শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত এবং ভবিষ্যতে যারা একই ধরনের কাজ করার কথা চিন্তাও করতে পারে, তাদের নির্মূল করা উচিত। সত্যিই, মুসলিম সংস্কৃতির সাথে ভুলটা কী হলো (তাদের অনেকে এমনকি মিত্রও) যার ফলে ধর্মটি এমন নৃশংস ঘটনা সৃষ্টি করতে পারে? অর্থাৎ তাদের ভাষায় ইতিহাস শুরু হয়েছে ৯/১১-এর মাধ্যমে।

তবে বিশ্বজুড়ে অন্য বিপুলসংখ্যক লোক, এমনকি পাশ্চাত্যেরও অনেকে রয়েছে তাদের মধ্যে, ঘটনাগুলো একটু ভিন্নভাবে পাঠ করছে। আক্রমণটি নিঃসন্দেহে পীড়াদায়ক, ক্রোধ সৃষ্টিকারী এবং নির্দোষ বেসামরিক লোকজনকে হত্যা করায় মর্মান্তিক। কিন্তু এ ধরনের হামলায় বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি এবং বিপুলসংখ্যক বিষয় নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান ক্রোধের কারণে আগে হোক আর পরে হোক, কোনো না কোনো মুসলিম পাল্টা আঘাত হানবে, এটা ছিল অনিবার্য। ইতিহাস ৯/১১-এর সাথে শুরু হয়নি, বরং এর একটি খুবই দীর্ঘ ভূমিকা আছে। যুক্তরাষ্ট্র যদি বৈশ্বিক আধিপত্য ও রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপ এবং আমেরিকানবিরোধী অনুভূতির ভাণ্ডার বাড়াতে থাকে, তবে সেখানে এ ধরনের হামলা আরো হবে। ঘটনাগুলো যতটা ভয়ঙ্কর, ঠিক ততটাই পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে এবং পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে ওয়াশিংটনের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিকারী হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে সব জায়গায় সম্ভবত এই দৃষ্টিভঙ্গিই দেখা যেতে পারে।

উদ্দেশ্যের ন্যায়সঙ্গতা

বেশির ভাগ মুসলমান বেদনাহতভাবে স্বীকার করে, তাদের নিজ সমাজ গভীর সমস্যায় জর্জরিত। তবে তারা পাশ্চাত্য আধিপত্য এবং প্রয়োজন হলে এমনকি পাল্টা আঘাত হানার যৌক্তিকতা নিয়েও সামান্যই সন্দেহ পোষণ করে। বস্তুত কোনো মুসলিম কিংবা অন্য যে কেউই কোনো উদ্দেশ্যকে ন্যায়সঙ্গত ও মূল্যবান মনে করলে সে ওই কারণে জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে। অবশ্য যুদ্ধ ও ধর্মের মধ্যকার এই সম্পর্ক সব ধর্মীয় ঐতিহ্যেই জটিল নৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করে। যুদ্ধের নৈতিক ভিত্তি নিয়ে খ্রিষ্টান চিন্তাধারার ঐতিহ্য অন্তত সেই সেন্ট অগাস্টিনেও পাওয়া যায়। আর তা কোন বিষয়টি যুদ্ধকে 'ন্যায়সঙ্গত' করেÑ এমন প্রশ্নের সৃষ্টি করে, যা সীমানির্ধারক প্রতিক্রিয়া অস্বীকার করে। যুদ্ধে ন্যায়বিচার নিয়ে সনাতনী পাশ্চাত্য নৈতিক চিন্তাধারায় অন্তত দু'টি পৃথক উপাদান রয়েছে। এ দু'টি হলো যুদ্ধে যাওয়ার উদ্দেশ্য এবং যুদ্ধ আচরণবিধির নৈতিকতা। ক্লাসিক্যাল পাশ্চাত্য চিন্তাধারা আরো কিছু বৈশিষ্ট্যও তুলে ধরে। এগুলো হলো বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প পন্থাগুলোর বিপরীতে যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক; যুদ্ধের সুযোগ বিষয়ক; যুদ্ধ আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষের বৈধতা বিষয়ক; কারো নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ন্যায়বিচারের তুলনামূলক মাত্রা বিষয়ক; ধ্বংস সৃষ্টির আনুপাতিক মাত্রা বিষয়ক; এবং যুদ্ধে অযোদ্ধা, বেসামরিক নাগরিক ও বেসামরিক অবকাঠামোর অবস্থান বিষয়ক।

বেশির ভাগ সামরিক অভিযানের কেন্দ্রস্থলে মৃত্যু ও ধ্বংস থাকায় যুদ্ধে নৈতিকতার কথা বলা প্রায় বৈপরীত্যমূলকই। আর যতটুকু বোঝা যাচ্ছে, তাতে করে বলা যায়, যেকোনো জীবন নেয়াই অনৈতিক। কিন্তু যুদ্ধে নীতিনৈতিকতার মূলনীতি সবই আপেক্ষিক বিষয় : কার ন্যায়বিচার? কোন ধরনের আনুপাতিক? বেসামরিক হতাহতের মাত্রা কিভাবে সীমিত রাখা হবে? কে ঠিক এবং কোন মাপকাঠিতে? যুদ্ধে অংশ নেয়া প্রায় প্রতিটি দেশই অবিচলভাবে দাবি করে এবং সাধারণভাবে বিশ্বাসও করে, অন্যায়কারী শত্রুর বিরুদ্ধে তারা ন্যায়ের পক্ষে।

গণতান্ত্রিক সমাজগুলোতে উভয় সঙ্কট প্রায়ই বাড়ে : সঙ্ঘাত চলাকালে নৈতিক দ্ব্যর্থবোধক বিষয়ক ধারণা নিয়ে কোনো ধরনের স্বীকারোক্তি তার নিজের সৈন্য ও জনসাধারণের মধ্যে হতোদ্যমকে আমন্ত্রণ জানানো হবে, পুরোপুরি ন্যায়বিচারের স্বার্থেই এই যুদ্ধে অংশ নেয়া হচ্ছে বলে যে ঘোষণা প্রচার করা

হয় তা এবং যুদ্ধ কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তা-ই শত্রুকে দানবীয়ভাবে তুলে ধরা এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত নৈতিক পরিভাষায় সংগ্রামকে চিত্রিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থায় যুদ্ধের ধারাটি নানা প্রেক্ষাপটে টেলিভিশন ও ইন্টারনেটে দেখানোর কারণে সমস্যাটি আরো জটিল হয়ে পড়ে। জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রশাসন ইরাক যুদ্ধের রক্তাক্ত বিবরণ প্রকাশে আমেরিকান মিডিয়ার ওপর (স্ব)-আরোপিত বিধিনিষেধ জারি করতে সক্ষম হয়েছিল। ঘটনাস্থলে শারীরিকভাবে হামলার শিকার লোকজন এবং যুদ্ধের প্রভাব নিয়ে আরব স্যাটেলাইট স্টেশন আলজাজিরা নিয়মিত, সরাসরি প্রতিবেদন ও গ্রাফিক চিত্র প্রকাশ করায় সংবাদমাধ্যমটির ওপর ওয়াশিংটনের প্রবল ক্রোধ ছিল। আমেরিকান মৃত্যুর ছবি, এমনকি অনেক সময় বেসামরিক হতাহতের ছবি আমেরিকার মিডিয়ায় প্রায়ই 'নোংরা' অভিহিত হতো, মূলত এটি হতো সেগুলোর দেখানো ঠেকাতে। তাহলে বলতে হয়, যেসব কাজ এসব ছবি তৈরি করত, সেগুলোও ছিল নোংরা। যুদ্ধ তখনই সবচেয়ে সহজভাবে করা যায়, যখন মানব কার্যকারণগত সম্পর্ক থাকে দূরে, অদৃশ্যমান ও বিমূর্ত থাকে।

জিহাদ

জিহাদের তত্ব এবং একে কেন্দ্র করে থাকা বিপুল সাহিত্য কার্যত খ্রিষ্টান 'ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ' তত্ত্বের সমতুল্য। যুদ্ধে মুসলমানদের কার্যক্রম সংজ্ঞায়িত ও সীমিত করার জন্য এটি প্রণীত। বর্তমানে ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের যুক্ত করা সবচেয়ে বিতর্কিত ও আবেগাপ্লুত শব্দ সম্ভবত জিহাদ। এমন একটা দিনও কাটে না, যখন জিহাদিরা নিজেরা কিংবা ইসলামের সমালোচকদের কোনো না কোনো পক্ষ থেকে মিডিয়ায় শব্দটি উচ্চারিত হয় না। অনেক পর্যবেক্ষকের শব্দটির উৎপত্তি ও ব্যবহার পরীক্ষা করার মতো ধৈর্য নেই। তাদের মতে, এটা আসলে পাশ্চাত্য শক্তি এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি জিহাদি চ্যালেঞ্জের নৃশংস বৈশিষ্ট্যকে যৌক্তিকীকরণ ছাড়া সত্যিকার অর্থে আর কিছুই নয়।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে জিহাদের অনেক অর্থ রয়েছে। আরবিতে জিহাদ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত মূল দিয়ে বোঝায় 'চেষ্টা করা' বা 'সংগ্রাম করা'। ব্যক্তির ধর্মনিষ্ঠ জীবনযাপন, ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা, ব্যক্তিগত আদর্শ এবং বিশ্বাসের প্রচারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত প্রয়াস চালিয়ে ইসলাম বিস্তার করা বোঝাতে এটা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের জন্য জিহাদ শব্দটি আরো কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত আত্মনিবেদনের ইতিবাচক ধর্মীয় দ্যোতনা প্রকাশ করে। আরবি কথোপকথনে এটা স্রেফ এই অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় : 'আমি সর্বোত্তমভাবে চেষ্টা করব।' নবীজী সা:-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী এটা হলো 'বড় জিহাদ' বা ব্যক্তিগত জিহাদ।

নবীজী সা:-এর সংজ্ঞায়িত 'ছোট জিহাদ' এসেছে মূলত সামরিক সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও উম্মাহর প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষার বাধ্যবাধকতাপূর্ণ সামরিক প্রয়াস উল্লেখ করতে। মদিনার নবসৃষ্ট মুসলিম সম্প্রদায়টি বারবার মক্কার পৌত্তলিক বাহিনীর সামরিক হামলার শিকার হতে থাকায় পবিত্র কুরআনের অনেক প্রত্যাদেশ এবং নবীজী সা:-এর ব্যক্তিগত উদ্বেগের প্রধান বিষয় ছিল সম্প্রদায়ের প্রতিরক্ষা। তবে মুসলিম সম্প্রদায় স্থিতিশীল হওয়া মাত্র শব্দটি সামরিক সম্প্রসারণের অধ্যায়ে প্রবেশ করে। ইসলাম বিস্তৃত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ধর্মটি বিশাল অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণের জন্য যুদ্ধ করার সময় অন্যান্য রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের মুখোমুখি হয়।

ইসলামি ব্যবহারশাস্ত্র যুদ্ধ করার বিধিবিধানের ওপর ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে নারী ও শিশুদের টার্গেট করা যাবে না, অবশ্যই সমানুপাতিক শক্তি ব্যবহার করতে হবে, বেসামরিক অবকাঠামো অকারণে ধ্বংস করা যাবে না, বৈধ শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানকেই জিহাদ ঘোষণা করতে হবে, জিহাদের বিধিবিধান-বহির্ভূত যুদ্ধবিগ্রহ আইনসম্মত নয়। নবীজী সা:-এর নারী, শিশু, বৃদ্ধদের কিংবা মন্দির, মঠের লোকজনকে আঘাত না করতে তাঁর সৈনিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শত্রুর দুর্গ ভাঙতে ক্যাটাপুল্ট (দূরপাল্লার বিশেষ ধরনের গুলতি) ব্যবহার করা আইনসম্মত হবে কি না তা নিয়ে মধ্যযুগের আলেমদের মধ্যে বিতর্ক হতো। অনেক আলেম এগুলোর ব্যবহারকে বেআইনি বলতেন, কারণ এ ধরনের ত্র“টিপূর্ণ অস্ত্র সৈন্যদের পাশাপাশি বেসামরিক নাগরিকদেরও ক্ষতি করতে পারে।

বাস্তব ক্ষেত্রে যুদ্ধের নৈতিকতাবিষয়ক খ্রিষ্টান মতবাদ যেমন লঙ্ঘিত হয়েছে, ঠিক একইভাবে হয়েছে ইসলামি বিধিবিধানও। বেসামরিক মৃত্যুর মানবীয় মাত্রা থেকে আমাদের দূরে রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মিতভাবে গ্রহণ করা 'অনিচ্ছাকৃত ক্ষতি' পরিভাষা আসলে ভয়ঙ্কর নির্লিপ্ততাকে অতি নমনীয়ভাবে প্রকাশের জন্য প্রণীত এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হামবুর্গ ও ড্রেসডেনে অগ্নিবোমা এবং হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পরমাণু বোমার ব্যবহার ছিল বেসামরিক লোকজনকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করতে প্রায় একতরফা ভয়াবহ মাত্রার সামরিক শক্তি প্রদর্শন।

ভন ক্লাউসেবিটজ উল্লেখ করেছেন, যুদ্ধ উদ্দেশ্যকে সব সময় ছাড়িয়ে যাওয়া আবেগে চালিত। সঙ্ঘাত একবার শুরু হলে তা উভয়পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক প্রবল ঘৃণায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে, অর্থহীন সহিংসতার সীমাহীন ও ক্রমাগত জটিলভাবে পাক খেতে খেতে নৃশংসতা সৃষ্টি করে পাল্টা নৃশংসতা।

আধুনিক প্রয়োগে জিহাদ অনেক ধরনের সেকুলার কাজে ব্যবহৃত হয়, ঠিক যেমন ইংরেজিতে 'ক্রুসেড' শব্দটি অপরাধ দমন কিংবা ড্রাগের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। হিন্দু নেতা মহাত্মা গান্ধীর ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামকে আরবিতে জিহাদ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল, ঠিক যেভাবে সেকুলারপন্থী প্রেসিডেন্ট হাবিব বরগিবার তিউনিসিয়ায় জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন অভিযানে ব্যবহার করেছিলেন। অনেক নারী নারীমুক্তির সংগ্রামে জিহাদ ব্যবহার করে, আবার অনেকে ন্যায়সঙ্গত নৈতিক ও সামাজিক-ব্যবস্থার সংগ্রামে প্রয়োগ করে। তবে পরিভাষাটি প্রধানত পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশের, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে সামরিক অভিযানে জড়িত দেশগুলোর, বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারেই ব্যবহৃত হয়েছে। আবার অনেক ওয়াহাবি ও ধর্মান্ধ সালাফি ভ্রান্তিকরভাবে শিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও এই পরিভাষাটির আশ্রয় নেয়।

সময়ের পরিক্রমায় আক্রমণ ও রক্ষণ ক্রমবর্ধমান হারে গুলিয়ে যায় এবং জিহাদের ধারণাটি মুসলিম সামরিক অভিযানে যুদ্ধরত অবস্থা উল্লেখ করতেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো অনেক সময় অন্য মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, এসব যুদ্ধে ইসলামের বিস্তারের বিষয়টি পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক ছিল। বস্তুত ১৯ শতকের সুদানি বিদ্রোহী নেতা 'মাহদি' উসমানিয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহকে জিহাদ হিসেবে অভিহিত করে সব তুর্কিকে হত্যার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ওয়াহাবিরা সত্যিকার অর্থে সব অ-ওয়াহাবি মুসলমানের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিল। ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরিভাষাটির ব্যবহার ও অপব্যবহার হয়ে হয়ে আজ মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্য বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বর্তমান রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মুসলিম বিশ্বের মধ্যে কোনো কোনো চরমপন্থী গ্রুপ নিজ দেশের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যও এই পবিত্র কুরআনিক ধারণাটি ব্যবহার করছে। কোনো কোনো চরমপন্থী প্রচলিত পাঁচটি স্তম্ভের (নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি) পাশাপাশি জিহাদকে ইসলামের 'ষষ্ঠ স্তম্ভ' হিসেবে ঘোষণা করছে। নাম যা-ই থাকুক না কেন, এটা উল্লেখ করা দরকার যে, হানাদার বা দখলদার বিদেশী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্তর্জাতিক আইনে যৌক্তিক।

জিহাদের ধারণাটি এখন পাশ্চাত্য হস্তক্ষেপবাদের সাথে একেবারে পুরোপুরি একাকার হয়ে গেছে : তারা উভয়েই দুই দিক দিয়ে যুধ্যমান পরিবেশে নিজ নিজ শক্তি বাড়াচ্ছে, সহিংসতার এক ধরনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা গড়ে তুলছে, একে অপরের যৌক্তিকতা সৃষ্টি করেছে। অধিকন্তু জিহাদ অধ্যায়ন যুক্তরাষ্ট্রে কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে, উভয় পক্ষের দলীয় একনিষ্ঠ সদস্যদের ব্যাপকভাবে প্রাধান্য রয়েছে এতে। তারা সমস্যাটির প্রকৃতি নিয়ে আবেগপূর্ণ বিতর্কে মশগুল রয়েছে। এসব অধ্যয়নের বড় অংশই সংগ্রামকে যৌক্তিক করতে মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম সংস্কৃতি এবং খোদ ইসলামেরও নানা অস্বাভাবিকত্ব অনুসন্ধানের কাজেই নিয়োজিত। 'সমস্যাটির' লক্ষণ বা প্রকাশ না হয়ে জিহাদ হয়ে গেছে এর প্রধান উৎস।

সঙ্ঘাতের সময় পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে ঘৃণা বাড়াতে চরমপন্থী ও সহিংস গ্র“পগুলো ইসলাম সম্পর্কে তাদের চরম ব্যাখ্যার পাশাপাশি জিহাদ পরিভাষাটির অপব্যবহার করছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা পরে এসব উপাদান নিয়ে আলোচনা করব। তবে এটা বিশ্বাস করা কি বিশ্বাসযোগ্য হবে, যদি জিহাদের ধারণাটি না থাকত, তবে মুসলিম বিশ্ব পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহ চালাত না? সর্বোপরি সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে মার্কিন হামলা ছিল পুরোপুরি সেকুলার বিষয় এবং প্রতিরোধের একেবারে প্রাথমিক নিদর্শন দেখা গিয়েছিল বাথ ও জাতীয়তাবাদী বাহিনীর কাছ থেকে; তাদের ইসলাম বা জিহাদ নিয়ে কিছুই করার ছিল না। অবশ্য পরে মার্কিন যুদ্ধ ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ইরাকি বিরোধিতার প্রতিক্রিয়ায় জিহাদ হয়ে পড়ে প্রধান বিষয়। আবারো বলছি, আমরা সমস্যার উৎসের জন্য ইসলামি বাহনটি নিয়ে বিভ্রান্তিতে রয়েছি।

বৈধ কর্তৃত্ব ও উসামা বিন লাদেন

জিহাদের প্রশ্নটি আবার আবির্ভূত হয় প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধকালে কুয়েত মুক্ত করার লক্ষ্যে সৌদি আরবে মার্কিন সৈন্য মোতায়েনের সময়। ক্লাসিক ইসলামি আইনে অন্য মুসলমানদের হত্যার জন্য অমুসলিমদের সাথে কোনো মুসলিম শাসকের সহযোগিতার বৈধতা নিয়ে নানা দিক থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এ ধরনের যেকোনো সহযোগিতা খুবই সীমিত এবং তাতে চুক্তির যথাযথ শর্তাবলি উল্লেখ প্রয়োজন হয়। সৌদি আরবের ক্ষেত্রে সৌদি আলেমরা শেষ পর্যন্ত ইরাকের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশটিকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কঠোরভাবে কেবল সাময়িক সময়ের জন্য সৌদি মাটিতে মার্কিন বাহিনী রাখার অনুমোদন দেন। তবে তাতে এই শর্তও থাকে, যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র এসব সৈন্য চলে যাবে। যেকেনো কারণেই হোক না কেন, যুদ্ধের পরও মার্কিন সৈন্যরা সরে না গেলে আলেমদের কাছে তা চুক্তির লঙ্ঘন বিবেচনা করবেন। তবে বেশির ভাগ আলেম সৌদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইস্যুটি উত্থাপনের সাহস পাননি। অবশ্য উসামা বিন লাদেন এবং অনেক আলেম ও নাগরিক বিষয়টি সামনে এনেছেন। বিষয়টি এই অঞ্চলে মার্কিন সমরনীতির ব্যাপারে বিন লাদেনের একেবারে প্রথম দিকের সমালোচনার তাৎপর্যপূর্ণ অংশ ছিল। ১৯৯৬ সালে গার্ডিয়ানে রবার্ট ফিস্কের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন :

আমেরিকান সৈন্যরা যখন দুই পবিত্র মসজিদের [মক্কা ও মদিনা] ভূমিতে সৌদিআরবে প্রবেশ করে, তখন আলেম-ওলামা [ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ] এবং সারা দেশের শরিয়াহ আইনের ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমেরিকান সৈন্যদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উঠেছিল।...

... প্রতিটি সাধারণ নাগরিক জানে, তার দেশ বিশ্বের বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী, যদিও একই সময় তাকে করের বোঝা এবং বাজে পরিষেবার দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এখন মসজিদে আলেমদের খুতবার মর্ম বুঝতে পারছে- যে আমাদের দেশ আমেরিকার উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। তারা সৌদিআরব থেকে আমেরিকানদের লাথি মেরে বের করে দিতে দৃঢ়ভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছে।...

চূড়ান্তভাবে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিটি মুসলিম ঐক্যবদ্ধ হবে।... আমি বিশ্বাস করি, আজ হোক, কাল হোক, আমেরিকানরা সৌদিআরব ত্যাগ করবে এবং সৌদি জনগণের বিরুদ্ধে আমেরিকা যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তা সব জায়গার সব মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মুসলিম দেশগুলোর অনেক অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়বে।

সৌদি মাটিতে বিদেশী সৈন্যের বৈধতার বিরুদ্ধে সৌদি জনগণ এবং অন্য মুসলমানদের কাছে বিন লাদেন যে বিশ্বাসযোগ্য আইনসম্মত দাবি তুলে ধরেছেন তা বোঝার জন্য তার ব্যাখ্যাকে আমাদের গ্রহণ করার দরকার পড়ে না। তবে এর মাধ্যমে আমরা দেখতে পারছি, বিন লাদেন কিভাবে সৌদি আরবে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি দিয়ে শুরু করে তার আক্রমণের ক্ষেত্র বাড়ানোর কাজ শুরু করেছেন। ৯/১১ এবং এর রেশ ধরে শুরু হওয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধ তার দাবি নিশ্চিতভাবেই মুসলিম বিশ্বে বিপুলভাবে পরিচিতি দিয়েছিল। আর তা স্বপ্নহারা ও ধর্মান্ধদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ও আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীকে পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জোরদার করেছিল। বাগাড়ম্বতার অংশটা বাদ দিলে দেখা যাবে এখানে ইসলাম আছে সামান্যই, বরং ব্যাপকভাবে রয়েছে সৌদি-মুসলিম স্বার্থের ভূরাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী উপলব্ধি।

এটা চরমপন্থী জিহাদি সংগঠন আলকায়েদার ভাষা। তবে সংগঠনটির ধর্মীয় পরিচিতিতে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমতির অভাব রয়েছে। পুরোপুরি মূলধারার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক রিসার্চ অ্যাকাডেমির দিকে দেখুন। এটা প্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। ২০০৩ সালের ১১ মার্চ ইরাকে মার্কিন আক্রমণের প্রাক্কালে তারা ফতোয়ার গুরুত্বসম্পন্ন একটি বিবৃতি ইস্যু করে : এতে ধ্বংস সৃষ্টিকারী সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিপজ্জনক অস্ত্রে সজ্জিত সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বকারীদের... এই অন্যায় ও আগ্রাসী যুদ্ধের মোকাবেলায় মুসলমানদের প্রতি তাদের প্রয়াসগুলোকে ঐক্যবদ্ধ এবং সংগ্রামে অংশ নেয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।... আমাদের আরব ও ইসলামি উম্মাহ (জাতি) এবং এমনকি আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসও (ইসলাম) নিঃসন্দেহে এসব সামরিক বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য। তাদের টার্গেট হবে আমাদের উম্মাহর কোটি কোটি সদস্য, সেই সাথে আমাদের বিশ্বাস, পবিত্র স্থানগুলো এবং আরব ও মুসলিমদের হাতে থাকা ক্ষমতা ও সম্পদের সব উৎস। এই লক্ষ্য হাসিলের প্রথম পর্যায় হলো- ইরাকে হামলা চালিয়ে এর ভূমি দখল এবং এর বিপুল তেলসম্পদ মজুদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা।... ইরাক আক্রমণ প্রত্যাখ্যান করে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সঙ্কট নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাবকে স্বাগত ও সমর্থন করছে অ্যাকাডেমি।... চলমান সব ঘটনার আলোকে বেশির ভাগ লোক মনে করে ইরাক আক্রমণ নিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী কোনো মুসলিম ভূমি শত্রু দখল করে নিলে জিহাদ করা সব মুসলমানের জন্য ব্যক্তিগত অবশ্যই কর্তব্য (ফরজে আইন) হয়ে পড়ে। আমাদের আরব ও মুসলিম উম্মাহ নতুন অমানবিক অভিযানের মুখে পড়বে, যার লক্ষ্য হবে আমাদেরকে আমাদের ভূমি, বিশ্বাস, সম্মান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা।... অ্যাকাডেমি সব আরব ও মুসলমানকে সম্ভাব্য আক্রমণের কাছে আত্মসমর্পণ না করার আহ্বান জানাচ্ছে, কারণ আল্লাহ তার ধর্মকে বিজয়ী করার নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

২০০৪ সালের নভেম্বরে ২৬ জন অত্যন্ত খ্যাতিমান সৌদি আলেম এবং সৌদিআরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইরাকে যুদ্ধ চালানোর নিন্দা করে একটি ফতোয়া ইস্যু করেন। শান্তি অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা প্রথমে চালানোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তাদের বিবৃতিতে বলা হয় : এতে কোনো সন্দেহ

নেই, প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির জন্য দখলদারদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নেয়া অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। এটা হলো আগ্রাসীকে মোকাবেলা করার শ্রেণীভুক্ত আত্মরক্ষামূলক জিহাদ। এ ক্ষেত্রে জিহাদ শুরু করে তাতে নিয়োজিত হওয়ার চেয়ে পরিস্থিতি ভিন্ন। আপনার কাছে সর্বসম্মত নেতৃত্ব না-ও থাকতে পারে। সুযোগ পাওয়া মাত্র আপনার তাতে অংশ নেয়া উচিত (আল্লাহকে ভয় করো, যতটুকু করা সম্ভব)। সন্দেহাতীতভাবে দখলদাররা আগ্রাসী, আসমানি সব বিধানে তারা পর্যুদস্ত না হওয়া পর্যন্ত (আল্লাহ চাহে তো) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি রয়েছে। তা ছাড়া মানবসৃষ্ট সব আইনে প্রতিরোধ করার অধিকার সব জাতিকে দেয়া হয়েছে। জিহাদের মূল অনুমতি এই উদ্দেশ্যে মঞ্জুর করা হয়েছে, যেটাকে আল্লাহ বলেছেন এভাবে, 'যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে পুরোপুরি সক্ষম।' [আল-হাজ, ৩৯]। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই স্বাভাবিক বিষয়, যখন জীবন রক্ষা কিংবা ন্যায়বিচার এবং শরিয়াহর ক্ষমতা সমুন্নত করার নিশ্চয়তা থাকে। তা-ই প্রতিরোধ কেবল বৈধ অধিকারই নয়, এটা ধর্মীয় কর্তব্যও যে, ইরাকি জনগণ নিজেদের এবং তাদের মর্যাদা, ভূমি, তেল, তাদের বর্তমান ও তাদের ভবিষ্যৎকে এই উপনিবেশ জোটের বিরুদ্ধে রক্ষার জন্য লড়াই করবে, ঠিক যেভাবে তারা এক সময় তাদের ব্রিটিশ দখলদারদের প্রতিরোধ করেছিল।

এমনকি সতর্ক ও রক্ষণশীল শিয়া ইরাকের আয়াতুল্লাহ সিস্তানি এই বিধান দিয়েছেন, আত্মরক্ষার্থে ইরাকে আমেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ। এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জিহাদ ও যুদ্ধের জন্য অনুমোদনযোগ্য ইসলামি শর্তাবলী নিয়ে সতর্কভাবে গ্রহণ করা আইনবিষয়ক যে বিপুলসংখ্যক বিধান ও ফতোয়া এসেছে, এগুলো তার অল্প কয়েকটি। যেকোনো স্থানে হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালানো সহজাত ব্যাপার; এর সাথে ইসলামি ন্যায্যতা প্রতিপন্নের ব্যবস্থা বিষয়টিকে আরো জোরদার করে।

সন্ত্রাসবাদের উদ্দীপনা

যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড এবং আত্মঘাতী অভিযান এখন মুসলিম কার্যক্রমের পাশ্চাত্য অভিধানে ঢুকে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তার রণতরীতে জাপানি কামিকাজ মিশন মোকাবেলা করেছিল। তবে বহুলপ্রচারিত কথা হলো, সন্ত্রাসবাদ হলো দুর্বলের হাতিয়ার। হামাসের শেখ আহমদ ইয়াসিন একবার বলেছিলেন, ফিলিস্তিনিদের কাছে যদি জঙ্গিবিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র থাকত, সেগুলো হতো পছন্দের অস্ত্র। বিপ্লবী যুদ্ধের সময় উত্তর আমেরিকায় ব্রিটিশ সৈন্যরা অভিযোগ করত, আমেরিকান অনিয়মিত বাহিনী রণাঙ্গনে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর মোকাবেলা না করে গেরিলা কার্যক্রমে অংশ নিয়ে অন্যায় কাজ করছে। আর একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রও আজ সামরিক শক্তিতে ব্যাপকভাবে এগিয়ে থাকার প্রেক্ষাপটে আদর্শ সামরিক অভিযানের মধ্যেই যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে। দেশটি একই সাথে মুসলিম শক্তি প্রদর্শনকারী অনিয়মিত অভিযানকে অনৈতিক ও কাপুরুষোচিত হিসেবে নিন্দা করছে। (আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা অনেক পাপ করেছে বলে অভিযোগ করা যেতেই পারে, কিন্তু মনে হয় না তাদের কাউকে কাপুরুষ বলা যায়।)

সমস্যাটি কি আসলেই ইসলামের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে? নাকি এসব ইস্যুর রাজনৈতিক ও সামাজিক উৎস রয়েছে, যেগুলোর জন্য কর্মপন্থা আরো ভালোভাবে বিশ্লেষণ ও মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন? সন্দেহাতীতভাবে এ বইতে বলা হচ্ছে, সমস্যাটি মূলত 'ইসলাম' নয়, বরং ভূরাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুগুলো মুসলমানদের প্রভাবিত করায় এর জের ধরে তারা সত্যি সত্যি দুর্বলের অস্ত্রকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করছে। বিভিন্ন স্থান ও সময়ে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের দীর্ঘ ও ভক্তিময় ইতিহাস থাকলেও গত শতকে এ ধরনের অভিযানের অনেক বেশি নাটকীয় উদাহরণ দেখা গেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ভিয়েতকং, বাস্ক ইটিএ, পেরুর শাইনিং পাথ, পিকেকে (তুরস্কে কুর্দি সংগঠন), এমজেকে (ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় ইরানি গ্রুপ), শ্রীলঙ্কায় তামিল টাইগার্স, ভারতে শিখ, ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি, ভারতে নকশালি, আয়ারল্যান্ডে আইআরএ, ইসরাইলে ক্যাচ, কলম্বিয়ায় রেড ব্রিগেড, আম শিনরিকিয়ো ইত্যাদি। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে নতুন সঙ্ঘাত বাড়ায় নাটকীয়ভাবে বিপুলসংখ্যক মুসলিম সংগঠন তালিকায় যুক্ত হয়েছে।

আমরা কিসের জন্য মৃত্যু বরণ করব? বিশেষ পরিস্থিতিতে মৃত্যু বরণ করলে তা কি কোনো বৃহত্তর অর্থ প্রকাশ করে? অন্যদের (পরিবার, বংশ, গোত্র, জাতির) জন্য কিংবা নিজের স্রষ্টার জন্য মারা যাওয়াটা কী! ইতিহাসজুড়ে থাকা এসব মৃত্যুর প্রতি সর্বোচ্চ পবিত্রতা, সম্মান ও সম্প্রদায়গত সংহতি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। মৃত্যু বিশেষ করে সহিংস মৃত্যু, অর্থ দাবি করে। জীবিত এবং রয়ে যাওয়ারা অস্বাভাবিক ও অকালমৃত্যুর ধরন থেকে প্রবোধ ও ব্যাখ্যা দেয়, কোনো অর্থ বা উদ্দেশ্য কামনা করে আকুলভাবে। আর খোদ হত্যার কাজটি কেমন? কোন পরিস্থিতিতে হত্যাকাণ্ড যৌক্তিক হয়ে পড়ে? এসব গভীর নৈতিক ও আদর্শিক ইস্যুর জবাব প্রতি যুগেই নতুন পরিস্থিতিতে সঙ্ঘাতের উভয় পক্ষের কাছ থেকে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে থাকে। প্রায় সময়ই এগুলো সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোকে সর্বোচ্চ নৈতিক পরিভাষায় সম্মানিত হয়ে থাকে।

দীর্ঘ সময় ধরে উদ্দীপনার কথা বলা হবে। সন্দেহ নেই, অনেক দিক থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের সমাজগুলো কম উন্নত। গুটিকতেক তেলসম্পর্কিত এলিট এবং কয়েকটি ধনী ক্ষুদ্র উপসাগরীয় দেশ বাদ দিলে এখানকার নাগরিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শিক্ষার স্তর, জীবনযাত্রা ও চাকরির সুযোগের দিক থেকে নিম্নপর্যায়ে অবস্থান করছে। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও সীমিত মনে হচ্ছে। আফ্রিকা বাদ দিলে বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ শাসনের উচ্চতর হার রয়েছে এখানে। অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের এসব পরিস্থিতির প্রায় পুরোটাই দীর্ঘ সময় ধরে বিরাজ করছে এবং ইসলাম সেখানে রয়েছে প্রায় ১৫ শ' বছর ধরে। যদিও সহিংসতা, সন্ত্রাসবাদ ও আত্মঘাতী বোমা হামলা ব্যাপকভাবে বেড়েছে অতি সাম্প্রতিক সময়ে এবং তা মধ্যপ্রাচ্যে উচ্চমাত্রার হস্তক্ষেপমূলক ইউরোপিয়ান ও মার্কিননীতির সম্পৃক্ত হওয়ার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। তার পরও কেউ কেউ যদি বলে, মুসলিম বিশ্বের সংস্কৃতির মধ্যেই অন্য যেকোনো সমাজের চেয়ে অনেক বেশি (প্রশ্নবোধক অনুপাত) সহিংসতার প্রতি ঝোঁক রয়েছে, তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে কেন মধ্যপ্রাচ্যে হঠাৎ করে সহিংসতা বিপুলভাবে বেড়ে গেল তার ব্যাখ্যা করার অবকাশ থেকে যায়।

দুঃখজনক বিষয় হলো, আমরা সবাই গত এক দশক ধরে সহিংস, সন্ত্রাসবাদ ও আত্মঘাতী বোমা হামলার দুনিয়া নিয়ে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, আমরা ভেবে বসে আছি, এটা হলো মুসলিম যুদ্ধবিগ্রহের রুটিন বিষয়। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এগুলো কৌশলগত দৃশ্যপট নিয়ে নতুন উপাদানের কথা প্রকাশ করছে। এখন বিশ্বাস করা কঠিন যে, মাত্র আড়াই দশক আগেও এ ধরনের ঘটনা ছিল একেবারেই অস্বাভাবিক। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০-এর দশকে আরব জাতীয়তাবাদের বিপ্লবী উত্তাপ এবং ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের কাছে বিপর্যয়কর পরাজয়ের মতো ঘটনাতেও মুসলিম বিশ্বে আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা বলতে গেলে শোনাই যায়নি। ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাত, তবে সেটা আত্মঘাতী মিশন নয়। লেবাননের শিয়ারাই লেবাননে আমেরিকান লক্ষ্যবস্তুর (১৯৮০-এর দশকের প্রথম দিকে মার্কিন দূতাবাস ও মার্কিন মেরিন ব্যারাকে) ওপর প্রথম সফলভাবে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়েছিল। তবে শ্রীলঙ্কায় হিন্দু তামিল টাইগার্স ১৯৮০-এর দশকে প্রথম নিয়মিতভাবে আত্মঘাতী পোশাক পরার প্রচলন ঘটিয়েছিল। ওই সময়ে তাদের অভিযানই ছিল আত্মঘাতী

কার্যক্রমের শীর্ষ হার। ওই সময়ের পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে আত্মঘাতীয় বোমা হামলা নাটকীয়ভাবে বাড়তে থাকে, যা ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন দখলদারিত্বের সময় সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে।

২০০৭ সালে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ আত্মঘাতী হামলা হয়। মার্কিন সরকারি হিসাবে ওই বছরের ৬৫৮টি হামলার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র-অধিকৃত আফগানিস্তান ও ইরাকে হয়েছিল ৫৪২টি। সংখ্যাটি এর আগের ২৫ বছরের মধ্যে যেকোনো সালের হামলার দ্বিগুণেরও বেশি। অধিকন্তু ওইসব আত্মঘাতী হামলার চার-পঞ্চমাংশের বেশি হয়েছে গত সাত বছরে, আর এই কৌশল এখন পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ওয়াশিংটন পোস্ট উল্লেখ করেছে, '১৯৮৩ সাল থেকে আর্জেন্টিনা থেকে আলজেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া থেকে চীন, ভারত থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত অর্ধশতাধিক গ্রুপ গাড়িবোমা ছাড়াও বিস্ফোরক বেল্ট, পোশাক, খেলনা, মোটরসাইকেল, বাইক, নৌকা, ব্যাকপ্যাক, ভুয়া অন্তঃসত্বা পেট তৈরি... ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করেছে। গত ২৫ বছরে ১৮৪০টি ঘটনার মধ্যে ২০০১ সাল থেকে ঘটেছে ৮৬ ভাগ এবং গত চার বছরে বার্ষিক সর্বোচ্চ ঘটনা ঘটেছে।'

আত্মঘাতী বোমা হামলা বাড়ার কারণ নিয়ে বিপুল তত্ব রয়েছে; বেশির ভাগ তত্ত্বে সংগ্রামের প্রকৃতি-বিষয়ক কোনো না কোনো মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। অনেক বিশ্লেষক আত্মঘাতী হামলা বাড়ার পেছনে ধর্মীয় উদ্দীপনা তুঙ্গে থাকার কথা তথা নিজেকে কোরবানি করে উম্মাহ ও মুসলিম বিশ্বকে রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা এবং বেহেশত লাভ করার ধারণাতে বিশ্বাস করেন। অনেকে আত্মহত্যা করার ইচ্ছার পেছনে নানা ব্যক্তিগত অস্বাভাবিকত্ব উল্লেখ করাতে মনে হতে পারে হামলাকারী বিচারশক্তিহীন। আবার কেউ কেউ এ ধরনের অস্বাভাবিক কাজের পেছনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক হতাশা রয়েছে বলে দাবি করেন।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট এ. পেপের মতে, এ ধরনের বেশির ভাগ কার্যক্রম আসলে বিদেশী দখলদারিত্ব এবং হানাদারদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষার প্রতি সরাসরি সাড়া দেয়ার ফল। আবার মার্ক স্যাগম্যানের মতো কেউ কেউ ওই ধারণাটির সাথে একটু দ্বিমত করেন। তাদের মতে, জাতীয়তাবাদী ও সাংস্কৃতিক ক্ষোভ চালকের অবস্থানে থাকলেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে অভিযান চালানোর সত্যিকারের প্রতিশ্রুতি আসলে বন্ধু কিংবা সংশ্লিষ্ট সমাজ সদস্যদের নিয়ে গঠিত গ্রুপ-ভাবনার শক্তিশালী ফল। তারা উদ্দেশ্যের জন্য একত্রে লড়াই করা ও মৃত্যু বরণের জন্য স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

উদ্দীপনা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ এটাই প্রতিষেধকের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিদ্রোহীদের গৃহীত কার্যক্রম ধর্মীয় দৃষ্টিতেই যে ভুল, তথা 'অনৈসলামিক' তা 'প্রমাণ' করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যার সহায়তাও গ্রহণ করেছে। ইসলামের নামে পরিচালিত সন্ত্রাসবাদের নিন্দা জানাতে

ওয়াশিংটন বিপুলসংখ্যক মুসলিম আলেমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তারা এসেছিলেনও। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, চরমপন্থীদের সামনে কেবল ইসলামের 'সঠিক ব্যাখ্যা' তুলে ধরার মধ্যেই সমস্যাটির সমাধান নেই। অধিকন্তু কোনো ইসলামি কর্তৃপক্ষেরই সম্ভবত ঘৃণ্য নীতি কিংবা হানাদার আমেরিকান সেনাবাহিনী ও দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা কার্যক্রমে অংশ নেয়া লোকদের বোঝানোর সামর্থ্য নেই। সৌদি বা মিসরীয় সিনিয়র আলেমরা অনেকবারই আলকায়েদা এবং অন্যান্য গ্র"পের সহিংসতাকে নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি ও ফতোয়া দিয়েছেন। তা ছাড়া অনেক বন্দীর কারা প্রকোষ্ঠে 'রূপান্তর' ঘটেছে, তারা 'তাদের পথে ভুল দেখতে পেয়ে' আগেকার সহিংস সম্পৃক্ততা ছেড়ে দিয়েছে।

এটা খুবই সম্ভব, সময়ের পরিক্রমায় আলেমদের চেষ্টায় অনেক চরমপন্থী তাদের চরমপন্থী কার্যক্রমে থাকা ভুলটি দেখতে পায়। কারাগার এ ধরনের রূপান্তরের জন্য আরো আকর্ষণীয় ভেনু মনে হলেও বন্দীদের হৃদয় পরিবর্তন আসলেই কতটুকু হয়, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। সৌদি আরব ও মিসরের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সিনিয়র আলেম সরকারের পকেটে থেকে চরমপন্থী মতাদর্শ নিয়ে শাসকদের বোধগম্য উদ্বেগ প্রশমনের কাজ করছেন বলে মনে করা হয়ে থাকে। ফলে চরমপন্থী যুবকদের মন আসলেই বদলে দিতে পারেন, এমন সত্যিকারের বিশ্বাসযোগ্য মধ্যপন্থী আলেমের সংখ্যা সীমিত।

বিদেশী দখলদারিত্ব; আমেরিকান, পাশ্চাত্য কিংবা ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর বিপুলসংখ্যক বেসামরিক লোকজনকে হত্যা; পর্যুদস্ত ও পরাজিত হওয়ার অনুভূতি; প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা, অনেক সময় নিজেদের পরিবারের লোকজনের নিহত হওয়ার মতো চলমান পরিস্থিতির কারণে বেশির ভাগ যুবক চরমপন্থী হয়ে পড়ে। এগুলো খুবই বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তব ইস্যু, ইসলামি মতাদর্শের সাথে অনেকাংশেই সম্পর্কহীন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাটকা নৃশংস অভিজ্ঞতা না হলেও টেলিভিশনে তা দেখা যায়। ইসলাম আত্মহত্যা বা বেসামরিক লোকজনকে হত্যা সমর্থন করে না, কেবল এমন খুতবা শুনেই চরমপন্থী কোনো ব্যক্তির সহিংসতা গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে, এমন সম্ভাবনা নেই। পরিবার, সম্প্রদায় ও ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকৃত বা কল্পিত আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে বা অপরাধীদের শাস্তি দিতে আগ্রহী ব্যক্তি শত্র"র রক্ত চাইবে। সে তার খুনে ক্রোধ চরিতার্থ করার লাইসেন্স ও ক্ষমতা প্রদানকারী ধর্মতাত্ত্বিক অভিমত না পাওয়া পর্যন্ত একের পর এক আলেমের কাছে যেতে থাকবে। ক্রোধ সৃষ্টি হয় প্রথমে, ধর্মতাত্ত্বিক সমর্থন এর পরের বিষয়, সেটা আসলে আগে থেকে নির্ধারিত সিদ্ধান্তের সমর্থনের প্রতি নৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি। এই দৃষ্টিতে পবিত্র কুরআনের মাত্র কয়েকটি আয়াতই হঠাৎ করে মনকে স্বচ্ছ করে দেবে, ক্রোধ ঠাণ্ডা করবে এবং বিবাদ মিটিয়ে দেবে– এমন কিছু খুঁজে পাওয়া সত্যিই খুব কঠিন। সঙ্কল্প আগেই মনকে অধিকার করে থাকে। অধিকন্তু বেশির ভাগ ধর্মের গ্রন্থগুলোতে অসংযমী বাক্য রয়েছে, যা সার্বিক পরিস্থিতি না বুঝেই সহিংস কার্যক্রম সমর্থনের প্রয়োগ করা যায়, ধর্ম তা দিয়ে কী বোঝাতে চায়, সেটা না বিবেচনা করেই।

মুসলিম কর্তৃপক্ষের মগজ ধোলাইয়ে কোনো কাজই হয় না। সৌদি আরবের শিয়াদের স্কুলগুলোতে শিয়া মতবাদের জন্য মর্যাদাহানিকর পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু ওই এলাকার শিয়ারা বলছে, তাদের সন্তানেরা স্কুলে এসব বক্তব্য হেসে এড়িয়ে যেতে জানে। একইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো একনায়কতান্ত্রিক সমাজে জনসাধারণের বড় অংশই জানত, সরকারি মিডিয়ায় প্রচারিত প্রপাগান্ডা মিথ্যা। তারা প্রকাশ্যে এগুলো আন্তরিকতাহীনভাবে পালন করলেও তাদের মনে এসব আইডিয়াকে পরিকল্পিতভাবেই পুরোপুরি বাতিল করে দিত। সংক্ষেপে বলা যায়, পাঠ্যপুস্তক বা তথ্য ব্যবস্থায় কোনো দাবির উল্লেখ করা মানেই ওই বার্তা সন্দিগ্ধ সমাজে গ্রহণ করা হবে তা ঠিক নয়।

রক্তপাতমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য আলকায়েদার দেয়া ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বক্তব্য অনেক উদার মুসলমান গ্রহণ করেন না। তবে তারাও মেনে নেন, মুসলিম বিশ্বের জন্য সময়টা বিপজ্জনক, কিন্তু তাই বলে পাশ্চাত্যের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণও তাদের কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ নয়। তারা হয়তো ওই ধরনের কাজ পরিহার করেন, কিন্তু তবুও তারা এটাকেই ‘দুর্বলের অস্ত্র’ হিসেবে একমাত্র সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া মনে করেন। মুসলিম সমাজ হয়তো এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য গভীরভাবে অনুতপ্ত এবং তাদের ছেলেমেয়ের এ ধরনের কাজে সম্পৃক্ততা নিয়ে ভীত। কিন্তু তবুও তাদের কাছে এটা ‘বোধগম্য’ যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন কিছু ঘটতেই পারে এবং তাই ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে সহিংস কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়াদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে নিন্দা জানানো তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধরনের সহিংস প্রতিক্রিয়ার প্রতি সামাজিক পর্যায়ের মৌন সম্মতি সন্ত্রাসী কাজের স্থায়িত্বে অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কারণ সহিংস ব্যক্তিরা নিজেরা সেখানে অস্তিত্বশীল।

সমাজগুলো নিজেদের রক্ষা করে। একটা পর্যায়ে এটা তেমনই সরল। বুশ প্রশাসন দাবি করেছিল, তারা স্রেফ নিজেদের রক্ষার জন্য সন্ত্রাসীরা যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে ইরাকেই তাদেরকে হত্যা করছে। কিন্তু প্রায় সব সঙ্ঘাত, যুদ্ধ ও শক্তির খেলার ঘটনা ঘটছে বহিরাগত শক্তির আক্রমণে মুসলিম জমিনে এবং খুবই দীর্ঘ সময় ধরে। মার্কিন বাহিনীর লক্ষ্য বিশ্ব জয় হওয়ায় আত্মরক্ষার যুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে মুসলমানদের কাছেই অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক।

বিশেষ করে একেশ্বরবাদী সংস্কৃতিতে ধর্ম সব সময়ই লোকজনকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করে এবং প্রধান প্রধান অভিযান, লড়াই, যুদ্ধকে যৌক্তিক প্রতিপন্ন করে। তবে কারণ, অভিযান, যুদ্ধ, লড়াইÑ এগুলো ধর্মের বিষয় নয়। ধর্মকে সরিয়ে নিন, দেখবেন তখনো কারণ, অভিযান, লড়াই ও যুদ্ধ রয়েই গেছে।

অধ্যায় চৌদ্দ : কী করতে হবে? মুসলিম বিশ্বের সাথে নতুন নীতি অবলম্বন

প্রকৃত বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ

এখন পর্যন্ত কেউ এই পৃথিবী থেকে সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটাতে পারেনি। এটা অন্যান্য উপায়ের রাজনীতির অন্যতম একটি রূপ এবং অনেক বেশি কলঙ্কময়। অবশ্য এটাকে নিয়ন্ত্রণ ও সীমিত করা যেতে পারে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান মার্কিন নীতি সেটা করতে যাচ্ছে না; বরং বাস্তবে তারা সমস্যাটিকে বাড়িয়ে তুলছে। আমেরিকান সরকারের প্রথম ভুলটি হলো সন্ত্রাসবাদের জন্য আইনগত এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধিমূলক সংজ্ঞার ব্যবহার, যা আসল সমস্যাটির সমাধান করে না। অনিবার্য সত্য হলো, সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ নিয়ে আন্তর্জাতিক সর্বসম্মত ঐকমত্য অনেক দিন ধরেই কন্টকাকীর্ণ বিষয় হয়ে রয়েছে। সরকারগুলোর কার্যত শেষ কথা 'আমি যেটাকে বলব, সেটাই সন্ত্রাসবাদ', অর্থাৎ তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য উদ্দেশ্যমূলক, নিজের স্বার্থসিদ্ধিকরমূলক সংজ্ঞা। ২০০৪ সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেয়া সংজ্ঞাটি বিশেষভাবে মনগড়া। এতে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে : 'ভীতি সৃষ্টির লক্ষ্যে অন্যায় সহিংসতার হিসাবি ব্যবহার কিংবা অন্যায় সহিংসতার হুমকি; সাধারণভাবে রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা মতাদর্শগত লক্ষ্য হাসিলের জন্য রাষ্ট্রে বা সমাজে উৎপীড়ন বা ভীতি প্রদর্শনের ষড়যন্ত্র করা।'

এ বিবৃতির রাজনৈতিক অসৎ ব্যবহার হলো 'অন্যায় সহিংসতার ব্যবহার' শব্দসমষ্টি। 'অন্যায়' পরিভাষাটির কোনো সংজ্ঞাই দেয়া হয়নি, তবে দৃশ্যত তা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যা 'সরকারের অনুমোদিত নয়।' অবশ্য ন্যায়সঙ্গতের সঠিক সংজ্ঞা কী- তা নিয়েই কি সাধারণত রাজনৈতিক সংগ্রামগুলো আবর্তিত হয় না? আধুনিক পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তাবিদেরা রাষ্ট্রকে সহিংসতার ব্যবহার প্রশ্নে একমাত্র বৈধ শক্তি বিবেচনা করেন। অর্থাৎ 'রাষ্ট্র' = 'ন্যায়সঙ্গত'। বেশির ভাগ পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশের সরকার ঐকমত্যের ভিত্তিতে শাসনকাজ পরিচালনা করায় সেখানে এই সমীকরণটি যথাযথ। কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে রাজনৈতিক বিরোধীদের দূরে রাখায় ও নির্যাতন করায় এবং যেসব স্থানে কোনো না কোনো ধরনের 'অন্যায়' কার্যক্রমের মাধ্যম ছাড়া কখনো পরিবর্তন আসে না, সেখানকার জন্য এটা অনেক দুর্বল যুক্তি। এসব সরকার সব ধরনের বিরোধিতাকে 'অন্যায়' হিসেবে শনাক্ত করতে চায়। আর এ ধরনের কার্যক্রম প্রায়ই কার্যত সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিকদের তাৎপর্যপূর্ণ গ্র"পের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের আকারে উপস্থাপন করা হয়।

৯/১১ এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধের ঘটনাবলি যেকোনো ধরনের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের মুখে থাকা সব রাষ্ট্রকে বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন করে তাদেরকে তাদের বিরোধীদের 'সন্ত্রাসবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করার সামর্থ্য দিয়ে দিয়েছে। 'সন্ত্রাসবাদ' অবশ্যই সবার মেনে নেয়া যুক্তি; একবার এর আশ্রয় নেয়া হলে কোনো রাজনৈতিক সমাধান বা আলোচনার অবকাশ থাকে না, এবং বিরোধীদের মুছে ফেলার জন্য সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগের পূর্ণ নৈতিক ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকে। সারা বিশ্বের সরকারগুলো ঝড়ো বাতাসে পড়া পাতার মতো করে বুশের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধে যোগ দিয়ে নিজেদেরকে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে নৈতিকভাবে সত্যনিষ্ঠ শিবিরে যোগ দিতে দেখেছে, যেখানে কোনো ধরনের আপসের অবকাশ নেই। মিচেল ওয়ালজার কৌশলীভাবে সমস্যাটি তুলে ধরেছেন : 'প্রথমে সন্ত্রাসবাদের অজুহাত পাওয়ার জন্য নিপীড়ন করা হয়, এবং তারপর নিপীড়নের জন্য সন্ত্রাসবাদকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রথমটি অতি বামদের অজুহাত; দ্বিতীয়টি নব্য-রক্ষণশীল ডানদের অজুহাত।'

সব সমাজেই রাজনৈতিক সহিংসতা অনাকাঙ্ক্ষিত- এ ব্যাপারে প্রত্যেকেই একমত। সন্ত্রাসবাদ এক ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতা। তবে বিশ্বের বেশির ভাগ স্থানে উৎপীড়ক শাসক তাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে রাজনৈতিক সহিংসতার আশ্রয় নিয়ে থাকে। অবৈধ শাসককে অনিবার্যভাবেই রাজনৈতিক সহিংসতা দিয়েই মোকাবেলা করা হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার ভাষায় ভিত্তি ছিল এটি :

শাসিতদের সম্মতিতে ন্যায়সঙ্গত শক্তি থেকে পাওয়া সরকার হলো মানুষের প্রতিষ্ঠান।... যখনই যেকোনো ধরনের সরকার এসব দিক থেকে ধ্বংসকারী হয়ে পড়ে, তখন জনগণের অধিকার রয়েছে সেগুলো পরিবর্তন বা বিলুপ্ত করা... যখন অপব্যবহার ও হস্তক্ষেপের দীর্ঘ সারি থাকে... তারা নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারীর অধীনে পরিণত হতে দেখতে পেলে, তাদের অধিকার, তাদের কর্তব্য এ ধরনের সরকারকে উৎখাত করা এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ রাখার জন্য নতুন প্রহরীর ব্যবস্থা করা।

সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বে- আমরা এখন কেবল মুসলিমদের কথাই বলছি না, বরং পুরো উন্নয়নশীল বিশ্বের কথা বলছি- অন্তত তিনটি পরিস্থিতি রয়েছে, যার অধীনে রাজনৈতিক সহিংসতা যুক্তির আলোকে গ্রহণযোগ্য : স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত, জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম, এবং বিদেশী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম।

১. স্বৈরাচারী সরকার উৎখাত : মুসলিম বিশ্বে স্বৈরাচারী সরকার থাকার আনুপাতিক হার অনেক বেশি, তাদের অনেককে দশকের পর দশক ধরে পাশ্চাত্য সমর্থন করে যাচ্ছে। তারা সহিংসতা ও কারারুদ্ধকরণসহ নানাভাবে রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন করতে সিদ্ধহস্ত। সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সন্ত্রাস কি এর সর্বগ্রাসীভাবে দমনকাজ চালানোর যৌক্তিকতা দেয়? রাষ্ট্র যদি

উৎপীড়ক হয়, তবে সশস্ত্র সংগ্রাম ও বিদ্রোহ কিভাবে ন্যায়সঙ্গত হবে? দুঃখজনক বিষয় হলো, খুব কম রাষ্ট্রই মহাত্মা গান্ধী বা নেলসন ম্যান্ডেলা তৈরি করতে পেরেছে।

২. জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম : ঐতিহাসিক কারণে আফ্রিকা ও ইউরেশিয়ায় ঔপনিবেশিক সীমান্তের সাম্রাজ্যিক পুনর্নির্ধারণসহ, শত শত জাতিগত গ্র"প নিজেদেরকে কৃত্রিম সীমান্তে বিভক্ত দেখতে পায় কিংবা এমন রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেদের দেখতে পায় যা তাদের কাছে সাংস্কৃতিকভাবে অপরিচিত, যেখানে প্রায়ই তাদের পরিচিতি ও সাংস্কৃতিক অধিকার দমন করা হয় এবং এসব রাষ্ট্রের মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তাদের সাথে কখনো আলোচনা করা হয়নি। এসব জাতিগত গ্র"পের মধ্যে রয়েছে চেচেন; কাশ্মিরি; চীনের উইঘুর ও তিব্বতি, শ্রীলঙ্কার তামিল; ফিলিস্তিনি; ভারতের শিখ; তুরস্ক, ইরান ও ইরাকের কুর্দি; ফিলিপাইনের মরো; পাকিস্তানে (প্রাক-বাংলাদেশে) বাঙালি; নাইজেরিয়ার ইগবো; ইথিওপিয়ায় ইরিত্রিয়ান (স্বাধীনতা অর্জনের আগে); সার্বিয়ার আলবেনীয় কসোভা- তালিকাটি অনেক বড়। এসব সম্প্রদায় জাতিগত হতে পারে কিংবা ধর্মীয়ও হওয়া সম্ভব।

ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক রাষ্ট্রই 'অন্যায় সহিংসতা' (সাধারণত ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যিকবিরোধী সংগ্রামের মাধ্যমে) অবসান করে পূর্ণ বৈধ হিসেবে এখন স্বীকৃতি পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে তুরস্ক, ইসরাইল, চীন, মেক্সিকো, এঙ্গোলা, ইন্দোনেশিয়া, গ্রিস, বুলগেরিয়া, কিউবা, ভিয়েতনাম, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুক্তরাষ্ট্র। এখানে কেবল গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দেশের নাম উল্লেখ করা হলো। পেন্টাগন আজ যেসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করছে, সেগুলো যদি ব্রিটিশ বোধগম্য বৈধতার বিরুদ্ধে ১৭৭৬ সালের আমেরিকান বিপ্লবীদের অনুসৃত 'অন্যায় সহিংসতা'র ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তবে আমরা আমেরিকান প্রজাতন্ত্রটি পাবো না। কেনিয়ার জোমো কেনিয়াত্তা, ইসরাইলের মেনাহেম বেগিন বা দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলার মতো শুরুতে সন্ত্রাসী বিবেচিত নেতাদের ভুলে গেলে চলবে না। তাদের জয়ের পর তারা সবাই গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রনায়ক বিবেচিত হয়েছেন।

স্থিতাবস্থা ও রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন অব্যাহতভাবে দিয়ে যাওয়ার আধুনিক যুগে আমেরিকার নীতি, - এমনকি স্থিতাবস্থা রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র উৎপীড়ন করলেও অনেক সময় তীব্র আবেগপ্রসূত যন্ত্রণাও সৃষ্টি করে। ব্যতিক্রমও আছে। তবে সেটা হলো বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহকবলিত রাষ্ট্রটি যদি ওয়াশিংটনের প্রতি বৈরী হয়। সে ক্ষেত্রে নীতিবোধ ভেঙে পড়ে, মার্কিননীতি তখন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতি ব্যাপকতর সহানুভূতি বা সমর্থন প্রকাশ করে। উদাহরণ হলো সাদ্দামের ইরাকে কুর্দি; ইরানের বালুচ; ইউএসএসআরে ইউক্রেনীয়, লাতভীয়; এবং আরো অনেক; মাওয়ের চীনে তিব্বতি ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩. বিদেশী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ : অতি সম্প্রতি ইরাক, আফগানিস্তান ও সোমালিয়ায় মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। যদিও ১৯৮০-এর দশকে আফগানিস্তানে রেড আর্মির বিরুদ্ধে

সন্ত্রাসী প্রতিরোধ বিপুলভাবে সমর্থন করেছিল ওয়াশিংটন। যুদ্ধে অধিকৃত জনগণের কি সশস্ত্র প্রতিরোধের অধিকার নেই? যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলো, এমনকি গণতান্ত্রিকগুলো পর্যন্ত, সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য সহিংসতার মাত্রা নিয়ে প্রকাশ্যে সমঝোতায় আসতে অস্বীকার করে। তারা তাদের কর্মকাণ্ডের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে অনিবার্য প্রয়োজনের সার্বজনীন সংজ্ঞাটি গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করবে। নিজেদের চোখে রাষ্ট্র সবসময়ই ঠিক, রাষ্ট্র সবসময়ই নৈতিকতাসম্পন্ন।

প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের আনুপাতিক মাত্রার প্রশ্নও ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের ক্লাসিক বিতর্কের মধ্যে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সন্ত্রাসীদের হাতে কয়েকজন সৈন্য নিহত হলে জবাব হিসেবে এক শ' গুণ বেশি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত কি নৈতিকভাবে বৈধ বিবেচিত হবে? ভীতি প্রদর্শন হিসেবে 'একটি চোখের বদলায় এক শ' চোখ' নেয়ার ইসরাইল অনুসৃত অনানুষ্ঠানিক কৌশলটির ব্যাপারে কী কথা? 'শত্রুর মধ্যে ভীতি সৃষ্টিকারী প্রবল শক্তি প্রদর্শন' করার নৈতিকতা সম্পর্কে কী বলার আছে? সামরিক অভিযান চালিয়ে সরকার পরিবর্তন? বেসামরিক নাগরিকদের ওপর বোমা হামলা? এখানে আমরা আবারো তুলনামূলকতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পিচ্ছিল পথে পড়ে যাই : সন্ত্রাসীদের হত্যা করার প্রয়াসে ৫০ হাজার ফুট দূর থেকে বোমা ফেলা বৈধ যেখানে নিরীহ লোকজনের মৃত্যুর ব্যাপক আশঙ্কা থাকে কিন্তু জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে পাঁচ ফুট দূর থেকে শত্র"কে হত্যার জন্য একটি একক আত্মঘাতী বোমা হামলা, এখানেও নিরীহ মানুষ মারা যায়, চালানো অনৈতিক? সন্দেহাতীতভাবেই সন্ত্রাসবাদের কিছু কিছু কাজ অনেকটাই বাছবিচারহীন এবং সেটা আতঙ্ক ছড়ানো ও মনোবল গুঁড়িয়ে দিতে প্রণীত; কিন্তু তাহলে ড্রেসডেন, হিরোশিমা বা নাগাসাকিতে কোন মহান উদ্দেশ্যে সন্ত্রস্ত্রকরণ এবং মনোবল গুঁড়িয়ে দেয়ার যেটাকে আধুনিক পরিভাষায় বলা হয়, যুদ্ধে জয়ী হতে 'শত্র"র মধ্যে ভীতি সৃষ্টিকারী প্রবল শক্তি প্রদর্শন' নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল? মুসলিম বিশ্ব এবং অন্যত্র নানামুখী সঙ্কটের সাথে এসব প্রশ্নের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। এমনসব পরিস্থিতির মধ্যে 'মুসলিম' বলে একেবারেই কিছু নেই, কেবল প্রতিরোধ করার ইচ্ছা জোরদার করার সম্ভাবনাময় ইসলামি সংহতি ছাড়া।

এসব প্রশ্ন সত্ত্বেও তুলনামূলক ন্যায়বিচারের নমনীয় ও পিচ্ছিল সংজ্ঞার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের অস্তিত্ব সরিয়ে রাখার কাজটি করা হবে ভুল। সন্ত্রাসবাদের অস্তিত্ব রয়েছে এবং তা সমাজের জন্য অভিশাপ। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত লোকজন সাধারণত সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ের নির্মম ও বিকারগ্রস্ত হয়ে অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত থাকে কিংবা শক্তিশালীভাবে চালিত মতাদর্শগত ধর্মান্ধদের সাথে জড়িত থাকে। তবে কোনো অবস্থাতেই সবাই নয়। নিপীড়ন ও যুদ্ধের মতো কঠিন পরিস্থিতি অনাকাঙ্খিক্ষত সামাজিক উপাদান এবং সেই সাথে অন্যান্য নাগরিকের কাছ থেকে সহিংস প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। সন্ত্রাসবাদের জন্য পছন্দ করা সংজ্ঞা অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগযোগ্য হতে হবে। ওয়াশিংটনের স্বার্থসিদ্ধিমূলক ও বাছাই করা পরিভাষার ব্যবহারে তার আইনগত, বিশ্লেষণমূলক ও বৈধতা দানের প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং কেবল মুসলিম বিশ্বের কাছেই নয়, সারা বিশ্বের চোখে তার বিষয়টি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

সংজ্ঞা প্রশ্নে মতৈক্যের অভাবকে ইচ্ছার স্থবিরতা সৃষ্টি করতে দেয়া উচিত নয়। অত্যাবশ্যকীয় কাজটি হলো এসব বিষয় নিয়ে বাকি বিশ্বের বেশির ভাগ অংশের বিবেচনার আলোকে আন্তর্জাতিক আদর্শের কর্মপন্থা গ্রহণ করা। ইরাকের ব্যাপারে বাস্তবতা হলো, ওয়াশিংটন যেভাবে দেখে কিংবা মার্কিন মূলধারার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তব পরিস্থিতি যেভাবে অগ্রাহ্য করা হয়, বিশ্বের বিরাট অংশ থেকে এসব ইস্যু সেভাবে বিবেচনা করে না। আঞ্চলিক বাস্তবতা ও বিরাজমান দুর্দশামূলক অবস্থা স্বীকার করার ব্যাপারে ব্যর্থতা নিশ্চিতভাবেই প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নীতির ব্যর্থতা নিশ্চিত করবে, যেভাবে ব্যর্থ হয়েছিল বুশ প্রশাসনের অধীনে। অন্য জাতীয়তাবাদীদের মতো জাতীয়তাবাদী দুর্দশার নামে যুদ্ধকারী বেশির ভাগ মুসলিমকে কোনোভাবেই 'সন্ত্রাসী' নয়, বরং তাদেরকে রাজনৈতিক বিরোধী হিসেবে স্বীকার করতে হবে। তাদের সাথে প্রয়োজন কোনো না কোনো ধরনের রাজনৈতিক সদাচরণ প্রদর্শন বা আলোচনা করা। বিদ্রোহ হয়তো 'অবৈধ,' কিন্তু অন্যায় পরিস্থিতিতে এটা হলো অনিবার্য মানবীয় প্রতিক্রিয়া।

কোনো মানুষকে হত্যা করা যে নৈতিকভাবে ভুল তাতে প্রায় সবাই একমত। যদিও ওই কাঠামোর মধ্যেই পাশ্চাত্য আইন সতর্কভাবে ফার্স্ট ডিগ্রি (পূর্ব পরিকল্পিত ও ইচ্ছাকৃত), সেকেন্ড-ডিগ্রি (ইচ্ছাকৃত, তবে পূর্ব-পরিকল্পিত নয়), এবং থার্ড-ডিগ্রি (আবেগপ্রসূত) খুন, নরহত্যা, অবহেলাজনিত নরহত্যার মধ্যে পার্থক্য রচনা করে; এটা নির্দিষ্ট কিছু ঘাতককে হত্যা করলেও অন্যদের করে না। রাজনৈতিক সহিংসতা এবং সেই সাথে সন্ত্রাসবাদের পারিপার্শ্বিকতায় ক্রমবিন্যাসগত বৈচিত্র্যতার মধ্যকার পার্থক্য করার কর্মপন্থা থাকতেই হবে। প্রায় সব রাষ্ট্রনায়ক এসবের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করে : (ক) হামাস, তারা ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে অবস্থিত অধিকৃত সঙ্কীর্ণ ভৌগোলিক সীমার মধ্যে গেরিলা ও সন্ত্রাসী কৌশল অবলম্বন করছে, কিংবা (খ) ইরাক ও পশতুরা তাদের নিজেদের মাটিতে আমেরিকান সামরিক দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, কিংবা (গ) আলকায়েদার মতো গ্রুপ, তারা তাদের সামগ্রিকতায় পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে লড়ছে, ঠিক যেভাবে রেড ব্রিগেড, বদর মেইনহফ গ্রুপ [পশ্চিম জার্মানির বামধারার গেরিলা দল] বা আওম শিনরিকিয়ো লড়াই করছিল।

সন্ত্রাসীদের সাথে ‘আলোচনা করা’

বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসী আন্দোলনগুলোকে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে বুশ প্রশাসন সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে অস্বীকৃতি জানায় : ‘ভালো’ সন্ত্রাসী বলে কিছু নেই। তবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বাক্যবাণ সৃষ্টিকারী নীতিকথা সত্ত্বেও রাষ্ট্রনায়কেরা শেষ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে অনেক সন্ত্রাসী গ্রুপের সাথে আলোচনা করেছেন। এর মূল কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন, আলোচনার মাধ্যমেই শেষ পর্যন্ত কোনো একটা সমাধান আসতে পারে। ব্রিটিশরা আলোচনা করেছিল আইআরএ’র সাথে; বিপুল ইসরাইলি বিশ্বাস করে, তাদের অবশ্যই হামাসের সাথে আলোচনা করতে হবে। (মনে করে দেখুন তো, কখন ইসরাইল সন্ত্রাসী পিএলওর সাথে আলোচনা করতে অস্বীকার করেছিল?) অনেক আমেরিকান বিশ্বাস করে, আমাদের অবশ্যই হামাস ও হিজবুল্লাহ কিংবা ইরাকের বাথ পার্টি বা আফগানিস্তানের তালেবানের সাথে উদাহরণ হিসেবে আলোচনা করতে হবে। কারণ এগুলোকে অভ্যন্তরীণ, সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক লক্ষ্য-সম্পন্ন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন গ্রুপ বলে তারা মনে করে।

রাজনৈতিক সহিংসতায় নিয়োজিত ‘বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন’ রাজনৈতিক গ্রুপগুলো সাধারণ সুনির্দিষ্ট, সীমিত, বাস্তবসম্মত লক্ষ্য ধারণ করে। তাদের অফিস থাকে যেখানে যাওয়া যায়, কর্মসূচি থাকে, পাম্পলেট থাকে, তাদের দাবির পক্ষে প্রচারকাজের সামগ্রী ও প্রতিবেদন থাকে, এগুলোর নেতৃত্বদানকারীদের শনাক্ত করা যায়, তারা সাক্ষাৎকার দিতে পারেন, তারা প্রকাশ্যে কথা বলেন। আমরা তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝতে পারি এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হিসেবে ধরে নিতে পারে, এমনকি যদি তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের আমরা বিরোধিতাও করি। কেউ কেউ আমাদের চোখে সহানুভূতি সৃষ্টি করে, কেউ কেউ নিন্দা পায়। তাদের সবাইকে রূঢ়ভাবে ‘সন্ত্রাসী’ বলা বিশ্লেষণগতভাবে কাঁচা ও বিপরীত ফল সৃষ্টিকারী। কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে আলোচনা না করা পর্যন্ত বারবার বলতে থাকে তারা কখনোই আলোচনা করবে না; স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত বলতে থাকে আমরা ‘কখনো স্বীকৃতি দেবো না...।’ মাঝে মধ্যে আরো ব্যাপক আলোচনাগত নিষ্পত্তির পথে সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে কথিত নীতিগত অবস্থানটি শেষ পর্যন্ত আলোচনাগত অঙ্গভঙ্গির চেয়ে বেশি কিছু হয় না।

‘কারো কাছে সন্ত্রাসী অন্যজনের কাছে মুক্তিকামী যোদ্ধা’ শিরোনামের বিবৃতিটি একেবারে ঘোরপ্যাঁচহীন, যদিও সেটা সত্যের অনেক কাছে। এটি এমন যুক্তি যাতে বেশির ভাগ সরকারই ক্ষুব্ধ হয়, কারণ এটা যুদ্ধরত পক্ষগুলোর মধ্যে ‘নৈতিক সাম্যতা’ সৃষ্টি করে, যে ধারণাটা উভয় পক্ষ ঘৃণা করে। সমস্যাটির সারমর্ম হলো, আমরা যেটাকে ‘প্রতিরোধ’ হিসেবে স্বীকার করছি, তা আসলে একটি রাজনৈতিক আহ্বান। কার কাছে কোনটা, সেটা নির্ভর করছে সে কর্তৃপক্ষকে বা প্রতিরোধকারী কোন পক্ষকে অনুকূল বিবেচনা করছে তার ওপর। বিশ্বজুড়ে বেশির ভাগ সরকার নীতির কথা বলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ‘সন্ত্রাসী’ কে– সে সংজ্ঞা তাদের নিজস্ব সাময়িক স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল। এসব আন্দোলনের সবই কোনো না কোনো ধরনের অদম্য ইসলামি এজেন্ডায় চালিত– এমন ধারণায় আমরা যদি এঁটে থাকি, তবে সমস্যা লাঘব করার কোনো পথ কখনোই খুঁজে পাবো না। প্রায় সব আন্দোলনই অধর্মীয়, চূড়ান্ত পর্যায়ে আলোচনাযোগ্য লক্ষ্যসংবলিত।

সন্ত্রাসবাদ কিভাবে শেষ হবে

সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সন্ত্রাসবিষয়ক সবচেয়ে ব্যাপকভিত্তিক ও আকর্ষণীয় পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ হলো, ২০০৮ সালের র‌্যান্ডের 'কিভাবে সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো শেষ হবে' শীর্ষক প্রতিবেদন। র‌্যান্ড গ্রুপ ১৯৬৮ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ৬৪৮টি আন্দোলন বিশ্লেষণ করেছে। তাদের প্রধান আবিষ্কার হলো, 'রাজনৈতিক-প্রক্রিয়ার পটপরিবর্তন হলো সন্ত্রাসী গ্র"পগুলোর শেষ হওয়ার সবচেয়ে সাধারণ পথ।' সংক্ষেপে বলা যায় :

বৃহত্তম গ্রুপটি, সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর ৪৩ ভাগ, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পথে তথা সমঝোতার মাধ্যমে শেষ হয়েছে। র‌্যান্ড সমীক্ষায় আরো দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে বলা হয়েছে, 'রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাব্যতা সন্ত্রাসী লক্ষ্যগুলোর প্রসারতার সাথে বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত।' অন্য কথায় বলা যায়, দুর্দশা ও লক্ষ্য যত বেশি সুনির্দিষ্ট, বাস্তবসম্মত ও স্থানীয় হবে, সেগুলো মানিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা তত বাড়বে।

৪০ ভাগ ঘটনায় সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো রাজনৈতিক সমন্বয়ের পথে যেতে পারেনি বা আগ্রহী ছিল না। তবে এসব গ্রুপকে নিবৃত্ত করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় ছিল সামরিক নয়, বরং পুলিশিব্যবস্থা। সামরিকভাবে বাছবিচারহীন ভোঁতা পন্থার চেয়ে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এসব গ্র"পকে বোঝা, অনুপ্রবেশ ও নিবৃত্ত করতে অনেক বেশি সক্ষম।

১০ ভাগ ক্ষেত্রে, লক্ষ্য অর্জিত হওয়ায় সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো শেষ হয়ে গেছে। মাত্র ৭ ভাগ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর কার্যক্রম স্তব্ধ করতে সামরিক কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয়েছিল।

'অন্যদের চেয়ে ধর্মীয় সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোকে নির্মূল করতে বেশি সময় লাগে।' অন্য কথায়, 'ধর্মীয় গ্রুপগুলো খুব সামান্যই তাদের লক্ষ্য হাসিল করতে পারে।' প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়েছে : 'গ্রুপের ভাগ্য নির্ধারণে আকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১০ হাজারের বেশি সদস্যবিশিষ্ট বড় বড় গ্রুপের

বিজয়ের হার ২৫ ভাগের বেশি, আর এক হাজারের কম সদস্যের ছোট গ্র“পের বিজয়লাভ বিরল ঘটনা।’

‘কোনো সন্ত্রাসী গ্রুপ বিদ্রোহে সম্পৃক্ত হলে তা সহজে শেষ হয় না। প্রায় ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে গ্র“পগুলো সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শেষ হয়েছে; ২৫ ভাগ ক্ষেত্রে বিজয় পেয়েছে; এবং ১৯ ভাগ ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী তাদের পরাজিত করেছে।’ এটা ইরাক ও আফগানিস্তান পরিস্থিতির কথা বলে।

‘বাস্তববাদীদের’ মধ্যে মিশে থাকা ‘বৈশ্বিক’ আন্দোলনের যুগপৎ অস্তিত্ব, যেমনটা আমরা ইরাক ও আফগানিস্তানে দেখেছি, খুব সম্ভবত উদারপন্থীসহ জনগণকে সার্বিকভাবে চরমপন্থী করা জোরদার করে। একইভাবে ‘বাস্তববাদী’ সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর সাথে রাজনৈতিক নিষ্পত্তি রাজনৈতিক পরিবেশের উত্তাপ বিপুলভাবে কমিয়ে দেয় এবং স্থানীয় জনগণ তখন আলকায়েদার মতো গ্রুপগুলোর সাথে কম সম্পৃক্ত হয়। ওইসব গ্রুপ যখন উদ্দেশ্যের জন্য যুদ্ধ করে, জনগণ তখন তাতে স্থানীয় জনস্বার্থের সাথে পুরোপুরি সংশ্লিষ্ট দেখতে পায় না।

বিচক্ষণ সাড়া

সবশেষ কথা হলো, সন্ত্রাসবাদকে মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের পরিবেশ, উদ্বেগ ও যন্ত্রণা থেকে আলাদা করা যায় না। আমরা সবাই জানি, সন্ত্রাসবাদ হলো দুর্বলের হাতিয়ার। তবে মুসলমানদের সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ অগ্রহণযোগ্য হলেও তাতে তাদের দুর্দশার প্রতিবাদ কোনোভাবেই অন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় না। আলকায়েদার হাইজ্যাকাররা, ইসলাম তাদের জন্য কাজ করেছে সূর্যের আলোতে রাখা ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস হিসেবে- এসব বিপুল বিস্তৃত, সবার অভিন্ন দুর্দশা একত্র করে সেগুলোকে প্রচণ্ড রশ্মিতে ফোকাস করেছে, মুহূর্তটিতে বিদেশী অনুপ্রবেশের দীর্ঘ স্থায়ী উৎসের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। হামলার আগেও দুর্দশা ছিল এবং এখনো ব্যাপকভাবে বহাল রয়েছে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ইতিহাস ৯/১১ দিয়ে শুরু হয়নি। কয়েক দশক ধরে মার্কিন লক্ষ্যকে মুসলিমদের লক্ষ্যে পরিণত করার জন্য আমেরিকানদের প্রয়াস ব্যাপকভাবে বাড়তে দেখা গেছে। এই প্রয়াস কেবল ব্যর্থই হয়নি, কোনো সমস্যার সমাধানও করেনি, বরং তা মুসলিম বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীব্র ভাবাবেগ ফুটিয়ে তুলেছে, দেশটিকে এর জন্য বিপুল মূল্য দিতে হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য স্থানে সন্ত্রাসবাদ শেষ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে কমতে পারে, তবে সেটার একমাত্র পথ, যে কারণে সন্ত্রাস বাড়ছে, সেটা যদি দূর হয়। মার্কিন বাহিনী যত বেশি হারে বিদ্যমান চরমপন্থীদের ধাওয়া করবে, হত্যা করবে, তত বেশি নতুন, আরো বেশি উদ্দীপ্ত নতুন প্রজন্মের চরমপন্থীর আবির্ভাব ঘটবে। সামরিক হামলা সাংগঠনিকভাবে তাদের হয়তো দুর্বল করে, কিন্তু তাদের সংখ্যা সাথে সাথে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দেয় এক সঙ্ঘাত এলাকা থেকে অন্য সঙ্ঘাত এলাকায়। এভাবে পাড়ি দেয়া আকস্মিক হামলায় পারদর্শী মুসলিম বিদেশী বাহিনীর সৈন্যরা কিংবা নিজ দেশের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের সাধারণ আমেরিকার মদদপুষ্টদের বিরুদ্ধে জনগণ সহিংসতার আশ্রয় নেয়। দেশে দেশে, সেনাবাহিনী সেনাবাহিনীতে ঝামেলা পাকানোর জন্য খুব বেশি লোকের দরকার পড়ে না। ফিলিস্তিনে ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা ইসরাইলি দখলদারিত্ব এ ধরনের ব্যর্থতা তুলে ধরছে; ইসরাইল যা কেবল অর্জন করতে পেরেছে তা হলো প্রায় বিশ্বজুড়ে প্রতিধ্বনিত হওয়া অঞ্চলব্যাপী প্রবাদপ্রতিম প্রতিরোধ সৃষ্টি করা।

চূড়ান্তপর্যায়ে সন্ত্রাসবাদ অবসানের দায়দায়িত্ব মুসলিম জনসাধারণের কাঁধেই বর্তায়। তবে এমনটা হওয়ার জন্য প্রথমে এই চরমপন্থা বৃদ্ধিকারী এবং ব্যাপক বিস্তৃত আমেরিকানবিরোধী মনোভাব সৃষ্টিকারী পরিস্থিতির অবসান ঘটাতেই হবে। একেবারে সোজাসাপ্টাভাবে এ দিয়ে যা বোঝানো হচ্ছে, তা হলো মুসলিম দেশগুলোর মাটিতে একটা বিদেশী সৈন্যও থাকতে পারবে না, বিদেশী সামরিকবাহিনী বিদেশের মাটিতে কোনো আক্রমণ– বর্তমানে আমেরিকা নিজে ছাড়া সারা বিশ্বের টেলিভিশন পর্দায় প্রতিদিন যে ঘটনা দেখা যায় তা চালাতে পারবে না। শান্ত হতে এবং স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে মুসলিম সমাজগুলোকে অবশ্যই একটা সুযোগ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাসবাদ সত্যিকারভাবে প্রতিরোধ করার জন্য কেবল মুসলিমরাই তাদের নিজেদের সমাজে চিন্তাধারায় পরিবর্তনের কাজ শুরু করতে পারে। বস্তুত উদারবাদী ইসলামপন্থীরাই সম্ভবত বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিকভাবে চরমপন্থীদের নিরস্ত্র করতে পারে। ইসলামকে ব্যবহার করার জন্য যে বৈধতার এমনকি অ-ইসলামি কারণের জন্যও চরমপন্থীরা যুক্তি দেখাক না কেন, সেগুলো অবৈধ ঘোষণার জন্য তারাই সর্বোত্তমভাবে প্রয়োজনীয় সাজসজ্জায় সজ্জিত। তারা সম্ভবত সন্ত্রাস ব্যবহারের ইসলামি ভিত্তিটি বেআইনি করতে পারবে, কিন্তু যেসব বাস্তব কারণে সন্ত্রাসের উদ্ভব হচ্ছে, সেগুলোর অবসান ঘটাতে পারবে না। ইসলামপন্থীরা ধার্মিক বলে তাদের কণ্ঠস্বর শক্তিশালী এমন নয়; বরং আধুনিক মুসলিম ইতিহাসের এই পর্যায়ে তারাই একমাত্র অবশিষ্ট রাজনৈতিক উপদল, যারা বেশ বৈধতা ও শ্রদ্ধার আসনে রয়েছে। আর বাস্তবসম্মত কারণেই, বিশ্বাসযোগ্য মুসলিম নেতারা আধুনিকায়নের প্রতি জোর দেবেন না, যতক্ষণ বিদ্যমান পরিস্থিতি এর পক্ষে কথা বলা কঠিন হয়ে থাকবে। বর্তমান পরিস্থিতি চির দিন স্থায়ী থাকবে না। তবে অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যেই বিদেশী সেনাবাহিনীর অনিবার্য উপস্থিতি উদারপন্থীদের কর্তৃত্ব সত্যিই খর্ব করে দিচ্ছে, চরম পরিস্থিতিতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন পাচ্ছে না।

আরেকটি স্লোগানকে বিদায় করতে হবে সেটি হলো– 'সন্ত্রাসবাদের প্রতি জিরো টলারেন্স।' এটি আসলে ফাঁকাবুলি, চাঁপাবাজি ও কল্পনাবিলাস, ঠিক যেমন সমসাময়িক সমাজে 'অপরাধের প্রতি জিরো টলারেন্স'-এর কোনো উপযোগিতামূলক অর্থ নেই।

আমেরিকান সমাজ অত্যাচারপূর্ণ বিদেশী হস্তক্ষেপকে যতটুকু স্বাগত জানাবে, মুসলিম সমাজও সেটাকে যে তার চেয়ে বেশি গ্রহণ করবে না তা বোঝার জন্য প্রবল অন্তর্দৃষ্টি থাকার দরকার নেই। যেসব কার্যক্রমের ফলে মুসলিম সমাজ থেকে সহিংস প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে, সেগুলো বন্ধ করা হতে পারে বর্তমান বিপর্যয়কর আমেরিকান ধারার যৌক্তিক বিকল্প নীতি। আর এটা বুঝতে বা উপলব্ধি করার জন্য বিশেষ ক্ষমতার দরকার পড়ে না। এই পর্যায়ে পরিস্থিতির এতটাই অবনতি ঘটেছে যে, অঞ্চলটি থেকে মার্কিন সৈন্য বিদায় নেয়া মাত্র হঠাৎ করেই যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হয়ে যাবে, এমন নয়। তবে সন্ত্রাসের তীব্রতা কমিয়ে ধীরে ধীরে অবসানের লক্ষ্যে এটা হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ধাপ। সামরিক প্রত্যাহার আলকায়েদার মতো চরমপন্থী আন্দোলনের অস্তিত্ব থাকার প্রধান যুক্তির গুরুত্বই ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেবে। প্রতিটি মুসলিম দেশে তাদের উপস্থিতি থাকার প্রধান যুক্তি হিসেবে বলা

হয়, তারা বিদেশী হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এখন বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার করা হলে তাদের আর স্বাগত জানানো হবে না। মুসলিম জনসাধারণের তাদের ওপর নেমে আসা সহিংসতা মোকাবেলা করার জন্য বাইরের যোদ্ধাদের গ্রহণ করার প্রয়োজন যখন আর পড়বে না, তখন নতুন কৌশলগত পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসবাদের অবকাশ দ্রুত কমে আসবে। আমরা সমস্যার বাস্তব, সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারলে একে কোনোভাবেই ইসলামীকরণ করব না। দুঃখজনক বিষয় হলো, ওয়াশিংটন মুসলিম বিশ্বের ওপর তার কৌশলগত প্রাধান্য বিস্তার করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করার বিষয়টি মন্থর করে ফেলেছে আর সমস্যাটির প্রধান উৎসই এটি। ওয়াশিংটনে কাজ করার ধরন ও নির্দেশনায় প্রেসিডেন্ট ওবামার পরিবর্তন এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে তার খোলামেলা অভিমত মুসলিম বিশ্বের ব্যাপারে বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সবার কাছেই দৃশ্যত মনে হয়েছে, তিনি মুসলিম বিশ্ব এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের অনুভূতি ও উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন। তিনি তর্জন-গর্জন, দাম্ভিক আচরণ ও শক্তিপ্রয়োগের বদলে যোগাযোগে সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন। তবে তিনি আশপাশের ‘পলিসি সুপার ট্যাঙ্কার’ বদলাতে পারবেন কি না সেটা অন্য প্রশ্ন এবং এখন পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে, সেটা তার ক্ষমতার বাইরের বিষয়। মুসলমানদের বেশির ভাগই ওবামার উৎসাহ পেয়েছে, কিন্তু তারা প্রকৃত পরিবর্তন, মাঠপর্যায়ে নতুন বাস্তবতা দেখতে চায়। মার্কিন সামরিকবাহিনী এখনো রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সামরিকভাবে সমাধান করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে তাদের উপস্থিতির সম্প্রসারণ ঘটিয়েই চলেছে।

গত অর্ধ শতকের বৈশ্বিক ঘটনাপ্রবাহের ফলে ইসলাম আজকের দুনিয়ায় রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে আত্মসচেতন সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। তার পরও আমি ঐতিহাসিক সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত বৈশ্বিক ঘটনাবলির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ইসলামি সভ্যতাকে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছি। আশা করছি, এর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গেছে, ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হিসেবে প্রচারিত অনেক ঘটনাই আসলে অন্য বেশির ভাগ সংস্কৃতির মতো রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেরণাপ্রসূত। অনেক পাঠক মনে করতে পারেন, এ ধরনের ব্যাখ্যা সম্ভবত ইসলামের প্রতি সমর্থনমূলক তথা ইসলামকে ‘দোষ-ত্রুটি থেকে অব্যাহতি’ দেয়ার প্রয়াস। না, এই বইটি ইসলামের গৌরব বা ইসলামি সভ্যতার ব্যর্থতা বর্ণনা করার জন্য লেখা হয়নি। আমি উভয়পক্ষের ভালোমন্দের ব্যালেন্সশিট তৈরি করারও চেষ্টা করিনি। বরং কোন যুক্তি ও কারণে এতসংখ্যক মুসলিম এমনটা কেন ভাবছে এবং এমনভাবে কেন কাজ করছে তার রূপরেখা তুলে ধরতে আমার লক্ষ্য ছিল মুসলিম উদ্দীপনা, আবেগ ও বিকল্পগুলো অমুসলিমদের কাছে স্বচ্ছ ও বোধগম্য করা। ইস্যুগুলো অবজ্ঞা করা কিংবা সমস্যাকে চেপে না গিয়ে বরং সমাধান খোঁজার জন্য এটি খুবই দরকারি বিষয়। কোনো ক্ষেত্রেই অনুভূতি মুসলিম বিশ্বজুড়ে একই ধরনের নয়। তবে পরিস্থিতির যত অবনতি ঘটে, তত বেশি সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্যান্য সমাজকে পরিচালনাকারী পরিবর্তন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা হয়তো ইরাকি, ফিলিস্তিনি, আফগান, পশতু, সোমালিদের সাথে কিংবা চীন, ভিয়েতনাম, ভেনিজুয়েলা বা এমনকি বর্তমান রাশিয়ার

অন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোর সাথে দশকের পর দশক ধরে চলতে থাকা প্রত্যাশিত আমেরিকান সঙ্কট ও সঙ্ঘাত এড়াতে সহায়ক হতে পারে। এ ধরনের অন্তর্দৃষ্টি ৯/১১-এ হঠাৎ করে বিস্ফোরিত হওয়া অদম্য চাপের পুঞ্জীভূত হতে থাকাটা দেখার সুযোগ করে দিতে পারে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যেসব নীতিনির্ধারক মুসলিম সমাজকে এভাবে বোঝার ধারণা প্রত্যাখ্যান করে এবং যারা 'তারা আমাদের কেন ঘৃণা করে' ধরনের নিজ স্বার্থচরিতার্থকারী নীতি গ্রহণ করে তাদের নীতি সবার জন্যই বিপুল মূল্য পরিশোধের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, মুসলিম বিশ্বের সাথে আমেরিকান আচার-আচরণের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

মহা কৌশল

এ বইটির নামের সাথে তাল মিলিয়ে ওয়াশিংটনের উচিত হবে মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের সময় ইসলামের অস্তিত্বই নেই, এমনটা ধরে এগোনো। এ অঞ্চলের বিপুলসংখ্যাগরিষ্ঠ ইস্যু সমাধান বা নিরসন করা যেত, যদি ব্যাখ্যা বা প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদান হিসেবে ইসলামকে অবলম্বন করা না হতো। বস্তুত ব্যাখ্যা হিসেবে ইসলামকে দেখার অর্থ হলো ইস্যুগুলোর স্বচ্ছ ভিশনকে অস্পষ্ট করা। ইসলাম, বিশেষ করে এর অধিকতর চরম আদর্শিক অবয়বে, অনেক বেশি জটিল এবং এমনকি তিক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করলেও এ ধরনের কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না। ইস্যু ও সমস্যাবলি সত্যি সত্যিই অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট, বাস্তব আঞ্চলিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক (অপর্যাপ্ত শিক্ষাসহ) চ্যালেঞ্জ থেকে সৃষ্ট। এসব চ্যালেঞ্জ ইসলামি (সাংস্কৃতিক) আলঙ্কারিক মোড়কে ভিন্ন রূপ ধারণ করলেও আসলে সেগুলো ধর্মের গণ্ডির বাইরে অবস্থিত।

সমস্যাগুলোকে ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত হিসেবে দেখার অর্থ হচ্ছে, আমাদের উচিত হবে ধর্মটি পরীক্ষা করা, ধর্মটি এবং এর সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়া আমাদের স্বার্থের জন্য যুৎসই হয় এমনভাবে পরিবর্তন করার কাজে সময় ও শক্তি ব্যয় করা। কিন্তু যেকোনো ধরনের 'ইসলামের আমেরিকান সংস্করণ' নিশ্চিতভাবেই প্রত্যাখ্যাত হবে। বস্তুত 'আমেরিকান ইসলাম' পরিভাষাটি প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছিল ইরানি বিপ্লবের সময়। এই অসহনীয় আরোপনের মাধ্যমে ইসলামের অর্থ বোঝানো হয়েছিল পুরোপুরি ব্যক্তিগত ধর্মানুশীলনে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে রাজনীতি থেকে সুবিধাজনকভাবে বিরত থাকা এবং চলতি তীব্র রাজনৈতিক ইস্যুগুলো নিয়ে মাথা না ঘামানো। অর্থাৎ এই ইসলাম ভূরাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি করবে না। ইসলামের প্রতি মনোযোগী হওয়াটা সহজেই 'অন্যদের' সমস্যাকে স্থানচ্যুত করে এবং আমাদের নিজস্ব কর্মপন্থার কোনো ধরনের আন্তরিক পর্যালোচনার অবকাশ সৃষ্টি করে না। এ দিয়ে এমনটা বোঝানো হচ্ছে না যে মধ্যপ্রাচ্য এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে সমাধান দরকার– এমন কোনো গুরুতর কোনো সমস্যা নেই। অবশ্যই অনেক আছে। অর্থাৎ আমাদের সব কিছুর জন্য স্রেফ 'ইসলামকে দায়ী' করা চলবে না। আমাদের বরং বাস্তব ইস্যু, যেগুলোর উৎপত্তির কারণ এবং সম্ভাব্য নির্ভরযোগ্য উপায়ে সেগুলো সমাধানের দিকে নজর দিতে হবে।

মুসলিম বিশ্ব এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বর্তমান সঙ্ঘাত কমানোর জন্য নিচের সুনির্দিষ্ট ধাপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন :

- মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্যের সামরিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, যাতে এলাকাটি শান্ত হওয়া শুরু করতে পারে। এগুলোর সবই মুসলমানদের কাছে ভয়াবহ মাত্রায় উসকানিমূলক। এর মানে হলো মুসলিম মাটি থেকে সব আমেরিকান ও পাশ্চাত্য সৈন্য প্রত্যাহার।

- সন্ত্রাসী তৎপরতা শনাক্ত ও প্রতিরোধের কার্যক্রম অবশ্যই গোয়েন্দা ও পুলিশের মাধ্যমে করতে হবে। সন্ত্রাসীদের আটক করার কাজটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বা স্থানীয় দেশের তত্ত্বাবধানে করতে হবে। খেয়ালখুশিমতো অন্য দেশে অবৈধভাবে অভিযান চালিয়ে যেকোনো ব্যক্তিকে আটক ও হত্যা করার যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করার মাধ্যমে করা যাবে না।

- যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই তার জন্য অমর্যাদা সৃষ্টিকারী আমেরিকানপন্থী স্বৈরাচারদের প্রতি তার বিশেষ সমর্থন প্রত্যাহার করতে হবে। এসব স্বৈরাচারী যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ- এমন দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং আরো বেশি বিস্ফোরণমুখী রাজনৈতিক পরিবেশ এবং আমেরিকানবিরোধী ক্ষোভ সৃষ্টি করে।

- মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে, ওয়াশিংটনকে কোনোভাবেই এর কৃত্রিম প্রতিস্থাপনের বাহন হওয়া চলবে না। সবচেয়ে ভালো হয়, ওয়াশিংটন যদি প্রক্রিয়াটি থেকে দূরে থাকে যাতে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব স্বার্থসংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি কলঙ্কিত না হয়। অতীতে মার্কিন কৌশলগত লক্ষ্য হাসিলের জন্য ওয়াশিংটনের গণতন্ত্রের নির্বাচিত ও যান্ত্রিক প্রয়োগের কারণে এর গণতন্ত্রকরণ কর্মসূচির মূল ধারণাটিই কলঙ্কিত হয়েছে।

- যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে, গণতান্ত্রিক-প্রক্রিয়ায় ইসলামি দলগুলো বেশির ভাগ মুসলিম দেশে প্রথম দিককার নির্বাচনগুলোতে বৈধভাবেই নির্বাচিত হবে। সুসংবাদ হলো, ইসলামপন্থী দলগুলো জনগণের কাছে দেয়া তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারলে এক বছর বা এমন ধরনের সময়ের মধ্যেই জনসমর্থন হারিয়ে ফেলবে। অর্থাৎ জরুরি প্রয়োজন হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলি দূর করা, সাম্রাজ্যিকবিরোধী ফাঁকা বুলি কপচানো নয়।

- খুব তাড়াতাড়ি ফিলিস্তিনি সমস্যার সমাধান অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। মুসলিম বিশ্বজুড়ে বিষয়টি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের এককভাবে সবচেয়ে কুখ্যাত উদাহরণ হিসেবে বিরাজ করছে। এ ঘটনা ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে স্থানীয় জনগণকে বাস্তুচ্যুত করে তাদের উদ্বাস্তু শিবিরে জঘন্য পরিবেশে নিক্ষেপ করেছে, ইসরাইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে কিংবা প্রবাসে ঠেলে দিয়েছে। ফিলিস্তিনি দুর্ভোগ বাড়ার সাথে বাড়ছে চরমপন্থা, যা ফিলিস্তিনকে ছাড়িয়ে

যাচ্ছে। সঙ্কটটির দ্রুত সমাধান প্রয়োজন, আর সাধারণ রূপরেখাটি সব পক্ষের কাছেই ভালোভাবে পরিচিত। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডকে ইসরাইলি উপনিবেশে পরিণত করার প্রয়াস অবশ্যই বন্ধ করে বিপরীত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- মৃত্যু ও ধ্বংস সৃষ্টিকারী মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধগুলোতে ওয়াশিংটন যে ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যয় করেছে, যাতে বলতে কোনোই লাভ হয়নি, তার মাত্র এক-দশমাংশও স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, ক্লিনিক ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণে ব্যয় করা হয়, তবে অঞ্চলটি বদলে যাবে, সহনীয় পরিবেশে মার্কিন ভাবমূর্তি দ্রুত উজ্জ্বল হবে, বিপুল আঞ্চলিক অগ্রগতি সাধিত হবে।

- সংস্কারমুক্ত মার্কিন নীতি অল্প সময়ের মধ্যেই সহিংসতা ও চরমপন্থার আন্তর্জাতিক ও বহুজাতিক উৎসের অবসান ঘটাতে পারে। প্রতিটি দেশের সহিংসতার অভ্যন্তরীণ উৎস অবসান ঘটানোর জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম তাৎক্ষণিক সমস্যার আলোকে আলাদা বিশ্লেষণ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, কেবল মুসলমানেরাই (অর্থাৎ স্থানীয়রা) ইসলামি (অর্থাৎ স্থানীয়) চরমপন্থা মোকাবেলায় সমাধান খুঁজে বের করতে পারবে।

নানা জটিল ঐতিহাসিক কারণে ইসলামের সমসাময়িক অভিব্যক্তি প্রায়ই হতোদ্যম ও লক্ষ্যহীন হয়ে তার নিজের দানবগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করছে, নিজের উপনিবেশ-পরবর্তী বিশৃঙ্খলার বেড়াজালে বন্দী হয়ে পড়ছে, তার নিজের সংস্কার এবং নিজের মর্যাদা ও স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছে। আর এগুলোর সবই করছে পাশ্চাত্যের বিপুল সামরিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে। ইসলামের শিকড় ও ভিশন অনেক গভীর ও বিস্তৃত। এখানকার ক্ষমতা, তেল ও ঘাঁটির জন্য নির্মম আন্তর্জাতিক ভূরাজনৈতিক শক্তিগুলো বাধা হয়ে না দাঁড়ালে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক রেনেসাঁস আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

ইসলাম বিপুল বুদ্ধিবৃত্তিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চিন্তাধারার সংস্কৃতি। এটা সাম্প্রতিক সময়ে অতি মন্থনে হলাহলে পরিণত হওয়া সংস্কৃতিও। এর বর্তমান বিকাশের স্পর্শকাতর এবং নিজের অস্তিত্ব হুমকিতে রয়েছে বলে মনে করার এ সময়টাতে একে বেশি উসকানি না দেয়াই ভালো। এর বিরুদ্ধে এ ধরনের আক্রমণ কেবল তার সবচেয়ে প্রাচীন পরম্পরাগত এবং সঙ্কীর্ণ বিষয়গুলো উচ্চকিত করছে, সংস্কার ও মধ্যপন্থা অবলম্বনের তাগিদ সরিয়ে রাখছে, মুসলমানদের রক্ষণব্যূহ তৈরি করার কারণ হচ্ছে।

এ চ্যালেঞ্জে পাশ্চাত্যকে অবশ্যই উঠে দাঁড়াতে হবে। তবে বাস্তবে পাশ্চাত্য নিজেই মানসিক রোগাক্রান্ত হওয়ায় তার কথা ও কাজে মিল নেই। বর্তমান বিশ্বে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক-প্রক্রিয়া, অর্থনৈতিক কল্যাণ, শিক্ষা, নাগরিক ও সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষা এবং এসব অধিকার রক্ষায় গণতদারকি ও প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি সৃষ্টিতে পাশ্চাত্যই সেরা। মুসলিম বিশ্বে এসব গুণ প্রশংসিত হয়ে আসছে। অন্য দিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার পররাষ্ট্রনীতিতে এবং সাম্রাজ্যিক ও সামরিক কার্যক্রমে পাশ্চাত্যের শক্তি অনেক বছর ধরেই মানবাধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং বেঁচে থাকার অধিকারের ঘোরতর অপব্যবহার করছে। আর এগুলোর সবই করা হচ্ছে উপনিবেশবাদ বিরোধীবাদ, 'গণতন্ত্রায়ন', 'আমেরিকান নেতৃত্ব' সংরক্ষণ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সুরক্ষার মতো গালভরা নামে। মুসলিম বিশ্বে এসব গুণ নিন্দিত। এ ধরনের সামরিক অভিযান থেকে মুসলিম বিশ্ব মার্কিন নীতি থেকে যতটুকু লাভবান হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। পাশ্চাত্য বিশেষ করে সর্বশক্তিমান যুক্তরাষ্ট্রকে তার জাতীয় আদর্শ তার বৈদেশিক নীতিতে প্রতিফলিত করার জন্য অনেক দূর যেতে হবে।

উন্নয়নশীল বিশ্ব যেসব অব্যবহারের শিকার হচ্ছে, সেগুলো এ কারণে নয় যে, পাশ্চাত্য আসলেই অশুভ শক্তি; আসলে তেমনটা হচ্ছে এ কারণে যে, বৈশ্বিক পর্যায়ে অন্যদের প্রতি এসব কিছু করার মতো শক্তি তার আছে বলেই করছে। ফ্রান্স, জার্মানি, চীন, রাশিয়া বা অন্য যেকোনো দেশের বৈশ্বিক ক্ষমতার অনিয়ন্ত্রিত সুসংহত হতে দেখলে আমি যারপরনাই খুশি হবো। বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্র এখন বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তারের মতো শক্তি ধারণ করে আছে। যেকোনো প্রেক্ষাপটেই একচেটিয়া ক্ষমতা কখনো শুভ পরিণাম বয়ে আনে না। আমাদের (যুক্তরাষ্ট্রের) সংবিধানে যাচাই ও মাত্রা অতিক্রম না করার ব্যবস্থা আছে, যেকোনো করপোরেশনকে সব প্রতিযোগিতা গুঁড়িয়ে দেয়া থেকে বিরত রাখতে রয়েছে দুর্দান্ত একচেটিয়াবিরোধী বিধান। প্রতিযোগিতা ধ্বংস করা থেকে বিরত রাখতে এগুলো দারুণ বিষয়। একইভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ক্ষমতা পুঞ্জীভূত করাটা দেখতে চাই না, এটি কারো জন্যই কল্যাণকর নয়।

আগামীতে ইসলাম ও রাষ্ট্রযন্ত্র কোনো না কোনোভাবে কিছু সময়ের জন্য সম্পর্কিত থাকবে। মুসলমানদের কাছে এটা হলো এমন আশ্বস্তকরণ যে, রাজনৈতিক মূল্যবোধ স্বার্থপ্রণোদিত ক্ষমতার খেলায় অবজ্ঞার শিকার হবে না। ভালো হোক কিংবা খারাপ হোক, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোনো স্থানেই শক্তি হিসেবে ধর্ম অদৃশ্য হবে না। এটি সম্ভবত সব সীমা ডিঙিয়ে নতুন দিগন্তে উত্তরণে মানবীয় আত্মিক আকুলতার অংশবিশেষ। তবে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে ধর্মের সংযোগ বাজে সম্মিলন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এটা কোনো নতুন আবিষ্কার নয় যে, ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত যেকোনো মতাদর্শই সহজাতভাবেই একে অপরকে কলুষিত করার চেষ্টা করে। ইসলাম না থাকলে অন্য কোনো ধর্ম এসে অবশ্যই একই পরিস্থিতিতে একই ভূমিকা পালন করবে। আর কোনো ধর্মই যদি না থাকে, আমরা তখনো দেখব একই কাজ করার জন্য অন্য কোনো মতাদর্শ সাথে সাথেই বাছাই করে নিয়েছি। অর্থাৎ ইসলামবিহীন বিশ্ব পরিস্থিতির প্রকৃতি তেমনভাবে পরিবর্তন করবে না।

আমরা যদি মনে করি, আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসে ধর্মের একটি নেতিবাচক শক্তি রয়েছে, তবে বিকল্প কিছুর কথা ভাবুন। ২০ শতকে পাশ্চাত্য ইতিহাসের বিপুল স্থানজুড়ে থাকা বর্বর সেকুলার সহিংসতা ও নজিরবিহীন নির্মমতার- দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ ও সমাজতন্ত্র- যে ইতিহাস রেখে গেছে, ধর্ম তার চেয়ে খারাপ কিছু করেনি। এসব ভয়াবহ ঘটনার সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্কই ছিল না। সেকুলার চরমপন্থা আমাদের কেবল আরো খারাপ কিছু দিয়েছে। আসল সমস্যা নিহিত রয়েছে ভালো বা খারাপ মানবীয় আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতিতে। পাশ্চাত্যে আমরা অনেক সুন্দর পথ খুঁজে পাব যদি আঞ্চলিক ইস্যুগুলো বোঝার সময় তা থেকে ইসলামকে আলাদা করে রাখি এবং সেগুলোকে স্রেফ সার্বজনীন মানবীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা- যেগুলোতে আমাদেরও কিছু দায়দায়িত্ব রয়েছে- বিবেচনা করি।